ভাগবত-ধর্ম্ম

RE... No. ৬/৯৫ Date.
294.592
11213

তৃতীয় ভাগ

মহোপদেশক—

শ্রীকুলদাপ্রসাদ মল্লিক, বি-এ,
ভাগবতরত্ন, বৈষ্ণব-সিদ্ধান্তভূষণ
প্রণীত।

—০(*)০—

প্রাপ্তিস্থান ঃ—
গ্রন্থকারের যাবতীয় পুস্তকাদির সোল এজেন্টস্—
সরকার বিশ্বাস এণ্ড কোং
২নং শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

সন ১৩৩৭

মূল্য ১৲ এক টাকা মাত্র

গ্রন্থকারের নিবেদন

——:*:——

বর্ত্তমান বৎসরের গত কার্ত্তিক মাসে ভাগবত ধর্ম্ম দ্বিতীয় ভাগ ২য় সংস্করণ বাহির হইয়াছে। ভাগবত-ধর্ম্ম এবং শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে অনেক কথা জানিবার জন্য জনসাধারণের আগ্রহ দেখিয়া পরম স্নেহাস্পদ শ্রীমান জগদীশচন্দ্র সাহা ভ্রাতাজীবনের সাহায্যে ও যুবক-কর্ম্মী শ্রীমান রমাপ্রসাদ বিশ্বাসের তত্ত্বাবধানে এই গ্রন্থের তৃতীয় ভাগ প্রকাশিত হইল। আশা করিতেছি, ইহার চতুর্থ ও পঞ্চম খণ্ডগুলি সত্বর বাহির হইবে।

ভক্তগণের কৃপাই একমাত্র সহায়—তাঁহারা কৃপা করিলে, এ সম্বন্ধে অন্যান্য কথা দেশবাসিগণকে শুনাইতে পারিব। ইতি—

৯ই ফাল্গুন,
১৩৩৭।

বিনীত
শ্রীকুলদাপ্রসাদ দেবশর্ম্মা।

সূচীপত্র

অংশবিভব, তিনি ষড়ৈশ্বর্য্যে পূর্ণ ভগবান্—আর শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু স্বয়ং ভগবান্!

শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুকে যাঁহারা ভগবান্ বলিলেন, তাঁহারা ভগবান্‌কে কোথায় কি ভাবে দেখিলেন—আজ জগৎ যদি তাহা চিন্তা করিতে পারিত, তাহা হইলে এই মুহূর্ত্তেই জগতের যুদ্ধ-কোলাহল, জীবনসংগ্রামের ভীষণ ও তীব্র প্রতিযোগিতা থামিয়া যাইত। আমরা দেখিতাম, ভগবান্ আমাদের দুয়ারে ভিখারী বেশে দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন, অশ্রুসজল নেত্রে পথে পথে কাঁদিয়া বেড়াইতেছেন। তাঁহার এই ভাব প্রত্যক্ষ করিলে আর কি কেহ শক্তি লইয়া ঘরে বসিয়া স্বার্থসাধন করিতে পারিত? শক্তির কি অপব্যবহার হইত? তাহা হইলে বলবানের বল দুর্ব্বলকে সবলতায় উন্নীত করিবার জন্যই নিযুক্ত হইত—জ্ঞানী অজ্ঞনেরা কুটিরে কুটিরে ঘুরিয়া ডাকিয়া বলিতেন, "তুমি আমার সেবা গ্রহণ কর, নতুবা আমার জীবন বিফল হইয়া যাইতেছে", ধনী ধন লইয়া দরিদ্রের দুয়ারে দুয়ারে ঘুরিয়া 'সেবা-লও' বলিয়া ঘুরিয়া বেড়াইত। মানবের হৃদয়ের অন্ধকার দূরীভূত হইলে মানব স্বয়ং ভগবানকে ভিখারীর বেশে দেখিতে পায়।

ভিখারী ভাবের মধ্য দিয়া শ্রীবৃন্দাবনলীলার তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম করিতে হইবে ইহা আমরা জানিতাম না। শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুকে দেখিয়া এই রহস্য আমরা উপলব্ধি করিলাম। কেবল যে ভগবান ভিখারী, তাহা নহে, যাহারা ভগবানের স্বগণ তাঁহারা সকলেই ভিখারী। আবার তাঁহাদের শিক্ষাও এক আশ্চার্য্য ব্যাপার, বামনদেবের ভিক্ষার মত—ভিক্ষা দিতে কেহ অগ্রসর হইলে নিজেকেই ভিক্ষা দিয়া ফেলেন; বৃন্দাবনে ঠিক তাহাই হইয়াছিল—ব্রজগোপীগণের নিকট তিনি ঋণী হইয়াছিলেন। গোপীকাগণ দৃশ্যতঃ অনেক হইলেও তাঁহারা শ্রীরাধার গণ। শ্রীমতী রাধিকার নিকট ভগবান্ ঋণী হইয়াছিলেন, সেই ঋণ পরিশোধের জন্যই তাঁহার শ্রীগৌরাঙ্গরূপে আবির্ভাব, ইহা গৌড়ীয় বৈষ্ণব আচার্য্য-

ভগবান্ ঋণী।

গণের অভিমত। লীলায় তিনি কি প্রকারে ঋণী হইলেন, তাহা আমাদিগকে দেখিতে হইবে, তাহা হইলে নদীয়ার শ্রীগৌরাঙ্গলীলায় অতীত কালের যাবতীয় লীলা কি প্রকারে পরিণতি প্রাপ্ত হইয়াছে তাহা আমরা বুঝিতে পারিব।

পূর্ব্বে বলা হইল যে, আনন্দময় পরমপুরুষকে তাহার স্বরূপে উপলব্ধির চেষ্টার দ্বারাই শ্রীবৃন্দাবনলীলা বুঝিতে পারা যাইবে। এইভাবে লীলার স্রোতে ভাসিতে ভাসিতে যখন শ্রীবৃন্দাবনে আসা গেল, তখন দেখি ভগবান্ যেন মানুষকে হাতে চাপিয়া ধরিয়াছেন। মানুষ তো ভগবানের দিকে চাহিবে না, কারণ তাহার ভয়, পাছে ভগবানের দিকে চাহিলে তাহার বড়সাধের সংসারস্বপ্ন ভাঙ্গিয়া যায়। কাজেই সে চোক বুঁজিয়া হাত ছাড়াইয়া পলাইবার জন্য চেষ্টা করিতেছে।

শ্রীবৃন্দাবনে দেখা গেল যে সাধারণজ্ঞানে আমরা যাহাকে ভগবৎপ্রাপ্তির বিরোধী ও সংসার বন্ধনের হেতু বলিয়া বিবেচনা করি, এখানে তাহাই ভগবান্‌কে অস্বাদন করিবার উপায়। তাহারই মধ্যদিয়া ভগবান ভক্তের হইয়াছেন। নাম আর রূপ, এই দুই ভববন্ধনের প্রধান রজ্জু। আর শ্রীবৃন্দাবনলীলায় এই দুই তাঁহাকে পাইবার উপায়—তবে নাম জগন্মঙ্গল হরিনাম, আর রূপ শ্যামসুন্দর মদনমোহন রূপ!

বৃন্দাবন লীলার উদ্দেশ্য।

এই জন্যই শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশ স্কন্দের প্রথম অধ্যায়ে শ্রীবৃন্দাবনলীলার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে এইরূপ বলা হইয়াছে।

> "স্বমূর্ত্ত্যা লোক-লাবণ্যনির্ম্মুক্ত্যা লোচনং নৃণাম্।
> গীর্ভিস্তাঃ স্মরতাং চিত্তং পদৈস্তানীক্ষিতাং ক্রিয়াঃ॥
> আস্তীর্য্য কীর্ত্তিং সুশ্লোকাং বিতত্যহ্যঞ্জসানুকৌ।
> তমোঽনয়া তরিষ্যন্তীত্যগাৎ স্বং পদমীশ্বরঃ॥"

এই শ্লোক দুইটিতে ভগবান্ কিজন্য আসিয়াছিলেন, তাহাই বলা হইতেছে। তাঁহার মূর্ত্তি লোকলাবণ্যনির্ম্মুক্তিকর। শ্রীধরস্বামী

তাঁহার টীকায় এই নির্ম্মুক্তি পদটির দুইরূপ অর্থ করিলেন। এক অর্থ করিলেন "**লোকানাং লাবণ্যস্য নির্ম্মুক্তিস্ত্যাগো যথা যামপেক্ষ্য লোকেষু লাবণ্যং নাস্তীত্যর্থঃ। যদ্বা লোকেভ্যো লাবণ্যস্য নির্ম্মুক্তির্দানং যতঃ যৎসংপর্কেণ লোকা লাবণ্যবন্তো ভবন্তি ॥**" অর্থাৎ যেরূপ দেখিলে আর অন্য কোন বস্তুর রূপ, রূপ বলিয়া মনেই হইবে না, আর জগতে যে রূপ রহিয়াছে, তাহা তাঁহারই রূপের সম্পর্কে; এইরূপ ভগবানের রূপ। এই রূপের দ্বারা তিনি মানবের নয়ন আকর্ষণ করিলেন, নিজের বাক্যের দ্বারা স্মরণকারীর চিত্ত হরণ করিলেন, নিজের পাদপদ্মের দ্বারা মানবের সংসারগমনাদি ক্রিয়া নিবৃত্ত করিলেন এবং পৃথিবীময় শোভন কীর্ত্তি বিস্তার করিলেন। এই সকল করার পর তিনি ভাবিলেন, নিশ্চই ইহার দ্বারা লোকে পাপ হইতে উত্তীর্ণ হইবে। এইরূপ স্থির করিয়া ঈশ্বর শ্রীকৃষ্ণ স্বধামে গমন করিলেন। এই শ্লোকই বিশেষরূপে আলোচ্য। শ্রীকৃষ্ণলীলার তাৎপর্য্য এই শ্লোকের আশ্রয়ে আলোচনা করিলে ভিখারী ভগবান্‌কে বুঝিতে পারা যাইবে।

দ্বিতীয় ভাগ সমাপ্ত।

ভাগবত-ধর্ম্ম

তৃতীয় ভাগ

১

অবতার কথা।

বিজ্ঞান ও শাস্ত্র।

সেকালের শাস্ত্র আর একালের বিজ্ঞান এই উভয়ের মধ্যে অনেক দ্বন্দ্ব অনেক দিন ধরিয়া চলিতেছে। এখন যে যুগ আসিতেছে তাহা মিলনের যুগ। এই দ্বন্দ্বের ইতিহাস যেমন শিক্ষাপ্রদ ও কৌতুকাবহ, মিলনের ইতিহাসও ঠিক সেইরূপ শিক্ষাপ্রদ ও কৌতুকাবহ। উভয়েরই আলোচনা প্রয়োজন। শাস্ত্র ও বিজ্ঞানের মিলনের প্রারম্ভেই ভারতবর্ষে হিন্দুধর্ম্মের পুনরুত্থান। এই পুনরুত্থানের ইতিহাসে অনেক হাসির কথা আছে, অনেক কান্নার কথাও আছে। সেই হাসি কান্না হইতেই আমরা এই আলোচনা আরম্ভ করিতেছি।

সেকালের শাস্ত্রের কথাগুলি একালের বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তের দ্বারা সমর্থিত হইতে পারে,—এই প্রকারের একটা ধারণা যেদিন ইংরাজীবিদ্যায় সুশিক্ষিত হিন্দুসন্তানের মনে জাগিয়া উঠিল, সেই দিন হইতেই শাস্ত্রীয় উপদেশের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা প্রবর্ত্তিত হইল। আধুনিক বিজ্ঞানের একেবারে কিছুই জানেন না এমন অনেক মহানুভব ব্যক্তিও বিজ্ঞানের সাহায্যে ধর্ম্মব্যাখ্যা করিয়া বহাবা পাইতে লাগিলেন।

সমন্বয়-চেষ্টা।

অবতারবাদ প্রাচীনকালের একটি উপদেশ। কেবল পুরাণে নহে, বেদেও অবতারের কথা আছে, সুতরাং বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তের সাহায্যে অবতার-কথা বুঝিতে হইবে। অবতার বলিলেই আমরা সাধারণতঃ দশটি অবতার বুঝিয়া থাকি ; কবি জয়দেব এই দশাবতারের স্তোত্রই শুনাইয়া গিয়াছেন। কাজেই অবতার-কথার আলোচনায় এই দশটি অবতারকে লইয়াই আলোচনা আরম্ভ হইল।

'আর্য্য দর্শন' ও 'নবজীবন'।

বাঙ্গালা ১২৮১ সাল ; ডারউইন্ সাহেবের বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত অবলম্বন করিয়া দশাবতারতত্ত্বের ব্যাখ্যা প্রসিদ্ধ "আর্য্য-দর্শন" পত্রে প্রকাশিত হইল। দশ বৎসর পরে ১২৯১ সালের 'নবজীবন" পত্রে এ বিষয়ে আর একটি প্রবন্ধ বাহির হয়। তাহার পর "হিন্দুপত্রিকা" প্রভৃতি কাগজে ও পুস্তকে এই একই কথা কিছু কিছু বাড়াইয়া কমাইয়া অনেকবার বাহির হইয়াছে, অনেক বক্তা অনেক লোকের সম্মুখে এই তত্ত্ব প্রচার করিয়াছেন। কবি নবীনচন্দ্রের কাব্যগ্রন্থেও এই কথা প্রচারিত হইয়াছে। সুতরাং এই ব্যাখ্যা সকলেই জানেন বলিয়া ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। কিন্তু এখনও অনেকে এই তত্ত্ব প্রচার করিতেছেন। প্রায় অর্দ্ধশতাব্দীর অধিককাল একই কথা পুনঃ পুনঃ প্রচারিত হইয়াছে। ইহাতে বুঝিতে হইবে যে এই বিষয়টি জানিবার জন্য আমাদের খুব আগ্রহ আছে। সুখের কথা সন্দেহ নাই।

ডারউইন্ সাহেবের বিবর্ত্তবাদ, ক্রমবিকাশবাদ বা অভিব্যক্তিবাদের সাহায্যে দশাবতারতত্ত্ব কি ভাবে ব্যাখ্যাত হয়, তাহা অনেকের জানা থাকিলেও তাহার পুনরাবৃত্তি প্রয়োজন। কারণ বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা যাঁহারা জানিয়া ফেলিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেক প্রকারের লোক আছেন ; তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ যদি দেখেন যে তাঁহাদের পরিজ্ঞাত এই অভিনব ব্যাখ্যা দেওয়া হয় নাই, তাহা হইলে তাঁহারা মনে করিবেন, এই ব্যাখ্যা প্রবন্ধ-

লেখকের জানা নাই। এমন একটা অপূর্ব্ব কথা অর্থাৎ ডার্-উইনের সাহায্যে পৌরাণিক অবতারবাদের ব্যাখ্যা, ইহা যে লেখকের জানা নাই, তাঁহার অন্যান্য কথা কেহ কেহ পড়িতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিতে পারেন। সুতরাং এই ব্যাখ্যাটুকু প্রারম্ভে সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করিতেছি।

দশাবতার।

দশাবতারের নাম—মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ, নৃসিংহ, বামন, পরশুরাম, শ্রীরামচন্দ্র, বলরাম, বুদ্ধ ও কল্কি। কবি জয়-দেবের স্তোত্র সুপরিচিত। প্রথমেই মৎস্য—জয়দেব গাহিয়াছেন—

১। মৎস্য।

"প্রলয় পয়োধিজলে ধৃতবানসি বেদং
বিহিত বহিত্র চরিত্রমখেদং
কেশবধৃতমীনশরীর জয় জগদীশ হরে।"

প্রলয়কালে জগন্মণ্ডল সমুদ্র-জলে আচ্ছন্ন হইলে, ভগবান্ মৎস্যরূপ ধারণ করিয়া বেদের রক্ষা করেন।

"আর্য্যদর্শন" এ প্রকাশিত প্রবন্ধে ইহার তাৎপর্য্য এইরূপ ব্যাখ্যাত হইয়াছে। "বিদ্" ধাতুর অর্থ জ্ঞান, জ্ঞানের বিষয়কে বেদ বলা যায়। সৃষ্টির প্রথমে জলের আবির্ভাব, অতএব জলীয় জগতে যে প্রাণী আরাম বিরাম করিয়া জীবিত থাকিতে পারে, জগদীশ্বর তাহারই সৃষ্টি করিয়াছেন। জীবমাত্রেরই চৈতন্য আছে, ঐ চৈতন্যকেই সুখদুঃখাদি বোধবিষয়ক জ্ঞান কহা যায়। সেই বোধকেই বেদ শব্দে নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। প্রলয়কালীন জলে তাবৎ জীব নষ্ট হইয়া গেল। এখন জলীয় জগতের মধ্যে কোন্ প্রাণীর প্রতি জ্ঞান রাখা যাইতে পারে? দেখা গেল, মৎস্যগণই জলীয় জগতের উপযুক্ত জন্তু, তাহাদিগকেই এ জগতে বুদ্ধিমান প্রাণী ধরা যাইতে পারে।

২। কূর্ম্ম। দ্বিতীয় অবতার কূর্ম্ম। কবি জয়দেব গাহিয়াছেন—

"ক্ষিতিরিতি বিপুলতরে তিষ্ঠতি তবপৃষ্ঠে
ধরণীধারণকিণচক্রগরিষ্ঠে
কেশবধৃত কূর্ম্মশরীর জয় জগদীশ হরে।"

আর্য্যদর্শনের ব্যাখ্যা এইরূপ।—"জলের পরে মৃত্তিকার উৎপত্তি। এখন পার্থিব জীবের সৃষ্টি হওয়াই সম্ভব, তদনুসারে জল ও স্থলচরের নির্ম্মাণ হইল। এবার কূর্ম্ম আসিলেন। পৌরাণিক মতে ভগবান্ কূর্ম্মাবতারে মেদিনীমণ্ডলকে প্রলয়-পয়োধি-জল হইতে উদ্ধার করিয়া নিজ পৃষ্ঠভাগে ধারণ করিয়া আছেন। এবারে জলীয় পরমাণু পার্থিব পরমাণুর সহিত মিশ্রিত হইয়া ঘনীভূত হইল।"

৩। বরাহ। তৃতীয় অবতার বরাহ। জয়দেব গাহিয়াছেন—

"বসতি দশনশিখরে ধরণী তব লগ্না
শশিনি কলঙ্ককলেব নিমগ্না
কেশব ধৃত-শূকররূপ জয় জগদীশ হরে।"

আর্য্যদর্শনের ব্যাখ্যা—"ভগবান্ যখন বরাহমূর্ত্তি ধারণ করিলেন, সে সময়ে পার্থিব জগতের দ্বিতীয় অবস্থা। এ অবস্থায় পৃথিবীর উৎপাদিকা শক্তি অত্যন্ত অধিক। বিশেষতঃ জলপ্লাবন দ্বারা পৃথিবীর উপরিভাগে বন জঙ্গলের উৎপত্তি শীঘ্র শীঘ্র হইতে লাগিল। এমন অবস্থায় কাহার উৎপত্তি সম্ভবপর? পৌরাণিকেরা দেখিলেন বনে বরাহাদি জীবের সৃষ্টি ভিন্ন অন্য প্রাণীর সৃষ্টি হইতে পারে না। সুতরাং তৃতীয় অবতারে বরাহরূপই সঙ্গত। এখন পৃথিবীর উপরিভাগ পূর্ব্বাপেক্ষা আরও কঠিন হইয়াছে। এবারে দন্তজাবির সৃষ্টি না করিলে বৃক্ষলতাদির ছেদন ভেদন সম্ভব নয়, সুতরাং বরাহমূর্ত্তি দ্বারা মেদিনীমণ্ডলের উদ্ধার সাধন হয়। সে সাধন আর কিছুই নহে,

পৃথিবীর ঐ অবস্থায় বরাহ প্রভৃতি দন্তজীবী ও নানাপ্রকার শৃঙ্গীর সৃষ্টি হয়। পুরাণের মতে এই বরাহের এক একটি কেশর গিরিশিখরতুল্য। পদার্থবিৎ পণ্ডিতদিগের মতে কেশর ও শৃঙ্গ এক পদার্থ, তদনুসারে বলা যাইতে পারে যে এই সৃষ্টিদ্বারা দন্তজীবী ও শৃঙ্গীর সৃষ্টি দেখান হয়। কূর্ম্মের সৃষ্টির দ্বারা নখীর সৃষ্টি সিদ্ধ হইয়াছে।

৪। নৃসিংহ।

এইবার চতুর্থ অবতার—নরসিংহ-অবতার। জয়দেব বন্দনা করিলেন—

"তব করকমলবরে নখমদ্ভুতশৃঙ্গম্।
দলিত হিরণ্য-কশিপু-তনু-ভৃঙ্গম্।
কেশব-ধৃত-নরহরিরূপ জয়-জগদীশ হরে॥"

পৃথিবী চতুর্থ অবস্থায় মনুষ্যের আবাসযোগ্য হইল বটে, কিন্তু তখনও আমমাংস-ভোজনব্যতীত পৃথিবীতে মনুষ্যাদির জীবন-ধারণ সুসাধ্য নহে। সেই সময়ে জ্ঞানে অৰ্দ্ধ পশু ও অৰ্দ্ধমনুষ্য ভাবাপন্ন জীবগণের সৃষ্টি হইল। তাহার উদাহরণ স্বরূপ নরসিংহ-মূর্ত্তির আবির্ভাব দেখা যায়। এই অবস্থায় দৈত্য-দানবাদির প্রাণ-সংহার আরম্ভ হইল, পশুবৃত্তি ও হিংসার প্রাবল্য এই অবস্থার বিশেষ লক্ষণ।

৫। বামন।

পঞ্চম অবতার বামন। জয়দেব গাহিলেন—

"ছলয়সি বিক্রমণে বলিমদ্ভুত বামন।
পদনখনীরজনিতজন পাবন।
কেশব ধৃত-বামনরূপ জয় জগদীশ হরে॥"

পঞ্চম অবস্থায় এই ধরাধাম মনুষ্যাদি জীবগণের পক্ষে অপেক্ষাকৃত সুখাবাসের স্থান হইল। এই সময়ে মনুষ্যেরা আত্মদলবলসহকারে হিংস্র জীবজন্তুর প্রাণ-সংহার করিতে লাগিলেন। হিংস্রজীবগণও মনুষ্যের দৌরাত্ম্য সহ্য করিতে না

পারিয়া নিবিড় কাননের আশ্রয় লইল, তদবধি হিংস্র জন্তুগণের মনে ভয়ের সঞ্চার হইল। এই অবস্থায় যে অবতার কল্পিত হইয়াছে, তাঁহার রূপ ত্রিবিক্রম মূর্ত্তি। সময়ে এই সংসারের অনেকখানি শ্রীবৃদ্ধি হইল অর্থাৎ মনুষ্য-শক্তির পরিচয় পাওয়া গেল। মনুষ্যেরা বুদ্ধিবলে আত্মজ্ঞান-প্রভাবে ইচ্ছা করিলে স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল সর্ব্বত্রই যাইতে পারেন, তাহাই প্রদর্শন জন্য ভগবান্ এক প্রকার বামন অবতার ও সেই অবস্থাতেই ত্রিবিক্রম-স্বরূপ মহাবিরাট্ আকার ধারণ করিয়া বলির প্রতিশ্রুত ও অবশ্য দেয় ত্রিপাদ পরিমিত স্থানের গ্রহণ জন্য স্বর্গে ও মর্ত্ত্যে পাদবিক্ষেপ করিলেন। আকাশের নাম বিষ্ণুপদ, সুতরাং বলিরাজার তাহাতে কোন অধিকার নাই। এইহেতু তিনি উহা দিতে অসমর্থ হইলেন। ত্রিপাদ ভূমির মধ্যে পাতাল ও মর্ত্ত্য এই দুইটির দখল সিদ্ধ হইল। আকাশ বিষ্ণুর পাদবিশেষ, অতএব বলির প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হইল। এক্ষণে মনুষ্যেরা পরমেশ্বরের অস্তিত্ব বুঝিতে পারিলেন। তাঁহাদিগের অন্তঃকরণে জগদীশ্বরের সত্তার উপলব্ধি হইল। আকাশস্থ সমুদয় উজ্জ্বল পদার্থকে পরমেশ্বরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ অথবা স্বরূপ জ্ঞানে উপাসনায় রত হইলেন।

৬। পরশুরাম।

তাহার পর—পরশুরাম।

"ক্ষত্রিয় রুধিরময়ে জগদপগতপাপং
স্নপয়সি পয়সি কিমপি ভবতাপম্
কেশব ধৃত-ভৃগুপতিরূপ জয়-জগদীশ হরে।"

এক্ষণে দেখা যাইতেছে ষষ্ঠ অবতার পরশুরাম। ইঁহার অস্ত্র কুঠার। মনুষ্য সকল যখন নিতান্ত অসভ্য নয়, ও অস্ত্রশস্ত্র নির্ম্মাণ করিতে শিখিয়াছে তখনই তাঁহার জন্মের কল্পনা। ইনি সর্ব্বাবয়বসম্পন্ন মনুষ্য দেহে আবির্ভূত হইলেন তাঁহার পর ক্রমে ক্রমে অন্যান্য অবতারের আবির্ভাবের তাৎপর্য্য কি

তাহা এই প্রণালীতে নির্দ্ধারণ করিতে হইলে আমরা দশ বৎসর পরে প্রকাশিত "নবজীবন" এর প্রবন্ধের সাহায্য লইতে পারি।

"পরশুরামাবতার বাহুবলে ব্রাহ্মণের প্রভুত্ব স্থাপন। বশিষ্ঠ, অগস্ত্য, জমদগ্নি প্রভৃতি ব্রহ্মর্ষিরা সকলেই ব্রাহ্মণের প্রভুত্ব স্থাপনের জন্য ব্রতী ছিলেন, কিন্তু পরশুরামে সেই ব্রতের পরাকাষ্ঠা; পরশুরাম ভারতের উত্তরের ক্ষত্রিয়গণকে নির্বীর্য্য করিয়া এবং দক্ষিণে উপনয়ন দ্বারা নূতন ব্রাহ্মণ সৃষ্টি করিয়া সমগ্র ভারতে ব্রাহ্মণের একাধিপত্য সংস্থাপন করেন। ব্রাহ্মণ্যের প্রভুত্বের চরমোৎকর্ষে পরশুরাম অবতার।

৭। রামচন্দ্র।

পরশুরামের পর রামচন্দ্র—

"বিতরসি দিক্ষু রণে দিক্‌পতি-কমনীয়ম্
দশমুখ মৌলিবলিং রমনীয়ং;
কেশব ধৃত-রামশরীর জয় জগদীশ হরে।"

দিক্‌পালগণের বাঞ্ছনীয় সুন্দর দশাননের দশ মস্তকরূপ বলি তুমি যুদ্ধে দশদিকে বিচরণ কর, হে রামরূপধারিন্, হে কেশব হে জগদীশ, হে হরে, তুমি জয়যুক্ত হও।

নবজীবনের লেখকের মতে—

মানবের সামাজিক উন্নতির দ্বিতীয় সোপানে শ্রীরামচন্দ্র। রামচন্দ্র রাবণ জয় করিয়া অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়া যেরূপ সমগ্র ভারতে ক্ষত্রিয়ের আধিপত্য স্থাপন করেন, তেমনই প্রজারঞ্জনের জন্য আত্ম সুখ বিসর্জন দিয়া রাজা নামের সার্থকতা সম্পাদন করেন। রামচন্দ্র রাজাবতার। রামরাজার তুল্য রাজা হয় না, রামরাজ্যের মত রাজ্য হয় না।

৮। বলরাম। রামচন্দ্রের পর বলরাম—

"বহসি বপুষি বিশদে, বসনং জলদাভং
হলহতি-ভীতি মিলিত যমুনাভং
কেশব ধৃত-হলধররূপ, জয় জগদীশ হরে।"

তুমি শুভ্রবর্ণ দেহে মেঘের ন্যায় নীলবর্ণ বস্ত্র ধারণ করিতেছ, দেখিয়া মনে হয় হলের আঘাতের ভয়ে যমুনা আসিয়া যেন তোমাকে জড়াইয়া ধরিয়াছে।

পূর্ব্বোক্ত লেখকের মতে—

বলরাম সামাজিক উন্নতির তৃতীয় সোপান; বলরাম বাল্যে গোপালন-নিরত; বয়সে হলধারী। বলরামে কৃষিযুগের উৎপত্তি; বলরামের সময়ে ভারতের গৃহবিবাদ শান্তিলাভ করিল। বলরামের হলই তাহার পর ভারতের প্রধান অস্ত্র হইল, মনুষ্য পরস্পর যুদ্ধ বিবাদে বিষম রক্তারক্তির পর নিরস্ত হইয়া সর্ব্বংসহা ধরণীর উপর আপনার অস্ত্রচালনা করিতে ব্যস্ত হইল। পূর্ব্বে ম্লেচ্ছ যবনের মত আর্য্যগণ মধুপর্কের জন্য গো-সেবা করিতেন; সেই সময় হইতে প্রকৃত গোপালন হইতে লাগিল; হিন্দুর যথার্থ গোসেবায় এবং কৃষিচর্চ্চায় ভারতবর্ষ অচিরাৎ ধনধান্য দধিদুগ্ধে পরিপূর্ণ হইল। ভারতের কৃষিযুগের মানববৃন্দের সামাজিক উন্নতির এই চরমসীমা।

৯। বুদ্ধ। বলরামের পর বুদ্ধ ও কল্কি—

"নিন্দসি যজ্ঞবিধেরহহ শ্রুতিজাতম্
সদয়হৃদয়দর্শিত পশুঘাতম্
কেশব ধৃত-বুদ্ধশরীর জয় জগদীশ হরে।

১০। কল্কি। ম্লেচ্ছ নিবহনিধনে কলয়সি করবালম্
ধূমকেতুমিব কমপি করালম্
কেশব ধৃত কল্কি-শরীর জয় জগদীশ হরে।"

হে করুণ হৃদয়!

পশুবধ প্রদর্শিত হইয়াছে বলিয়া তুমি যজ্ঞবিধি সংক্রান্ত বেদ সমূহের নিন্দা করিয়াছ।

তুমি ম্লেচ্ছদিগের নিধনের জন্য ধূমকেতুর ন্যায় ভয়ঙ্কর অনির্ব্বচনীয় তরবারি ধারণ করিয়া থাক।

নবজীবনের লেখকের মতে, কলিযুগের পর আধ্যাত্মিক বিকাশ। ভারতের আধ্যাত্মিক বিকাশের দুই অবতার, বুদ্ধ এবং চৈতন্য। প্রথমে যুক্তি, পরে ভক্তি।

সামাজিক উন্নতির চরমোৎকর্ষ হইতে আধ্যাত্মিক সোপান আসিল। সামাজিক অবস্থার অন্ধ বিশ্বাস ঘোরতর তর্কজালে স্থানে স্থানে ছিন্ন ভিন্ন হইতে লাগিল। * * বৌদ্ধ ধর্ম্মের যুক্তিই মূল।

যুক্তির নিরাশ্রয়তায় চক্ষুষ্মতী ভক্তির উৎপত্তি। এই ভক্তি অন্ধবিশ্বাসের সহচরী নহে; ইহা যুক্তির জঠর বিদীর্ণ করিয়া যুক্তির কন্যা অথচ সংহারিণী রূপে অবনীতে অবতীর্ণা হন।

* * এই ভক্তির আবির্ভাবে বঙ্গদেশ পুণ্যক্ষেত্র। সেই ভক্তির অবতার শ্রীচৈতন্য, তাঁহাতেই মানবের ধর্ম্মজীবনের পূর্ণবিকাশ।

কল্কি অবতারের পরিবর্ত্তে নবজীবনের প্রবন্ধে শ্রীশ্রীচৈতন্য-দেবকে প্রতিষ্ঠা করিয়া উন্নতিমুখী গতির পূর্ণতাসাধন করা হইয়াছে—"ধূমকেতুর ন্যায় করালমূর্ত্তির হস্তে করবাল দিয়া ম্লেচ্ছনিবহ নিধন" কার্য্যে লেখক ডারবিনের ক্রমবিকাশবাদের সূত্র ধরিতে পারেন নাই।

জীববিকাশের সন্ধিস্থলে মৎস্যকূর্ম্ম প্রভৃতি কিরূপে আসিলেন তাহাই বুঝাইবার জন্য "নবজীবন" এ ডার্ব্বিনের নিম্নলিখিত উক্তি উদ্ধৃত হইয়াছে:—

We thus learn that man is descended from a hairy quadruped furnished with a tail and pointed ears, pro-

bably arboreal in its habits, and an inhabitant of the old world. This quadrumana with all the higher mammals are probably derived from an ancient marsupial animal and this through a long line of diversified forms either from some reptile-like or some amphibian-like creature and this again from some fish-like animal. (Descent of man).

এইরূপে আমরা বুঝিলাম যে কোন একরূপ লোমশ, সকোণ কর্ণ বিশিষ্ট এবং সম্ভবতঃ বৃক্ষচর জম্বুদ্বীপবাসী চতুষ্পাদ পশু হইতেই মানবের উৎপত্তি হইয়াছে; এই চতুষ্পাদজীবের এবং সকল প্রকার উচ্চতর শ্রেণীর স্তন্যপায়ী জীবের উৎপত্তি সম্ভবতঃ কোনরূপ পুরাকালিক বৃহৎ গর্ভকোষবিশিষ্ট জীব হইতে হইয়া থাকিবে, কোনরূপ উভচরজীব হইতে আবার সেই জীবের উৎপত্তি হইয়া থাকিবে এবং সেই উভচর জীব কোনরূপ মৎস্যবৎ জীব হইতে উৎপন্ন।

অতএব বৈজ্ঞানিক বিবর্ত্তবাদ পর্য্যালোচনায় ডার্‌বিন্ এইরূপ অনুমান করেন, যে উচ্চতর জীবসৃষ্টিতে প্রথমে মৎস্য, পরে উভচর (কচ্ছপ) জীব, তাহার পর লোমশ কোন পশু, এবং পরে মানবশরীর বিকশিত হইয়াছে। সেই আদি মানবগণ প্রথমে খর্ব্ব বা বামন ছিল, এমন সিদ্ধান্তও য়ুরোপীয় বিজ্ঞানে দেখা যায়। সুতরাং পৌরাণিক অবতারতত্ত্বে জীব সৃষ্টির যেরূপ ক্রমবিকাশের আভাস দেখা যায় তাহা যে নিতান্ত আধুনিক বিবর্ত্তবাদের বিরোধী তাহা বোধ হয় না। বরং মৎস্য কূর্ম্ম বরাহ নৃসিংহ বামন—এইরূপ ক্রমই বিজ্ঞানসঙ্গত বলিয়া অনুমিত হইতেছে।

প্রায় অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্বে হিন্দুধর্ম্মের পুনরুত্থানের জন্য যাঁহারা লেখনী ধারণ করিয়া ছিলেন, তাঁহারা এই প্রকারে দশাবতারের সমর্থন করিয়াছেন। স্বর্গীয় কেদার নাথ দত্ত ভক্তিবিনোদ

মহাশয় তাঁহার সংস্কৃত ও বাঙ্গালা গ্রন্থ "শ্রীকৃষ্ণসংহিতা"য় এই মত প্রচার করিয়াছেন। "নবজীবন" এর প্রবন্ধে তাঁহার উক্তি উদ্ধৃত হইয়াছে—আমরাও নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিলাম— শ্রীকৃষ্ণসংহিতা।

যদ্‌যদ্ভাবগতো জীবস্তত্তদ্ভাবগতো হরিঃ।
অবতীর্ণ স্বশক্ত্যা স ক্রীড়তীব জনৈঃ সহ॥
মৎস্যেষু মৎস্যভাবোহি কচ্ছপে কূর্ম্মরূপকঃ।
মেরুদণ্ডযুতে জীবে বরাহভাববান্ হরিঃ॥
নৃসিংহো মধ্যভাবোহি বামনঃ ক্ষুদ্র মানবে।
ভার্গবোঽসভ্যবর্গেষু সভ্যেদাশরথিস্তথা॥
সর্ব্ববিজ্ঞানসম্পন্নে কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং।
তর্কনিষ্ঠনরে বুদ্ধো নাস্তিকে কল্কিরেবচ॥
অবতারা হরেভাবা ক্রমোর্দ্ধগতিমদ্ধৃদি।
ন তেষাং জন্মকর্ম্মাদৌ প্রপঞ্চো বর্ত্ততে ক্বচিৎ॥
জীবানাং ক্রমভাবানাং লক্ষণানাং বিচারতঃ।
কালো বিভাজ্যতে শাস্ত্রেদশধা ঋষিভিঃপৃথক্॥
তত্তৎকালগতো ভাবাঃ কৃষ্ণস্য লক্ষ্যতে হি যঃ।
স এব কথ্যতে বিজ্ঞৈরবতারো হরেঃ কিল॥

"মায়াবদ্ধজীব যে যে ভাব প্রাপ্ত হইয়া যে যে স্বরূপ পাইতেছেন, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার প্রাপ্তভাব স্বীকার করত নিজ অচিন্ত্যশক্তি দ্বারা তাহার সহিত আধ্যাত্মিকরূপে অবতীর্ণ হইয়া লীলা করেন। জীব যখন মৎস্যাবস্থা প্রাপ্ত, ভগবান্ তখন মৎস্যাবতার, মৎস্য নির্দ্দণ্ড, নির্দ্দণ্ডতা ক্রমশঃ বজ্রদণ্ডাবস্থা হইলে কূর্ম্মাবতার বজ্রদণ্ড ক্রমশঃ মেরুদণ্ড হইলে বরাহ-অবতার হন। নরপশুভাবগত জীবে নৃসিংহাবতার, ক্ষুদ্র মানবে বামনাবতার, মানবের অসভ্যাবস্থায় পরশুরাম, সভ্যাবস্থায় রামচন্দ্র। মানবের সর্ব্ববিজ্ঞানসম্পত্তি হইলে ভগবদ্ভাব বুদ্ধ এবং

নাস্তিক হইলে কল্কি এইরূপ প্রসিদ্ধ আছে। জীবের ক্রমোন্নত হৃদয়ে যে সকল ভগবদ্ভাবের উদয়, কালে কালে দৃষ্ট হইয়াছে, সেই সকলই অবতার, সেই সকল ভাবের উৎপত্তি ও কার্য্য-সকলে প্রাপঞ্চিকত্ব নাই. ঋষিরা জীবগণের উন্নতির ইতিহাস আলোচনা করত ঐতিহাসিক কালকে দশভাগে বিভাগ করিয়াছেন। যে যে সময়ে একটি একটি অবস্থান্তর লক্ষণ, রূঢ়রূপে লক্ষিত হইয়াছে, সেই সেই কালের উন্নতভাবকে অবতার বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।”

কবি নবীন সেন ও রৈবতক।

নবীনচন্দ্রের রৈবতক কাব্যে দশাবতারতত্ত্ব স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ ব্যাস ও অর্জ্জুনকে বুঝাইতেছেন—

“সৃষ্টির যখন
যেরূপ অভাব ঘটে, উন্নতি তেমন।
মানবের দুই যুগ, কিন্তু জগতের
এইরূপে কতযুগ গিয়াছে বহিয়া
কে বলিবে ভগবন্? যুগ-উপযোগী
চরম উন্নতি অবতারণ যখন
ঘটিয়াছে, সে যুগের সেই অবতার।
প্রথম সলিলে মৎস্য। এই নীতিবলে
সলিল পঙ্কিল যবে, কূর্ম্ম অবতার
পঙ্ক দৃঢ়তর যবে, আচ্ছন্ন উদ্ভিদে,
হইল বরাহসৃষ্টি। প্রণীর শৃঙ্খল
ক্রমশঃ উন্নতিচক্রে হয়ে দীর্ঘতর,
নরসিংহ অবতার। বিস্ময়-মূরতি।
অর্দ্ধ পশু অর্দ্ধ নর। ক্রমে পশুভাগ-
তিল তিল যুগে যুগে হইয়া অন্তর
বিকৃত মানবমূর্ত্তি জন্মিল বামন।

তিন পদ ভূমি নাহি মিলিল তাহার,—
জগৎ অরণ্যময় হিংস্র-জন্তু বাস!
ঘুরিল উন্নতিচক্র,—সকুঠার নর
আসিলা পরশুরাম। বাধিল সমর
বন, বনচর সহ; নাহি শরীরেতে
পশুভাগ, পশুবৃত্তি হৃদয়ে প্রবল,—
পশু-নির্ব্বিশেষ নর। সেই পশুভাব
যেদিন হইতে হ্রাস হইতে লাগিল,
সেইদিন জগতের যুগ বর্ত্তমান
হইল সঞ্চার। সেইদিন মহা দিন।
প্রকৃত মানব জন্ম হইল সেদিন।
অশ্রান্ত উন্নতি পক্ষে আসিল কৈশোর
কৈশোরের রামচন্দ্র প্রীতি অবতার,—
ত্রেতার চরমোন্নতি। যৌবন তাহার
আসিবে না ঋষিশ্রেষ্ঠ! সুদর্শন চক্র
উন্নতির, এখানে কি হইল অচল?
না না দেব নাহি তার মুহূর্ত্ত বিশ্রাম।
উন্নতির পথ ছায়াপথের মতন,
—প্রীতিময়, সুখময়, পবিত্রতাময়—
রহিয়াছে প্রসারিত সেই পথ প্রভো
জাতীয়-জীবনতরী নিব ভাসাইয়া।"

নব্যবঙ্গের হিন্দুচিন্তার ইতিহাসে অবতার-কথা আলোচনার যে বিবরণ দেওয়া হইল, তাহা হইতে এই কটি সিদ্ধান্ত করা যায়। প্রথম সিদ্ধান্ত এই যে এই সমুদয় ব্যাখ্যাকারিগণ শাস্ত্রে বা নিজেদের প্রাচীন সাধনায় বিশ্বাস করিতেন না।

তিনটি সিদ্ধান্ত।

তাঁহারা অন্তরে অন্তরে বিশ্বাস করিতেন যে বর্ত্তমান কালের জড়বিজ্ঞান-সমূহ যে সত্য প্রচার করিতেছেন তাহাই একমাত্র সত্য ও মানব-জ্ঞানের তাহাই শেষ কথা এবং যে পদ্ধতি অবলম্বনে সত্যান্বেষণে প্রবৃত্ত হইয়াছেন তাহাই একমাত্র পদ্ধতি। তদ্ব্যতীত অন্য কোন পদ্ধতি হইতে পারে না।

দ্বিতীয় সিদ্ধান্ত এই যে শাস্ত্রের ও নিজেদের অতীত সাধনার উপর বিশ্বাস না থাকায় তাঁহারা কেহই শাস্ত্র জানিবার জন্য অধিক পরিশ্রম বা অনুসন্ধান করেন নাই। বিদ্যালয়ে যে শিক্ষা পাইয়াছিলেন তাহাতেই তাঁহারা যশস্বী হইয়াছিলেন; সুতরাং অন্যরূপ শিক্ষা বা চিন্তা পদ্ধতি যে আছে বা থাকিতে পারে, ইহা মনে করিবারও তাঁহাদের অবসর হয় নাই। তাহা হইলে তাঁহারা শাস্ত্রীয় সিদ্ধান্তের সমর্থন করিতে চেষ্টান্বিত হইলেন কেন? ইহার কারণ প্রধানতঃ দুইটি। প্রথমতঃ, পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রেরণায় বা পাশ্চাত্য জাতিদের অনুকরণে দেশকে ভালবাসিতে চেষ্টা করিতেছিলেন, দেশের সম্বন্ধে ভিন্ন জাতিকে যাহারা নিন্দা করিতেন তর্কের দ্বারা তাঁহাদের পরাস্ত করিবার একটা আকাঙ্ক্ষাও তাঁহাদের ছিল। দ্বিতীয়তঃ তাঁহারা তর্ক করিতে দক্ষ হওয়াই বিদ্যার একমাত্র পরিচায়ক বলিয়া বিবেচনা করিতেন। জীবনের দ্বারা সত্য বিশেষকে আশ্রয় করাই যে বিদ্যা, এ শিক্ষা শৈশব হইতে তাঁহারা পান নাই।

তৃতীয় সিদ্ধান্ত এই যে জড়বিজ্ঞান সত্য। তাহাকে গ্রহণ করিতে হইবে। কিন্তু অধ্যাত্মবিজ্ঞান বলিয়াও একটা জিনিস আছে। অধ্যাত্ম বিজ্ঞানের উপদেশ-সমূহ যে সকল সময়েই জড়-বিজ্ঞানের সাহায্যে প্রতিষ্ঠিত বা প্রমাণীকৃত হইতে পারে বা হওয়া আবশ্যক, তাহার কোন কারণ নাই। ঋষির সকল কথা জড় বৈজ্ঞানিকের যন্ত্রের সাহায্যে পরিমাপ করা যায় না এবং বৈজ্ঞানিকের বৈজ্ঞানিকী বুদ্ধির নিকট তাঁহার অনেক কথাই

অকিঞ্চিৎকর, কিন্তু তাই বলিয়া কবির কথা মিথ্যা নহে। বরং অনেক সময়ে কবির কথা বেশী সত্য।

অধ্যাত্ম বিজ্ঞান।

প্রাচীন হিন্দুসাধনার যদি কোন বিশিষ্টতা থাকে, সেই সাধনা বর্ত্তমান যুগে ভারতের ও সমগ্র মানবজাতির যদি কোন কল্যাণসাধন করিতে পারে, তাহা হইলে আমাদিগকে ক্রমে ক্রমে এই তত্ত্ব কেবল তর্ক বা যুক্তির দ্বারা নহে, জীবনের সাধনার দ্বারা বা অধ্যাত্ম দৃষ্টি ও অন্তর্দৃষ্টির দ্বারা উপলব্ধি করিতে হইবে। আজ যেমন আমরা জড়বিজ্ঞান বলিয়া একটি অতি বৃহৎ ও অতি গৌরবময় বস্তু দেখিতেছি, তেমনি অধ্যাত্ম-বিজ্ঞান বলিয়া একটি বস্তু ছিল এবং আছে। জীবনের সাধনার দ্বারা ভারতের ও প্রাচীন জগতের অন্যান্য স্থানের ঋষিগণ আধ্যাত্ম-বিজ্ঞানের এই সব তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়াছিলেন ও প্রচার করিয়াছিলেন। জড়বিজ্ঞান যেমন মানবকে অনেক শক্তি ও সুবিধা দিয়াছে, অধ্যাত্মবিজ্ঞানও তেমনি মানবকে আরও অনেক উচ্চতর ও মহত্তর শক্তি ও সুবিধা দেয়। জড়বিজ্ঞানের নিকট মানব অনেক শক্তি এবং সুবিধা পাইয়াও নিজেদের প্রকৃত কল্যাণসাধন করিতে পারে নাই, বরং অশান্তি ও দুঃখের বৃদ্ধি হইয়াছে, মানুষ জড়ের উপাসনায় প্রমত্ত হইয়া নিজেকেই হারাইয়া বসিয়াছে, কিন্তু তাই বলিয়া জড় বিজ্ঞানের দোষ দিবার প্রয়োজন নাই। এখন জগতে অধ্যাত্মবিজ্ঞানের প্রবর্ত্তন আবশ্যক। এই আধ্যাত্মবিজ্ঞান মানবকে যে শক্তি ও সুবিধা আনিয়া দিবে, যে আলোক ও সান্ত্বনা আনিয়া দিবে তাহা অতুলনীয়।

হিন্দুদিগের বেদ ও বেদাশ্রিত শাস্ত্রসমূহ সেই প্রাচীন অধ্যাত্ম-বিজ্ঞান। পুরাণ বলিয়া যে সমুদয় গ্রন্থ হিন্দুসমাজে প্রচলিত রহিয়াছে, এবং যে সমুদয় গ্রন্থের সাহায্যে সাধারণ হিন্দুর ধর্ম্ম-জীবনের সংস্কারসমূহ গড়িয়া উঠিয়াছে সেই পুরাণগুলি গল্পের পুস্তক নহে। প্রাচীনেরা এই পুরাণ-সমূহকে অনাদি

বেদের প্রমাণক গ্রন্থ বলিয়াছেন। এই পুরাণসমূহের মধ্যেই অবতার-কথা বিস্তৃতভাবে প্রচারিত হইয়াছে। আমরা পুরাণসম্বন্ধে কোনও মত কাহাকেও অন্ধভাবে গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিব না এবং বর্ত্তমান স্বাধীনচিন্তার যুগে সে প্রকারের অন্যায় অনুরোধ লোকে রাখিবেই বা কেন? এমন কি হিন্দু-দিগের যে একটি অতি বৃহৎ অধ্যাত্মবিজ্ঞান ছিল, না বুঝিয়া এ কথা লইয়াও যেন কেহ অকারণ লাফালাফি না করেন, কারণ তাহাতে ইষ্ট অপেক্ষা অনিষ্টেরই সম্ভাবনা অধিক এবং আমরা সে অনিষ্টের পরিচয়ও প্রতিদিন পাইতেছি। আমাদের অনুরোধ তাড়াতাড়ি কোনরূপ মীমাংসা না করিয়া, বুঝি বা না বুঝি কেবল তর্ক করিয়া নিজেদের শাস্ত্রের বা ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা বা অভ্রান্ততা প্রতিপাদন করিবার জন্য দু-একটি সুলভ বিলাতী মতবাদের দোহাই দিয়া যেন উপহাসাস্পদ না হই।

ধীরভাবে শাস্ত্র ও সাধকমণ্ডলীর অভিজ্ঞতার সাহায্যে অবতার-কথার ন্যায় আবশ্যকীয় কথার আলোচনা করিতে হইবে। সেই আলোচনার দিকে কাহারও কাহারও মনোযোগ আকর্ষণ করিবার জন্য এবং সেই আলোচনার সাহায্যে ভাগবত-ধর্ম্ম বা যুগধর্ম্ম নির্দ্ধারণের কিরূপ সুবিধা হয় তাহাই দেখাইবার জন্য আমরা এই আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছি।

ডার্বিনের মতের কিঞ্চিৎ প্রতিবাদ।

আলোচনার প্রারম্ভে আমরা একটি কথা বলিতে চাই। ডার্বিনের সিদ্ধান্ত পাশ্চাত্য দেশেও বিশেষভাবে সমালোচিত হইয়াছে। তাঁহার সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে বড় বড় পণ্ডিতেরা যাহা বলিয়াছেন, তাহা শুনিলে আমরা বুঝিতে পারিব যে হিন্দুধর্ম্ম প্রতিষ্ঠার জন্য ডার্বিনের দোহাই দেওয়ার দিন অনেক কাল চলিয়া গিয়াছে। প্রতীচ্য জগতেও অধ্যাত্মবিজ্ঞানের আলোচনা করিবার এবং প্রাচীন জগতের অধ্যাত্মবিদ্যা বা শাস্ত্রীয় শিক্ষা একালের চিন্তাপ্রণালীর সাহায্যে আয়ত্ত করিবার নানারূপ

চেষ্টা হইতেছে। ডার্বিনের মত-সম্বন্ধে আমরা কেবল একজন বিলাতী পণ্ডিতের মত উদ্ধৃত করিতেছি।

ওয়ালেস্। ওয়ালেস্, ডার্বিনের মত আলোচনা করিয়া নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

I fully accept Mr. Darwin's conclusion as to the essential indentity of man's bodily structure with that of the higher Mammalia, and his descent from some form common to man and the anthropoid apes. The evidence of such descent appears to me to be overwhelming and conclusive. * * Bnt this is only the beginning of Mr. Darwin's work. * * His whole argument tends to the conclusion that man's entire nature and all his faculties whether moral intellectual or spiritual have been derived from their rudiments in the lower animals in the same manner and by the action of the same general laws, as his physical nature has deen derived.

This conclusion appears to me not to be supported by adequate evidence and to be directly opposed to many well-ascertained facts. To prove continuity and progressive development of the intellectual and moral faculties from animal to man, is not the same as proving that these faculties have been developed by natural selection. * * Because man's physical structure has been developed from an animal form by natural selection it does not necessarily follow that his mental nature, even though developed pari passu with it has been developed by the same causes only.

উচ্চশ্রেণীর স্তন্যপায়ী বা স্তন্যদায়ী প্রাণীর সহিত মানুষের দৈহিক গঠনের যে মিল আছে, এ বিষয়ে আমি ডার্বিনের মত

সম্পূর্ণরূপে স্বীকার করি এবং মানুষ যে মানব-সদৃশ বানরগণের সহিত একই সাধারণ পূর্ব্বপুরুষ হইতে দৈহিক হিসাবে উদ্ভূত তাহাও আমি স্বীকার করি। এই সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠা করার জন্য যে সমুদয় প্রমাণ সংগৃহীত হইয়াছে তাহা সুপ্রচুর এবং তাহাতে সন্দেহ করিবার উপায় নাই। * কিন্তু ইহা ডারবিনের কার্য্যের প্রথম অংশ মাত্র। ডারবিন শক্তি প্রয়োগ করিয়া ইহাই সপ্রমাণ করিতে চাহেন যে মানুষের সমগ্র প্রকৃতি, তাহার নৈতিক, মানসিক ও অধ্যাত্মিক বৃত্তি-সমূহ নিম্নতর পশুদের মধ্যে প্রাথমিক অবস্থায় যে সমুদয় বৃত্তি আছে, তাহা হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। দেহের উদ্ভব যে প্রণালীতে যে সকল নিয়মানুসারে হইয়াছে, এই বৃত্তিগুলির উদ্ভব সেই প্রণালীতে সেই সমুদয় নিয়মানুসারেই হইয়াছে। এই সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে আমার মনে হয় যে ইহার যথেষ্ট প্রমাণ নাই. এমন কি এমন অনেক প্রমাণ উত্তমরূপে নির্দ্ধারিত হইয়াছে, যাহার আলোচনায় এই সিদ্ধান্তের বিপরীত সিদ্ধান্তই সত্য বলিয়া মনে হয়। মানুষের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক বৃত্তিগুলি পারম্পর্য্যসূত্রের মধ্য দিয়া ক্রমবিকাশ লাভ করিয়াছে, ইহা প্রমাণিত হইলেও এই ব্যাপার যে প্রাকৃতিক নির্ব্বাচনের দ্বারা সাধিত হইয়াছে, তাহা সপ্রমাণ হয় না। * * মানুষের দেহ প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন-বিধির সাহায্যে পশুদেহ হইতে ক্রমে ক্রমে বিকশিত হইয়াছে বলিয়াই এবং দেহের ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে মানসিক প্রকৃতির বিকাশ পরিদৃষ্ট হইলেও ইহা স্বতঃই প্রমাণিত হয় না যে মানবের মানসিক প্রকৃতি কেবলমাত্র সেই একই কারণ-পরম্পরায় বিকশিত হইয়াছে।

এই গেল পণ্ডিত ওয়ালেসের মত। পাশ্চাত্য সুধীগণের মত আলোচনা করিতে হইলে আমাদিগকে বিশেষ যত্নের সহিত এই মত কতদূর সারবান তাহা অবধারণ করিতে হইবে।

আর একজন আধুনিক বড পণ্ডিতের মত উদ্ধৃত করিতেছি পাশ্চাত্য জগতে ইঁহার মতেরও মূল্য আছে। ইঁহার নাম অধ্যাপক বার্চ্চৌ। (Professor Virchow) ইনি বার্লিন বিশ্ব-বিদ্যালয়ের অধ্যাপক। ইংরাজী ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে এক বড় বৈজ্ঞানিক সভায় তিনি এই মত ব্যক্ত করেন।

The higher faculties in main point clearly to an unseen world—to a world of spirit to which the world of matter is altogether subordinate.

মানুষের প্রবৃত্তিতে যে সকল উন্নততর বৃত্তি রহিয়াছে, সেগুলি আলোচনা করিলে ইহাই পরিষ্কাররূপে মনে হয় যে এক অদৃষ্ট জগৎ আছে। সে জগৎ আত্মার বা চৈতন্যের জগৎ, এই জড়জগৎ ইহা সেই চিণ্ময় আধ্যাত্মিক জগতের সম্পূর্ণরূপে অধীন।

পুরাণ-ব্রহ্মবিদ্যা।

এ বিষয়ে পাশ্চাত্য দেশের পাণ্ডিতগণের মত আর অধিক উদ্ধার করিব না। পুরাণ সমূহ আমাদের দেশে অধ্যাত্মবিজ্ঞান প্রচার করিয়াছেন, আমরা পুরাণসমূহের নিকট ধর্ম্মজীবন লাভ করিয়াছি এবং এখনও করিতেছি। পৌরাণিকী ব্রহ্মবিদ্যা সাধন-শাস্ত্রের অন্তর্গত। যেমন তেমন করিয়া বিলাতী নাম-জাদা পণ্ডিতদের দু একটা মতের সহিত মিল আছে দেখাইয়া যাহারা পৌরাণিক সাধনার পক্ষে ওকালতি করিয়াছেন, তাঁহারা অনেকেই অনধিকারচর্চ্চা করিয়াছেন, তাহাতে উপকার অপেক্ষা অপকার হইয়াছে অধিক।

প্রাচীন শাস্ত্রে ও সাধকমণ্ডলীর মধ্যে অবতার-কথার যে রহস্য পাওয়া যায় আমরা এইবার তাহার আলোচনা করিতেছি। পৌরাণিকী ব্রহ্মবিদ্যা বা পুরাণ সমূহের দ্বারা প্রচারিত অধ্যাত্মবিজ্ঞানের পূর্ণাঙ্গ পরিচয় পাইতে হইলে শ্রীমদ্ভাগবতের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে। এই মত বহুকাল পূর্ব্বেই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, সুতরাং এজন্য আর বাক্যব্যয় না করিয়া

আমরা পুরাণচক্রবর্ত্তী, পারমহংস্য সংহিতা, বেদ-সার শ্রীমদ্ভাগবতের আশ্রয় গ্রহণ করিতেছি।

শ্রীমদ্ভাগবতে নানাস্থানে অবতারতত্ত্ব ও অবতার-কথা বর্ণিত হইয়াছে। নৈমিশারণ্যে ঋষিসংঘে যে ছয়টি প্রশ্ন উত্থাপিত হইয়াছিল, এবং যে ছয়টী প্রশ্নের উত্তরে এই শ্রীমদ্ভাগবত-শাস্ত্র কথিত হইয়াছিল, তাহার মধ্যে একটি প্রশ্ন অবতার-সম্বন্ধীয়। সুতরাং শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে অবতার কথা কীর্ত্তন করা শ্রীমদ্ভাগবতের অন্যতম উদ্দেশ্য। শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম স্কন্ধে তৃতীয় অধ্যায়েই আমরা অবতারগণের তালিকা দেখিতে পাই। এই অধ্যায় পাঠ করিলে আমরা প্রথমেই বুঝিতে পারি যে সর্ব্বসাধারণের মধ্যে যে কোন কারণে দশাবতারের কথা কীর্ত্তিত বা প্রচারিত হইলেও অবতার দশটি নহেন। শ্রীমদ্ভাগবতের দ্বিতীয় স্কন্ধের সপ্তম অধ্যায়ে পঁচিশটি অবতারের কথা আছে, আবার একাদশ স্কন্ধের চতুর্থ অধ্যায়ে কুড়িটি বা একুশটি অবতারের কথা আছে। নর ও নারায়ণকে একটি মিলিত অবতার করিলে সংখ্যা হইবে কুড়ি আর উঁহাদের পৃথক সংখ্যা হইবে একুশ। সুতরাং দশাবতারের কথা কোথা হইতে আসিল তাহা অনুসন্ধেয়। অনুসন্ধানে তাহা আবিষ্কার করিতে হইবে। আবিষ্কার প্রয়োজন; নিজ নিজ বুদ্ধির আলোকের সাহায্যে নিজ নিজ ইচ্ছামত বিচার ও ব্যাখ্যা মূল্যহীন। If you apply criticism merely to judge, but not to discover, then the value of criticism is lost. কিন্তু একালে অনেকে যে বিচার করিতেছেন। সুতরাং ব্যস্ত হইবেন না।

অবতারা হ্যসংখ্যেয়া হরেঃ সত্ত্বনিধের্দ্বিজাঃ।
যথাবিদাসিনঃ কুল্যাঃ সরসঃ স্যুঃ সহস্রশঃ॥ ১।৩-২৬

হে দ্বিজগণ! সত্ত্বনিধি হরির অবতার অসংখ্য। অপক্ষয়-

Class No... 294'592
Acc. No. ... 11213
 ... Sridharan Granthagar

শূন্য জলাশয় হইতে সহস্র সহস্র ক্ষুদ্র জলপ্রবাহ নির্গত হয়, তাহার ন্যায় ভগবান্ হইতে নানাবিধ অবতার হইয়াছে।

অবতার প্রসঙ্গে অবতার ব্যতীত শ্রীভগবানের বিভূতির কথাও স্মরণ করা উচিত, কারণ অবতার ও বিভূতির মধ্যে বিশেষরূপ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। এই কারণে শ্রীমদ্ভাগবত পরবর্ত্তী শ্লোকে বলিলেন।

ঋষয়ো মনবো দেবা মনুপুত্র মহৌজসঃ।
কলাঃ সর্ব্বে হরেরেব সপ্রজাপতয়ঃ স্মৃতাঃ॥

মহাপ্রভাব-সম্পন্ন দেব, ঋষি, মনু, মনুপুত্র, এবং প্রজাপতি প্রভৃতি সকলেই তাঁহারই অংশ

এই শ্লোকটি আলোচনার সময় শ্রীমদ্ভাগবদ্গীতার বিভূতি-যোগ স্মরণ করিতে পারেন।

শ্রীমদ্ভাগবতে অন্যত্র অর্থাৎ সপ্তম স্কন্ধ নবম অধ্যায়ে শ্রীপ্রহ্লাদ ভগবানের মধুকৈটভ বধকালীন হয়গ্রীব অবতারের কথা উল্লেখ করিয়া বলিতেছেন—

ইত্থং নৃতির্য্যগৃষি দেবঝষাবতারৈর্লোকান্ বিভাবয়সি
হংসি জগৎ প্রতীপান্।
ধর্ম্মং মহাপুরুষপাসি যুগানুবৃত্তং ছন্নঃ কলৌ
যদভস্ত্রিযুগোঽথ স ত্বং॥

হে মহাপুরুষ! আপনি এই প্রকারের মনুষ্য, তির্য্যক্, ঋষি, দেব, মৎস্য ইত্যাদি অবতারদ্বারা লোকসকলের পালন এবং যে সমস্ত ব্যক্তি জগতের প্রতিকূল, তাহাদিগকে বিনাশ আর যুগে যুগে যে ধর্ম্ম অনুবৃত্ত তাহা পরীক্ষা করেন। কিন্তু কলিযুগে আপনি ছন্ন হইয়াছিলেন, অতএব আপনি ত্রিযুগ বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছেন।

কলিযুগে "ছন্ন" শ্রীধর স্বামী এই বাক্যের রহস্য ব্যাখ্যা করেন নাই, শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয় এই রহস্যের ব্যাখ্যা করিয়াছেন ; তাঁহার ব্যাখ্যা এই।

"ত্বং কলৌ ছন্নঃ অন্যদীয়রূপভাবাভ্যাং বহিতাচ্ছন্নঃ" অর্থাৎ কলিতে তুমি অন্যের (শ্রীরাধার) রূপ ও ভাবের দ্বারা আচ্ছন্ন।

যাহা হউক অসংখ্য অবতারের সন্ধান পাওয়া গেল। শ্রীরূপ গোস্বামীকৃত শ্রীলঘু ভাগবতামৃত গ্রন্থ হইতে আমরা এই পুস্তকে একচল্লিশ অবতারের কথা বর্ণনা করিয়াছি। শ্রীশ্রীভক্তমাল গ্রন্থে চব্বিশ অবতারের কথা উল্লিখিত হইয়াছে। ভক্তমাল গ্রন্থ হইতে নিম্নে সেই স্থান উদ্ধৃত হইল :

ভক্তমাল গ্রন্থে চব্বিশ অবতার।

জয় জয় মীন বরাহ কমঠ।
জয় জয় নরহরি বামন উদ্ভট॥
জয় ভৃগুপতি রাম রাঘব বুদ্ধ কল্কি।
ব্যাস পৃথু হরি হংস মন্বন্তর কল্কি॥
যজ্ঞ ঋষভ শ্রীধন্বন্তরি হয়গ্রীব।
বদ্রীপতি সনকাদি শ্রীকপিলদেব॥
আর দত্ত এই যে চব্বিশ অবতার।
অবতারী কৃষ্ণচন্দ্র সর্ব্বরূপ যার॥

এইবার শ্রীমদ্ভাগবত হইতে তাঁহাদের পরিচয় গ্রহণ করা যাউক।

পুরুষাবতার।

শ্রীমদ্ভাগবত অবতার সমূহের পরিচয় দিবার পূর্ব্বে পুরুষ বা পুরুষাবতারের কথা বলিয়াছেন। কারণ ইনি অবতারগণের বীজ ও নিধান অর্থাৎ কার্য্যাবসানে প্রবেশ-স্থান। শ্রীধরস্বামী এই পুরুষ বা আদি নারায়ণ-রূপ সম্বন্ধে বলিয়াছেন, ইনি কটস্থ, অর্থাৎ অন্য অন্য অবতারদের ন্যায় ইঁহার আবির্ভাব তিরোভাব নাই। "এতত্তু কূটস্থং নত্বন্যাবতারবদাবির্ভাবতিরো-

Class No.... 11213
Acc No.... Sadharan Granthagar

ভাববৎ"। অবিকৃত ভাবে যিনি চিরকাল থাকেন তাঁহাকে কূটস্থ বলে। যিনি নিজে নিশ্চল অথচ যাহাকে আশ্রয় করিয়া যাবতীয় গতি ও পরিবর্ত্তন সম্ভব হইয়া থাকে তাঁহাকে কূটস্থ বলে।

Noumenon—the permanent possibility of all changes unchanged in itself.

শ্রীমদ্ভাগবতেও এই পুরুষকে যাবতীয় অবতারের অব্যয়বীজ ও নিধান বলা হইয়াছে।

শ্রীমদ্ভাগবত পাঁচটি শ্লোকে এই পুরুষের বা পুরুষাবতারের (আমরা পরে দেখিব তিনটি পুরুষাবতারের) পরিচয় দিয়াছেন। সেই শ্লোক-পাঁচটি এই।

"জগৃহে পৌরুষং রূপং ভগবান্ মহদাদিভিঃ।
সম্ভূতং ষোড়শকলমাদৌ লোকসিসৃক্ষয়া ॥
যস্যাম্ভসি শয়ানস্য যোগনিদ্রাং বিতন্বতঃ।
নাভীহ্রদাম্বুজাদাসীদ্‌ব্রহ্মা বিশ্বসৃজাম্পতিঃ ॥
যস্যাবয়বসংস্থানৈঃ কল্পিতো লোকবিস্তরঃ।
তদ্বৈ ভগবতো রূপং বিশুদ্ধং সত্ত্ব-মূর্জ্জিতং ॥
পশ্যন্ত্যদোরূপমদভ্রচক্ষুষা সহস্রপাদোরুভুজাননাদ্ভুতং।
সহস্রমূর্দ্ধশ্রবণাক্ষিনাসিকং সহস্রমৌল্যম্বরকুণ্ডলোল্লসৎ॥
এতন্নানাবতারাণাং নিধানং বীজমব্যয়ং।
যস্যাংশাংশেন সৃজ্যন্তে দেবতির্য্যঙ্‌ নরাদয়ঃ ॥"

এই কয়েকটি শ্লোক শ্রীমদ্ভাগবতের রহস্য শ্লোক। শ্রীধরস্বামী এই শ্লোকগুলির অর্থাৎ পুরুষতত্ত্বের রহস্য বিস্তারিতরূপে উদ্ঘাটন করেন নাই। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অনুবর্ত্তী আচার্য্যগণ এই রহস্য প্রচার করিয়াছেন। আমরা প্রথমে

শ্রীধরস্বামীপাদের পদাঙ্কানুসরণপূর্ব্বক শ্লোকগুলির সাধারণ অর্থ ব্যক্ত করিতেছি, তাহার পর রহস্যকথা ব্যক্ত হইবে।

"ভগবান্ লোকসকলের সৃষ্টির মানসে (লোক-সিসৃক্ষয়া) প্রথমেই (আদৌ (মহদাদিভিঃ) মহতত্ত্ব, অহঙ্কারতত্ত্ব এবং পঞ্চতন্মাত্র দ্বারা সম্ভুত ষোড়শকল অর্থাৎ একাদশ ইন্দ্রিয় এবং পঞ্চমহাভূত এই ষোড়শ অংশবিশিষ্ট পুরুষরূপ গ্রহণ করিলেন। ১। এই শ্লোকের টীকার শেষে শ্রীধরস্বামী বলিতেছেন—

যদ্যপি ভগবদ্বিগ্রহো নৈবম্ভূতস্তথাপি বিরাড়্ জীবান্তর্যামিণো ভগবতো বিরাড়্রূপেণ উপাসনার্থমেবমুক্ত মিতি দ্রষ্টব্যং।

অর্থাৎ যদিও ভগবদ্বিগ্রহ এরূপ নহে, তথাপি বিরাট জীবান্তর্যামী যে ভগবান্, বিরাট্ রূপের দ্বারা তাঁহার উপাসনার জন্য এইরূপ কথিত হইল।

যিনি অর্থাৎ যে ভগবান্ এই রূপ গ্রহণ করিলেন তাঁহার কথা বা পরিচয় ভাল করিয়া দিবার জন্য বলিলেন "পূর্ব্বে যোগনিদ্রা অর্থাৎ সমাধিরূপা নিদ্রা বিস্তার করিয়া (বিতন্বতঃ) একার্ণবে (অম্ভসি) শয়ন করিলে তাঁহার নাভিরূপ হ্রদে উৎপন্ন পদ্ম হইতে (নাভিহ্রদাম্বুজাৎ) বিশ্বস্রষ্টৃগণের পতি ব্রহ্মা (বিশ্বসৃজাম্পতি ব্রহ্মা) উৎপন্ন হইয়াছিলেন। ২। তিনি যে পৌরুষরূপ গ্রহন করিলেন তাহা কীদৃশ ? তাহার উত্তরে বলিতেছেন, তাঁহার অবয়বসংস্থানসমূহের দ্বারা অর্থাৎ চরণাদি সন্নিবেশ-দ্বারা ভূর্লোকাদি লোক সমস্ত কল্পিত হয়। যিনি একার্ণবে শয়ন করেন, তাঁহার বিগ্রহ কিরূপ ? ইহার উত্তরে বলিতেছেন, সেই ভগবানের রূপ বিশুদ্ধ অর্থাৎ রজস্তমোগুণের স্পর্শশূন্য এবং নিরতিশয় সত্ত্ব। ৩। [শ্রীধর স্বামীর টীকার ইহাই অবিকল অনুবাদ। প্রচলিত অনুবাদে এ প্রকারে অনুবাদ করা হয় নাই। এই প্রকারে অবিকল অনুবাদ করার উদ্দেশ্য এই যে শ্রীধরস্বামী এই শ্লোককয়টির মধ্যে যে একাধিক

পুরুষের ইঙ্গিত আছে তাহা স্পষ্টই বলিয়া গিয়াছেন, ইহা বুঝিতে পারা যাইবে।

সহস্র সহস্র অর্থাৎ অপরিমিত চরণ, অপরিমিত ঊরু ও অপরিমিত বদনে অতিশয় অদ্ভুত এবং অসংখ্য মস্তক, অসংখ্য শ্রবণ, অসংখ্য লোচন, অসংখ্য নাসিকা, তথা অসংখ্য শিরো-ভূষণ, অসংখ্য বসন ও অসংখ্য কুণ্ডলে শোভমান। যোগিগণ প্রখর জ্ঞানচক্ষুর সাহায্যে সর্ব্বদাই তাহা দেখিতে পান।

৪। এই বিরাটমূর্ত্তি নানা অবতারের বীজ অর্থাৎ যখন যে কোন অবতারের প্রয়োজন হয়, তখন এই মূর্ত্তি হইতেই তাহা হইয়া থাকে। এই মূর্ত্তি অব্যয় অর্থাৎ ইহার বিনাশ নাই। ইহা সকলের নিধান অর্থাৎ কার্য্যাবসানে প্রবেশ-স্থান। এই মূর্ত্তি কেবল যে অবতার-সমূহের বীজ, তাহা নহে; সৃষ্ট বস্তু মাত্রেরই বীজ, কেননা তাঁহার অংশে ব্রহ্মা, ব্রহ্মার অংশে মরীচি, অঙ্গিরা প্রভৃতি প্রজাপতিগণ, আবার মরিচ্যাদির অংশ হইতে দেব, তির্য্যক নরাদির উদ্ভব হইয়াছে।

৫। অবতারের আলোচনায় ইহাই প্রথম কথা। এই পুরুষাবতার ত্রিবিধ। সাত্বততন্ত্রে কথিত হইয়াছে "বিষ্ণুর পুরুষ নামক ত্রিবিধ রূপ শাস্ত্রে উল্লিখিত হইয়াছে। মহতত্ত্বের সৃষ্টিকর্ত্তা প্রথম পুরুষ, ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্য্যামী দ্বিতীয় পুরুষ, আর যিনি সর্ব্বভূতের অন্তর্যামী, তিনি তৃতীয় পুরুষ। এই ত্রিবিধ পুরুষকে জানিতে পারিলে সংসার নিবৃত্তি হয়।"

ত্রিবিধ।

> "বিষ্ণোস্তু ত্রীণি রূপানি পুরুষাখ্যান্যথো বিদুঃ।
> একস্তু মহতঃ স্রষ্টৃ দ্বিতীয়ং ত্বণ্ড সংস্থিতং।
> তৃতীয়ং সর্ব্বভূতস্থং তানি জ্ঞাত্বা বিমুচ্যতে॥"

আমরা এই পুরুষ-ত্রয়-রহস্য শ্রীমদ্ভাগবত ও বিষ্ণুপুরাণের সাহায্যে প্রবন্ধান্তরে বর্ণনা করিব। বর্ত্তমান প্রবন্ধে অন্যান্য অবতারগণের আলোচনা করিতেছি।

শ্রীমদ্ভাগবতে এই পুরুষের কথা বর্ণনা করার পরেই সনৎকুমারাদি অবতারের কথা বলা হইয়াছে। কিন্তু শৃঙ্খলাবদ্ধ-ভাবে অবতার-কথা আলোচনা করিতে হইলে পুরুষাবতারের পর গুণাবতারগণের সংবাদ লওয়া প্রয়োজন। লঘুভাগবতামৃত গ্রন্থে শ্রীল রূপ গোস্বামী মহোদয় পুরুষাবতারত্রয়ের উল্লেখের পর গুণাবতারত্রয়ের উল্লেখ করিয়াছেন। ব্রহ্মা, রুদ্র ও বিষ্ণু, এই তিন গুণাবতার। ইঁহারা দ্বিতীয় পুরুষাবতার গর্ব্ভোদশায়ী হইতে সৃষ্টি, লয় ও পালনের জন্য আবির্ভূত হইয়া থাকেন।

গুণাবতার।

পুরুষাবতার ও গুণাবতারের পর লীলাবতার, যুগাবতার, মন্বন্তরাবতার, শক্ত্যাবেশ অবতার প্রভৃতির কথা আলোচ্য। আমরা এইবার শ্রীমদ্ভাগবতের মূল শ্লোকের অনুসরণ করিতেছি।

স এব প্রথমং দেবঃ কৌমারং সর্গমাশ্রিতঃ।
চচার দুশ্চরং ব্রহ্ম ব্রহ্মচর্য্যমখণ্ডিতং॥

তিনিই প্রথমে কৌমার-সর্গ আশ্রয় করিয়া ব্রাহ্মণরূপে অখণ্ডিত ব্রহ্মচর্য্য ব্রত আচরণ করিয়াছিলেন।

চতুঃসন।

সনক, সনন্দ, সনাতন ও সনৎকুমার, এই চারিজনে চতুঃসন অবতার। শুদ্ধ জ্ঞান ও ভক্তি প্রবর্ত্তন এবং ব্রহ্মচর্য্যের আদর্শ-স্থাপন এই আবির্ভাবের উদ্দেশ্য। সনৎকুমারাদি-সৃষ্টি প্রাকৃত ও বৈকৃত এই উভয়াত্মক, শ্রীমদ্ভাগবতের তৃতীয় স্কন্ধের দশম অধ্যায়ে যেখানে নববিধ সর্গ আলোচিত হইয়াছে সেখানে এই কথা বলা হইয়াছে। কোনও অবতার সম্বন্ধে আলোচনা কালে একটি বিষয় লক্ষ্য করা উচিত। সেই অবতার, সৃষ্টির কোন্ অবস্থায় আসিয়াছিলেন তাহা নির্ণয় করিতে হইবে। সুতরাং অবতার-কথা-প্রসঙ্গে নবসর্গ এবং অতীত মন্বন্তর সমূহের বিষয় আলোচনা করা আবশ্যক।

চৈতন্যের ভূমি ও জড়ের-ভূমি।

প্রথমেই পুরুষাবতার, তাহার পর চতুঃসন অবতার। এই কথা জানিলেই আমরা বুঝিতে পারি যে ঋষিগণ চৈতন্য বা জ্ঞানের ভূমিতে দাঁড়াইয়া সৃষ্টিতত্ত্ব ও অবতার-কথা আলোচনা করিয়াছিলেন। ডাবিনের মত আশ্রয় করিয়া যাঁহারা অবতারতত্ত্ব বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছেন, তাঁহারা কত বড় ভুল করিয়াছেন, তাহা সহজেই দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। ইঁহারা জড়ের ভূমি হইতে পুরাণের অবতার-কথা বুঝিতে ও বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন, কাজেই প্রাচীন চিন্তা-পদ্ধতির পারম্পর্য্য-সূত্রই তাঁহারা অজ্ঞানতা, অহঙ্কার ও শ্রদ্ধাহীনতার দ্বারা ছিন্ন করিয়াছেন। দুঃখের কথা সন্দেহ নাই।

নারদ।

শ্রীল রূপ গোস্বামী মহোদয় 'চতুঃসন' অবতারের পর অর্থাৎ কৌমার সর্গের পর ঋষি-সর্গে দেবর্ষি নারদের অবতারত্ব বলিয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবতের শ্লোকে নারদকে তৃতীয় স্থান দেওয়া হইয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবতে বরাহদেবকে দ্বিতীয় স্থান দেওয়া হইয়াছে। শ্রীরূপ গোস্বামী মহোদয় বরাহদেবকে তৃতীয় স্থান দিয়াছেন। আমরা শ্রীরূপের পদাঙ্ক অনুসরণ করিতেছি।

তৃতীয়মৃষিসর্গং বৈ দেবর্ষিত্বমুপেত্য সঃ।
তন্ত্রং সাত্বতমাচষ্ট নৈষ্কর্ম্ম্যং কর্ম্মণাং যতঃ॥

তৃতীয় ঋষিসর্গে দেবর্ষিত্ব অর্থাৎ নারদরূপ গ্রহণ করিয়া সাত্বত তন্ত্র বলিয়াছেন, যে তন্ত্রের দ্বারা কর্ম্ম নৈষ্কর্ম্ম্য হইয়া যায় অর্থাৎ যাহাতে নিষ্কাম কর্ম্মের ব্যবস্থা আছে।

চতুঃসন ও নারদ প্রথম ব্রাহ্মকল্পে আবির্ভূত হইয়া প্রত্যেক কল্পেই আসিয়া থাকেন। অবতারগণের শ্রেণী-বিভাগের সময় তাঁহাদের পুনরাবৃত্তি কল্পে কল্পে কিম্বা প্রতি মন্বন্তরে, কিম্বা প্রতি যুগে হইয়া থাকে তাহাও আলোচ্য।

যাহা হউক আমরা পুরুষাবতারের পর চতুঃসন অবতারে শুদ্ধজ্ঞান ও ভক্তি এবং নারদ-অবতারে নিষ্কামকর্ম্ম পাইলাম। ইহার ভিতরে যে সূত্র রহিয়াছে তাহা বেশ বুঝিতে পারা যাইতেছে।

বরাহ। এইবার বরাহ-অবতার শ্রীমদ্ভাগবতে দ্বিতীয়স্থানে ইঁহার কথা বলা হইয়াছে। লঘুভাগবতামৃতের টিকায় শ্রীমদ্‌বলদেব বিদ্যাভূষণ বলিযাছেন "হত্রা প্রথম-দ্বিতীয়াদি শব্দাঃ সংখ্যা-পূর্ত্ত্যপেক্ষা নতু ক্রমাপেক্ষা" অর্থাৎ শ্রীমদ্ভাগবতের এই সমুদয় শ্লোকে প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় প্রভৃতি যে সংখ্যা প্রযুক্ত হইয়াছে, তাহা আবিভাবের ক্রমানুযায়ী নহে, কেবলমাত্র সংখ্যাপূরণের জন্য।

শ্রীবরাহ অবতার—

দ্বিতীয়ন্তু ভবায়াস্য রসাতলগতাং মহীং।
উদ্ধরিষ্যন্নুপাদত্ত যজ্ঞেশঃ শৌকরঃ বপুঃ॥

এই বিশ্বের উদ্ভবের জন্য, রসাতলগতা মহীকে উদ্ধার করিবার ইচ্ছায় শ্রীভগবান্ যজ্ঞেশ্বর বরাহরূপ ধারণ করেন।

শ্রীবরাহদেব সম্বন্ধে আলোচনা কালে অনেকগুলি কথা বিশেষভাবে বুঝিয়া লইতে হইবে। প্রথমতঃ পৌরাণিকগণ এই বরাহদেবকে যজ্ঞমূর্ত্তি বলিয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবতে তৃতীয় স্কন্ধের ত্রয়োদশ অধ্যায়ে ঋষিগণ কর্ত্তৃক কথিত বরাহদেবের যে স্তুতি রহিয়াছে তাহা পাঠ করিলেই যজ্ঞমূর্ত্তি কি তাহা বুঝিতে পারা যাইবে।

রূপং তবৈতন্ননু দুষ্কৃতাত্মনাং দুর্দ্দর্শনং
দেব যদধ্বরাত্মকং।
ছন্দাংসি যস্য ত্বচি বর্হিরোমস্বাজ্যং
দৃশি ত্বঙ্‌ঘ্রিষু চাতুর্হোত্রং॥

স্রুক্ তুণ্ড আসীৎ স্রুব ঈশ নাসয়ো-
রিড়োদরেচমসাঃ কর্ণরন্ধ্রে।
প্রাশিত্রমাস্যে গ্রসান গ্রহাস্তু তে
যচ্চর্ব্বণং তে ভগবন্নগ্নিহোত্রম্॥

"হে দেব, তোমার এই মূর্ত্তি যজ্ঞময়, কিন্তু তুষ্কৃতাত্ম ব্যক্তিরা ইহা দেখিতে পায় না। প্রভো, তোমার ত্বকে গায়ত্রী প্রভৃতি ছন্দঃ, রোমে যজ্ঞের জন্য আবশ্যক কুশ প্রভৃতি, চক্ষুদুটিতে যজ্ঞের ঘৃত, চারিটি চরণে হোত্র প্রভৃতি কর্ম্মচতুষ্টয়। তোমার মুখাগ্রে জুহূ নামক যজ্ঞপাত্র, তোমার নাসিকাদ্বয়ে স্রুব (এক প্রকার যজ্ঞপাত্র) উদরে ইড়া অর্থাৎ যজ্ঞীয় ভক্ষণ পাত্র, কর্ণরন্ধ্রে চমস বা যজ্ঞপাত্র, মুখে প্রাশিত্র (ব্রহ্মভাগ পাত্র)। মুখের ভিতরের ছিদ্রে সোমপাত্র নামক যজ্ঞ-পাত্র। হে প্রভো তোমার যে চর্ব্বণ, তাহাই অগ্নিহোত্র।"

বরাহদেবেব আবির্ভাব-সম্বন্ধে লঘুভাগবতামৃতে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে, পৌরাণিকী ব্রহ্মবিদ্যা যাহারা আয়ত্ব করিতে চাহেন তাঁহারা এই সিদ্ধান্ত জানিয়া রাখিবেন।

ব্রাহ্মকল্পে দুইবার বরাহদেবের আবির্ভাব হইয়াছে। প্রথমে স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে, ব্রহ্মার নাসারন্ধ্র হইতে আবির্ভূত হইয়া পৃথিবীর উদ্ধার করেন। দ্বিতীয় আবির্ভাব ষষ্ঠমন্বন্তরে অর্থাৎ চাক্ষুষ মন্বন্তরে হইয়াছিল। জল হইতে সেবারে আবির্ভাব হয় এবং বরাহদেব পৃথিবীকে উদ্ধার করেন ও হিরণ্যাক্ষকে বধ করেন। আদি বরাহের আবির্ভাবের অনেক কাল পরে হিরণ্যাক্ষের জন্ম, এই কারণে পূর্ব্বোক্ত মীমাংসা জানিয়া রাখা আবশ্যক। বরাহদেব কখন চতুষ্পাদ কখন নৃবরাহমূর্ত্তি। কখন মেঘের ন্যায় শ্যামসুন্দর, কখন চন্দ্রের ন্যায় শুভ্র।

মৎস্য।

বরাহ-অবতারের পর শ্রীরূপ গোস্বামী মৎস্যাবতারের কথা বলিয়াছেন, কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবতের তালিকায় মৎস্যদেবের নাম দশমি স্থানে দেওয়া হইয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবতের সংখ্যা যখন ক্রমানুযায়ী নহে তখন আমরা শ্রীরূপ গোস্বামীর মত গ্রহণ করিলাম।

রূপং স জগৃহে মাৎস্যং চাক্ষুষোদধিসংপ্লবে।
নাব্যারোপ্য মহীময্যামপাদ্বৈবস্বতং মনুং।

ভগবান্ মৎস্যরূপ ধারণ করিয়া চাক্ষুষ মন্বন্তরে যে জল-প্লাবন হয়, তাহাতে এই পৃথিবীকে নৌকারূপা করিয়া বৈবস্বত মনুকে রক্ষা করেন।

মৎস্যাবতারও এই কল্পে দুইবার হইয়াছে। স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে হয়গ্রীব নামক দৈত্যকে বিনাশ করিয়া মৎস্যদেব বেদ আহরণ করেন, আর চাক্ষুষ মন্বন্তরে রাজা সত্যব্রতকে কৃপা করেন। ইহা ছাড়া মৎস্যাবতার মন্বন্তরাবতার, অর্থাৎ প্রত্যেক মন্বন্তরেই একবার করিয়া তাঁহার আবির্ভাব হইয়া থাকে।

যজ্ঞ।

শ্রীমদ্ভাগবতের বর্ণনানুসারে এইবার নরনারায়ণ ঋষির আবির্ভাবের কথা বলিতে হয়, কিন্তু শ্রীরূপ গোস্বামী এই স্থানে যজ্ঞ-অবতারের কথা বলিয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবতে যজ্ঞ অবতারের কথা সপ্তম।

ততঃ সপ্তম আকুত্যাং রুচের্যজ্ঞোঽভ্যজায়ত।
স যামাদ্যৈঃ সুরগণৈরপাৎ স্বায়ম্ভুবান্তরং॥

ভগবান, রুচির ঔরসে আকূতির গর্ভে যজ্ঞনামে জন্মগ্রহণ করেন এবং স্বীয়পুত্র যাম নামক দেবগণের সহিত স্বয়ং ইন্দ্র হইয়া স্বায়ম্ভুব মন্বন্তর প্রতিপালন করেন।

মাতামহ মনু এই যজ্ঞকে 'হরি' এই নাম প্রদান করেন। ত্রিলোকীর মহার্ত্তি হরণ করিয়া তিনি এই নাম লাভ করেন।

এইবার নরনারায়ণ। শ্রীরূপ গোস্বামীর মতে ইনি ষষ্ঠ অবতার। কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবতে ইঁহার স্থান চতুর্থ।

নরনারায়ণ

তুর্য্যে ধর্ম্মকলাসর্গে নরনারায়ণাবৃষী।
ভূত্বাত্মোপশমোপেতমকরোদ্দুশ্চরং তপঃ॥

ধর্ম্মের পত্নী মূর্ত্তির গর্ভে নরনারায়ণনামে দুইটি ঋষি হইয়া আত্মোপশমান্বিত দুশ্চর তপস্যা করেন।

নর নারায়ণের হরি ও কৃষ্ণনামে আর দুই ভ্রাতার নাম পুরাণে পাওয়া যায়। চতুঃসন অবতার যেমন চারিজনকে লইয়া, এই অবতারও ঠিক সেইরূপ।

ইঁহার পর কপিল অবতার—

কপিল ও দ্বিবিধ সাংখ্য।

পঞ্চমঃ কপিলোনাম সিদ্ধেশঃ কালবিপ্লুতং।
প্রোবাচাসুরয়ে সাংখ্যং তত্ত্বগ্রামবিনির্ণয়ং॥

ভগবান্ কপিল-নামে সিদ্ধগণের অধিপতি হইয়া আসুরি ব্রাহ্মণকে তত্ত্ব-সমূহের নির্ণায়ক সাংখ্য-শাস্ত্র উপদেশ করেন।

শ্রীরূপ-গোস্বামীর মতে সাংখ্যশাস্ত্র দ্বিবিধ। যে সাংখ্যশাস্ত্র বেদ-বিরুদ্ধ এবং কুতর্কজালপূরিত সেই সাংখ্য-শাস্ত্রেরও বক্তার নাম কপিল এবং শ্রোতার নাম আসুরি, কিন্তু এই যে দ্বিতীয় কপিল ইনি শ্রীভগবানের অবতার নহেন। যিনি অবতার তাঁহার পিতার নাম কর্দ্দম ঋষি এবং মাতার নাম দেবহূতি। তাঁহার উপদেশ শ্রীমদ্ভাগবতের তৃতীয় স্কন্ধে বর্ণিত হইয়াছে।

অষ্টম অবতার দত্তাত্রেয়।

দত্তাত্রেয়।

ষষ্ঠমত্রেরপত্যত্বং বৃতঃ প্রাপ্তোঽনসূয়য়া।
আন্বীক্ষিকীমলর্কায় প্রহ্লাদাদিভ্য উচিবান্॥

অত্রিপত্নী অনসূয়া-কর্ত্তৃক প্রার্থিত হইয়া ভগবান্ তাঁহার পুত্রত্ব স্বীকার করেন। এই অবতারে তিনি অলর্ক ও প্রহ্লাদ প্রভৃতি ভক্তগণকে আত্ম-বিদ্যা উপদেশ করেন।

ব্রহ্মাণ্ড-পুরাণে এই দত্তাত্রেয় অবতার সম্বন্ধে কথিত হইয়াছে—

বরং দত্তানসূয়ায়ৈ বিষ্ণুঃ সর্ব্বজগন্ময়ঃ।
অত্রেঃ পুত্রোঽভবৎ তস্যাং স্বেচ্ছামানুষবিগ্রহঃ।
দত্তাত্রেয় ইতি খ্যাতো যতিবেশবিভূষিতঃ॥

সকল জগতের নিদান বিষ্ণু অনসূয়াকে বরদান করিয়া তাঁহার গর্ভে অত্রির পুত্ররূপে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। স্বেচ্ছায় মানব-মূর্ত্তিধারী সেই হরির নাম দত্তাত্রেয়। তিনি যতিবেশে বিভূষিত।

হয়শীর্ষ, হংস, ধ্রুবপ্রিয়

শ্রীরূপ গোস্বামীর মতে নবম, দশম ও একাদশ অবতারের নাম হয়শীর্ষা, শ্রীহংস ও ধ্রুবপ্রিয়। শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম স্কন্ধের তৃতীয় অধ্যায়ে, যেখানে অবতারগণের তালিকা দেওয়া হইয়াছে, সেখানে এই তিনটী অবতারের নাম নাই। কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবতের দ্বিতীয় স্কন্ধে এই তিন অবতারের নাম ও পরিচয় পাওয়া যায়। প্রথম স্কন্ধের তৃতীয় অধ্যায়ে অবতারগণের নাম ও সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়ার পর উপসংহারে শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন, "অবতার অসংখ্য," সুতরাং এই তালিকা যে সম্পূর্ণ নহে তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যাইতেছে।

নবম অবতার হয়শীর্ষা। শ্রীমদ্ভাগবতের দ্বিতীয় স্কন্ধের সপ্তম অধ্যায়ে এই অবতারের কথা পুনর্ব্বার আলোচিত হইয়াছে। সেখানে ব্রহ্মা বক্তা আর নারদ শ্রোতা। সেই স্থানে একাদশ শ্লোকে হয়গ্রীব অবতারের কথা পরিদৃষ্ট হয়।

সত্রে মমাস ভগবান্ হয়শীরষাথো
সাক্ষাৎ স যজ্ঞপুরুষস্তপনীয় বর্ণঃ।
ছন্দোময়ো মখময়োঽখিলদেবতাত্মা
বাচো বভূবুরুশতী শ্বসতোঽস্য নস্তঃ॥

হয়গ্রীব অবতারে সাক্ষাৎ যজ্ঞপুরুষ সেই ভগবান্ হয়শীর্ষ অর্থাৎ অশ্বশিরোধারণপূর্ব্বক ব্রহ্মার যজ্ঞে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তখন তাঁহার সুবর্ণ-সদৃশ বর্ণ সকলেই দেখিতে পাইয়াছিলেন। তিনি বেদময়, যজ্ঞময় ও অখিল দেবতার আত্মা। সেই সময় নিশ্বাস ত্যাগ করায় তাহার নাসাপুট হইতে কমনীয় বেদরূপ বাক্য সকল উৎপন্ন হইয়াছিল।

শ্রীরূপ গোস্বামী বলেন বাগীশ্বরীপতি এই হয়গ্রীব ব্রহ্মার যজ্ঞাগ্নি হইতে আবির্ভূত হইয়া মধু ও কৈটভ নামক দৈত্যযুগলকে বধ করিয়া বেদ ফিরাইয়া আনেন।

দশম অবতার শ্রীহংস। শ্রীমদ্ভাগবতের দ্বিতীয় স্কন্ধের সপ্তম অধ্যায়ে ঊনবিংশ শ্লোকে তাঁহার কথা উল্লিখিত হইয়াছে।

তুভ্যঞ্চ নারদ! ভৃশং ভগবান্ বিবৃদ্ধ-
ভাবেন সাধু পরিতুষ্ট উবাচ যোগম্।
জ্ঞানঞ্চ ভাগবতমাত্মসতত্ত্বদীপং
যদ্বাসুদেবশরণা বিদুরঞ্জসৈব॥

হে নারদ! সেই ভগবান্ হংসাবতারে তোমার উদ্রিক্তা ভক্তি দেখিয়া পরিতুষ্ট হৃদয়ে তোমাকে উত্তমরূপে ভক্তিযোগ এবং আত্মতত্ত্ব প্রকাশক ভাগবত-জ্ঞান উপদেশ করেন। যে সকল ব্যক্তি বাসুদেবের শরণাপন্ন হয়েন, তাঁহারাই ঐ জ্ঞান অনায়াসে লাভ করিতে পারেন।

একাদশ অবতারের নাম শ্রীধ্রুবপ্রিয়। শ্রীমদ্ভাগবতের দ্বিতীয় স্কন্ধের সপ্তম অধ্যায়ের অষ্টম শ্লোকে এই অবতারের কথা উল্লিখিত হইয়াছে।

বিদ্ধঃ সপত্ন্যুদিতপত্রিভিরন্তি রাজ্ঞে
বালোঽপি সন্নুপগতস্তপসে বনানি।
তস্মা আদাদ্ ধ্রুবগতিং গৃণতে প্রসন্নো
দিব্যাঃ স্তুবন্তি মুনয়ো যদুপর্য্যধস্তাৎ॥

উত্তানপাদ রাজার পুত্র ধ্রুব পিতার সমক্ষে বিমাতার বাক্যবাণে বিদ্ধ হইয়া বাল্যকালেই তপস্যার জন্য বনে গমন করিয়াছিলেন, ভগবান্ পৃশ্নিগর্ভ অবতারে ঐ ধ্রুবের স্তবে প্রসন্ন হইয়া তাঁহাকে সেই ধ্রুবপদ প্রদান করেন, ঊর্দ্ধে ভৃগু প্রভৃতি মুনি এবং অধঃ সপ্তর্ষি যে পদের স্তব করিয়া থাকেন।

ঋষভ। দ্বাদশ অবতারের নাম শ্রীঋষভ। শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম তালিকায় কথিত হইয়াছে—

অষ্টমে মেরুদেব্যান্তু নাভের্জাত উরুক্রমঃ।
দর্শয়ন্ বর্ত্ম ধীরাণাং সর্ব্বাশ্রম-নমস্কৃতং॥

অষ্টমে আগ্নীধ্রপুত্র নাভির ঔরসে মেরুদেবীর গর্ভে ঋষভ জন্মগ্রহণ করেন, এই অবতারে ধীর ব্যক্তিদিগকে সর্ব্বাশ্রম-নমস্কৃত বর্ত্ম অর্থাৎ পরমহংসের আচরণ প্রদর্শন করান। ঋষভদেব হইতেই জৈন সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠা।

পৃথু। ত্রয়োদশ অবতারের নাম পৃথু—

ঋষিভির্যাচিতো ভেজে নবমং পার্থিব বপুঃ।
দুগ্ধেমাং হ্যোষধীবিপ্রাস্তেনায়ং স উশত্তম॥

ঋষিগণ কর্ত্তৃক প্রার্থিত হইয়া শ্রীভগবান্ পৃথু নাম ধারণ করিয়া রাজদেহ গ্রহণ করেন। এই অবতারে তিনি

পৃথিবী হইতে ওষধি প্রভৃতি দোহন করেন। এই কারণে এই অবতার সর্ব্বজনের অতি কমনীয়।

নৃসিংহ।

চতুর্দ্দশ অবতারের নাম শ্রীনৃসিংহ।

চতুর্দ্দশং নারসিংহং বিভ্রদ্দৈত্যেন্দ্রমুর্জ্জিতম্।
দদার করজৈরূরাবেরকাং কটকৃদ্‌যথা॥

চতুর্দ্দশে শ্রীভগবান্ অত্যূর্জ্জিত নারসিংহ-বপুঃ প্রকটন পূর্ব্বক কটকারী (মাদুর-প্রস্তুতকারক) যেমন এরকা নামক তৃণকে বিদারিত করিয়া থাকে, সেইরূপ হিরণ্যকশিপুকে উরুদেশে গ্রহণ করিয়া নখদ্বারা বিদারিত করিয়াছিলেন।

কূর্ম্ম।

পঞ্চদশ অবতার কূর্ম্ম।

সুরাসুরাণামুদধিং মথ্নতাং মন্দরাচলং।
দধ্রে কমঠরূপেণ পৃষ্ঠ একাদশে বিভুঃ॥

যে সময়ে দেবগণ ও অসুরগণ মিলিত হইয়া সমুদ্র মন্থন করেন সেই সময়ে অর্থাৎ চাক্ষুষ মন্বন্তরে ভগবান্ কূর্ম্মরূপে পৃষ্ঠদেশে মন্দরাচল ধারণ করেন।

ধন্বন্তরী ও মোহিনী।

ষোড়শঅবতার ধন্বন্তরি আর সপ্তদশ অবতার মোহিনী। শ্রীমদ্ভাগবতে ইঁহাদিগকে দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ স্থান দেওয়া হইয়াছে এবং একই শ্লোকে উভয়ের কথা বলা হইয়াছে।

ধান্বন্তরং দ্বাদশমং ত্রয়োদশমমেব চ।
অপায়য়ৎ সুরানন্যান্মোহিন্যা মোহয়ন্ স্ত্রিয়া॥

ধন্বন্তরিরূপে আবির্ভূত হইয়া অমৃত আহরণ পুরঃসর মোহিনী স্ত্রীরূপে অসুরগণকে অমৃত পান করান। অষ্টাদশ অবতার শ্রীবামন। শ্রীমদ্ভাগবতে ইহার সংখ্যা পঞ্চদশ।

বামন।

পঞ্চদশ বামনকং কৃত্বাগাদধ্বরং বলেঃ।
পদত্রয়ং যাচমানঃ প্রত্যাদিৎসুস্ত্রিপিষ্টপম্॥

ভগবান্ বামনমূর্ত্তি ধারণ করিয়া বলিরাজকে স্বর্গ হইতে বঞ্চিত করিবার জন্য তাঁহার যজ্ঞে গমন করেন এবং ত্রিপাদ-পরিমিত ভূমি যাজ্ঞা করেন।

শ্রীরূপ গোস্বামীর মতে বর্ত্তমান ব্রাহ্মকল্পে তিনবার বামনদেবের আবির্ভাব হয়। একবার স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে আর দুইবার এই বৈবস্বত মন্বন্তরে। তিনবারে তিনজন অসুরের যজ্ঞে গমন করেন। বাস্কলি, ধুন্ধু ও বলি। শেষবার যখন তিনি বলিকে ছলনা করিতে আসেন, সে বৈবস্বত মন্বন্তরের সপ্তম চতুর্যুগে। এইবারেই তিনি কশ্যপ ও অদিতির পুত্র।

পরশুরাম। উনবিংশ অবতার পরশুরাম। শ্রীমদ্ভাগবতে ইঁহাকে ষোড়শ স্থান দেওয়া হইয়াছে।

অবতারে ষোড়শমে পশ্যন্ ব্রহ্মদ্রুহো নৃপান্।
ত্রিঃসপ্তকৃত্বঃ কুপিতো নিঃক্ষত্রামকরোন্মহীং॥

ক্ষত্রিয়গণ ব্রাহ্মণের বিদ্বেষী হওয়ায় ভগবান্ পরশুরামরূপে অবতীর্ণ হইয়া কোপপূর্ব্বক একবিংশতিবার পৃথিবীকে ক্ষত্রিয়-শূন্য করেন।

পরশুরামের আবির্ভাব এই বৈবস্বত মন্বন্তরেই হইয়াছিল। কেহ বলেন সপ্তদশ চতুর্যুগ তাঁহার আবির্ভাব-কাল। কেহ বলেন দ্বাবিংশ।

রামচন্দ্র। বিংশ অবতার শ্রীরামচন্দ্র

নরদেবত্বমাপন্নঃ সুরকার্য্য চিকীর্ষয়া।
সমুদ্রনিগ্রহাদীনি চক্রে বীর্য্যান্যতঃ পরং॥

দেব-কার্য্য করিবার বাসনায় নরদেব অর্থাৎ রাঘবরূপে আবির্ভূত হইয়া সমুদ্র নিগ্রহ প্রভৃতি দুরূহ কার্য্য সাধন করেন।

বৈবস্বত মন্বন্তরের চতুর্বিংশ চতুর্যুগের ত্রেতাযুগে শ্রীরামচন্দ্রের আবির্ভাব।

একবিংশ অবতার ব্যাসদেব। শ্রীমদ্ভাগবতে ইঁহাকে সপ্ত-দশ সংখ্যা দেওয়া হইয়াছে। ব্যাসদেব।

ততঃ সপ্তদশে জাতঃ সত্যবত্যাং পরাশরাৎ।
চক্রে বেদতরোঃ শাখা দৃষ্ট্বা পুংসোঽল্পমেধসঃ॥

ভগবান্ পরাশর ঋষির ঔরসে সত্যবতীর গর্ভে ব্যাস নামে জন্মগ্রহণ করেন; লোক সকলের বুদ্ধি অল্প দেখিয়া তাহাদের প্রতি অনুগ্রহ করিয়া বেদরূপ তরুর বহুবিধ শাখা বিস্তার করেন।

দ্বাবিংশ ও ত্রয়োবিংশ অবতার বলরাম ও কৃষ্ণ। শ্রীমদ্ভাগবতে ইহাদের ঊনবিংশসংখ্যা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। বলরাম ও কৃষ্ণ।

একোনবিংশে বিংশতিমে বৃষ্ণিষু প্রাপ্তজন্মনী।
রামকৃষ্ণবিতি ভুবো ভগবানহরদ্ভরং॥

ভগবান্ বৃষ্ণিবংশে রামকৃষ্ণরূপে জন্মগ্রহণ করিয়া পৃথিবীর ভার হরণ করেন।

চতুর্বিংশ অবতার শ্রীবুদ্ধ। বুদ্ধ।

ততঃ কলৌ সংপ্রবৃত্তে সংমোহায় সুরদ্বিষাং।
বুদ্ধোনাম্নাঽঞ্জনসুতঃ কীকটেষু ভবিষ্যতি॥

কলিযুগ প্রবৃত্ত হইলে ভগবান্ দেবদ্বেষি অসুরগণের মোহ-সাধনের জন্য কীকট অর্থাৎ গয়াপ্রদেশে অঞ্জনের পুত্র হইয়া বুদ্ধ নামে অবতীর্ণ হইবেন।

পঞ্চবিংশ অবতার কল্কী। কল্কি।

অথাসৌ যুগসন্ধ্যায়াং দস্যুপ্রায়েষু রাজসু।
জনিতা বিষ্ণুযশসো নাম্না কল্কির্জগৎপতি॥

কলির শেষে পৃথিবীর রাজাগণ দস্যুপ্রায় হইলে বিষ্ণুযশাঃ ব্রাহ্মণের ঔরষে জগৎপতি ভগবান্ কল্কি নামে জন্মগ্রহণ করিবেন।

কল্পাবতার। আমরা এই যে পঁচিশজন অবতারের পরিচয় পাইলাম ইঁহারা কল্পাবতার অর্থাৎ প্রতিকল্পেই ইঁহারা আবির্ভূত হইয়া থাকেন। ইঁহাদের মধ্যে প্রথম ত্রয়োদশজন অর্থাৎ চতুঃসন হইতে পৃথু পর্য্যন্ত স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে আবির্ভূত হন। তাহার পরের চারিজন চাক্ষুষ মন্বন্তরে আর শেষের আটজন বৈবস্বত মন্বন্তরে। শ্রীলঘুভাগবতামৃত গ্রন্থে এইরূপ সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে।

মন্বন্তরাবতার। কল্পাবতারের পর মন্বন্তরাবতারগণের পরিচয় গ্রহণ করিতে হইবে। শ্রীমদ্ভাগবতের অষ্টম স্কন্ধে মন্বন্তরাবতারগণের কথা বলা হইয়াছে। প্রত্যেক মন্বন্তরেই ইন্দ্রশত্রু অসুরের উদ্ভব হইয়া থাকে, এবং ভগবান্ আসিয়া অসুর বিনাশ-পূর্ব্বক ইন্দ্রকে সাহায্য করেন। কোন কোন লীলাবতার বা কল্পাবতার মন্বন্তরাবতারেরও কার্য্য করিয়াছেন। চতুর্দ্দশ মন্বন্তরের মন্বন্তরাবতারগণের নাম শ্রীমদ্ভাগবতেই পাওয়া যায়।

১। স্বায়ম্ভুব মন্বন্তর অবতারের নাম যজ্ঞ। ইঁহার কথা কল্পাবতার মধ্যে বলা হইয়াছে।

২। স্বারোচিষ মন্বন্তর—অবতারের নাম বিভু।

ঋষেস্তু বেদশিরসস্তুষিতা নাম পত্ন্যভূৎ।
তস্যাং জাতস্ততো দেবো বিভুরিত্যভিবিশ্রুতঃ॥
অষ্টাশীতিসহস্রাণি মুনয়ো যে ধৃতব্রতাঃ।
অন্বশিক্ষন্ ব্রতং তস্য কৌমারব্রহ্মচারিণঃ॥

৮।১।১৭।১৮॥

বেদশিরা ঋষির তুষিতা নামে যে পত্নী ছিলেন তাঁহার গর্ভে ঐ ঋষি হইতে বিভুনামে দেব উৎপন্ন হয়েন। তিনি আকুমার ব্রহ্মচারী ছিলেন, অষ্টাশীতিসহস্র ধৃতব্রত মুনি তাঁহার নিকট ব্রতশিক্ষা করেন।

৩। উত্তম মন্বন্তর—অবতারের নাম সত্যসেন।

ধর্ম্মস্য সুনৃতায়ান্তু ভগবান্ পুরুষোত্তমঃ।
সত্যসেন ইতিখ্যাতো জাতঃ সত্যব্রতৈঃসহ॥
সোঽনৃতব্রত-দুঃশীলান্ অসতো যক্ষ-রাক্ষসান্।
ভূতদ্রুহো ভূতগণানবধীৎ সত্যজিৎসখঃ॥

৪।১-১৯-২০॥

ধর্ম্মের সুনৃতা নাম্নী ভার্য্যার গর্ভে ভগবান্ পুরুষোত্তম সত্য-ব্রতগণসহ উৎপন্ন হইয়া সত্যসেন নামে খ্যাত হয়েন। এই সত্যসেন সত্যজিৎ নামা ইন্দ্রের সখা হইয়া অনৃতব্রতী দুঃশীল অসৎ যক্ষ রাক্ষসদিগকে এবং প্রাণী-পীড়ক ভূতগণকে বিনাশ করেন।

৪। তামস মন্বন্তর—অবতারের নাম হরি।

তত্রাপি যজ্ঞে ভগবান্ হরিণ্যাং হরিমেধসঃ।
হরিরিত্যাহৃতো যেন গজেন্দ্রো মোচিতোগ্রাহাৎ॥

৮।১-২৩॥

ভগবান্ বিষ্ণু হরিমেধসের ঔরষে হরিণীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়া "হরি" এই নাম গ্রহণ করেন এবং গ্রাহের মুখ হইতে গজেন্দ্রকে রক্ষা করেন।

৫। রৈবত মন্বন্তর—অবতারের নাম বৈকুণ্ঠ।

পত্নী বিকুণ্ঠা শুভ্রস্য বৈকুণ্ঠৈঃ সুরসত্তমৈঃ।
তয়োঃ স্বকলয়া যজ্ঞে বৈকুণ্ঠো ভগবান্ স্বয়ং॥

বৈকুণ্ঠঃ কল্পিতো যেন লোকো লোক-নমস্কৃতঃ।
রময়া প্রার্থ্যমানেন দেব্যা তৎপ্রিয়কাম্যয়া ॥ ৮।১-২ ॥

শুভ্রের বিকুণ্ঠা নামে যে পত্নী ছিলেন তাঁহার গর্ভে শুভ্রের ঔরসে ভগবান্ বৈকুণ্ঠ স্বয়ং বৈকুণ্ঠবাসী সুরগণ সহিত স্বীয় অংশে জন্মগ্রহণ করেন, ঐ বৈকুণ্ঠই রমাদেবীর প্রার্থনায় তদীয় প্রিয় করিতে বাসনা করিয়া লোক-নমস্কৃত বৈকুণ্ঠ-লোক নির্ম্মাণ করেন।

৬। চাক্ষুষ মন্বন্তর—অবতারের নাম অজিত।

"তত্রাপি দেবঃ সম্ভূত্যাং বৈরাজস্যাভবৎ সুতঃ।
অজিতো নাম ভগবানংশেন জগতীপতিঃ॥
পয়োধিং যেন নির্মথ্য সুরাণাং সাধিতা সুধা।
ভ্রমমাণোঽম্ভসি ধৃতঃ কূর্ম্মরূপেণ মন্দরঃ॥"

দেব-সম্ভূতির গর্ভে জগৎপতি ভগবান্ বিষ্ণু স্বীয় অংশে জন্মগ্রহণ করিয়া অজিত নামে বিখ্যাত হয়েন। তিনি সমুদ্র মন্থন করিয়া দেবতাদিগের নিমিত্ত সুধাসাধন এবং কূর্ম্মরূপে ভ্রমণ করতঃ মন্দর-পর্ব্বত ধারণ করেন।

৭। বৈবস্বত মন্বন্তর—অবতারের নাম বামন। লীলাবতার-প্রকরণে বামনদেবের কথা বলা হইয়াছে।

এখন বৈবস্বত মন্বন্তরের অষ্টাবিংশতি কলিযুগ চলিতেছে। যাহা হউক ভবিষ্যত মন্বন্তরের অবতারগণের কথাও শ্রীমদ্ভাগবতে বলা হইয়াছে। তাঁহাদের নাম ও পরিচয় নিম্নে দেওয়া হইল।

৮। সাবর্ণীয় মন্বন্তর—অবতারের নাম সার্ব্বভৌম।

"দেবগুহ্যাৎ সরস্বত্যাং সার্ব্বভৌম ইতি প্রভুঃ।
স্থানংপুরন্দরাদ্ধৃত্বা বলয়ে দাস্যতীশ্বরঃ॥"

দেবগুহ্য হইতে সরস্বতীর গর্ভে ভগবান্ অবতীর্ণ হইয়া সার্ব্বভৌম এই নামে বিখ্যাত হইবেন এবং পুরন্দরের নিকট হইতে ইন্দ্রত্ব গ্রহণ করিয়া বলিকে প্রদান করিবেন।

৯। দক্ষ সাবর্ণীয় মন্বন্তর—অবতারের নাম ঋষভ। আয়ুস্মান্ হইতে অম্বুধারার গর্ভে ভগবান্ বিষ্ণু জন্মগ্রহণ করিয়া "ঋষভ" এই নামে খ্যাত হইবেন এবং অদ্ভুত নামক ইন্দ্রকে সর্ব্ব-সম্পৎ-পরিপূর্ণা ত্রিলোকী ভোগ করাইবেন।

১০। ব্রহ্ম-সাবর্ণীয় মন্বন্তর—অবতারের নাম বিষ্বক্‌সেনঃ। ইনি বিশ্বসৃক্ বিপ্রের গৃহে বিসূচির গর্ভে অংশাংশে জন্মগ্রহণ করিবেন এবং তৎকালীন ইন্দ্র শম্ভুর সহিত তাঁহার সখ্য হইবে।

১১ ধর্ম্ম সাবর্ণীয় মন্বন্তর—অবতারের নাম ধর্ম্মসেতু। ইনি আর্য্যক ও বৈধৃতার পুত্র।

১২। রুদ্র-সাবর্ণীয় মন্বন্তর—অবতারের নাম সুধামা। ইতি সত্যসহা ব্রাহ্মনের সুনৃতা নাম্নী ভার্য্যায় উৎপন্ন হইবেন।

১৩। দেব সাবর্ণীয় মন্বন্তরের অবতারের নাম যোগেশ্বর। ইনি দেবহোত্র ও বৃহতীর পুত্র।

১৪। ইন্দ্র-সাবর্ণীয় মন্বন্তর—অবতারের নাম বৃহদ্ভানু। ইনি সত্রায়ণ ও বিনতার পুত্র।

কল্লাবতার পঁচিশ, মন্বন্তরাবতার চৌদ্দ হইয়াও দ্বাদশ, কারণ যজ্ঞ ও বামন লীলাবতার এবং মন্বন্তরাবতার। ইহা ব্যতীত চারি যুগের চারিটী অবতার। শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণের নামকরণ প্রসঙ্গে গর্গাচার্য্য বলিয়াছেন "শুক্লরক্তস্তথাপীত ইদানীং কৃষ্ণতাংগতঃ" অর্থাৎ সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি এই চারিযুগে ভগবান্ শুক্ল, রক্ত, কৃষ্ণ এবং পীতবর্ণ ধারণ করিয়া আভির্ভূত হইয়া থাকেন। শ্রীরূপগোস্বামী বলিয়াছেন—

লীলাবতার, যুগাবতার।

"উপাসনা-বিশেষার্থং সত্যাদিষু যুগেষ্বসৌ।
মন্বন্তরাবতারস্তু তথাবতরতি ক্রমাৎ॥"

অর্থাৎ যিনি যে মন্বন্তরের অবতার তিনিই উপাসনা বিশেষের জন্য প্রতি চতুর্যুগে চারিবার শুক্ল, রক্ত, কৃষ্ণ ও পীতবর্ণ ধারণ করিয়া আবির্ভূত হইয়া থাকেন।

এই যে ব্যবস্থা ইহার ব্যতিক্রমও হয়। অন্ততঃপক্ষে বর্ত্তমান কলিযুগে ইহার বিশেষ ব্যতিক্রম হইয়াছে। সে কথা পরে আলোচ্য। তাহা হইলে আমরা শ্রীমদ্ভাগবত হইতে একচত্বারিংশৎ অবতার পাইলাম।

কলিযুগে শ্রীগৌরাঙ্গ।

চারিযুগের চারি অবতারের কথা শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশ স্কন্ধের ৫ম অধ্যায়ে বিশেষ ভাবে বর্ণিত হইয়াছে। শ্রীল লোচনদাস ঠাকুর তাঁহার শ্রীচৈতন্য মঙ্গল গ্রন্থের প্রারম্ভেই অর্থাৎ সূত্র খণ্ডে এই শ্লোকগুলির বিশদভাবে আলোচনা করিয়াছেন।

নিমিরাজ করভাজন মুনিকে জিজ্ঞাসা করিলেন—

"কস্মিন্ কালে স ভগবান্ কিংবর্ণ কীদৃশো নৃভিঃ।
নাম্না বা কেন বিধিনা পূজ্যতে তদিহো্যতাম্॥"
কোন্ কালে ভগবান্ কোন্ বর্ণ ধরে।
কি নাম তাহার সেই হৈল কোন্ কালে॥
কোন্ কালে কোন্ ধর্ম্ম কেমন মানুষ।
কোন্ বিধি পূজা করে কিসে বা সন্তোষ॥

শ্রীকর ভাজন উবাচ—

"কৃতং ত্রেতা দ্বাপরঞ্চ কলিরিত্যেষু কেশবঃ।
নানাবর্ণাভিধাকারো নানৈব বিধিনেজ্যতে॥
কৃতে শুক্লশ্চতুর্ব্বাহু জটিলো বল্কলাম্বরঃ।
কৃষ্ণাজিনোপবীতাক্ষান্ বিভ্রদ্দণ্ড কমণ্ডলু॥

মনুষ্যাস্তু তদা শান্তা নির্ব্বৈরা সুহৃদঃ সমাঃ।
যজন্তি তপস্যা দেবং শমেন চ দমেন চ॥"

রাজাকে কহিছে মুনি শুন সাবধানে।
সত্য আদি যুগে লোক পূজয়ে কেমনে॥
সত্য যুগে শ্বেতবর্ণ হংস নাম ধরে।
চতুর্ব্বাহু তপোধর্ম্ম জটাবাকল পরে॥
দণ্ড কমণ্ডলু কৃষ্ণসার উপবীত।
শান্ত নির্ব্বৈর সম লোকের চরিত॥

ত্রেতায়াং রক্তবর্ণোঽসৌ চতুর্ব্বাহুস্ত্রিমেখলঃ।
হিরণ্যকেশস্ত্রয্যাত্মা স্রুক্‌স্রুবাদ্যুপলক্ষণঃ॥
তং তদা মনুজা দেবং সর্ব্বদেবময়ং হরিং।
যজন্তি বিদ্যয়া ত্রয্যা ধর্ম্মিষ্ঠা ব্রহ্মবাদিনঃ॥

সেই প্রভু ত্রেতাযুগে রক্তবর্ণ ধরে।
চারি বাহু ত্রিমেখল স্রুক্ স্রুব করে॥
তপ্ত হাটক-কেশ শিরের উপরে।
সর্ব্বদেবময় প্রভু আসে যজ্ঞ করে।
ত্রয়ীবেদ আত্মা তার নাম ধরে 'যজ্ঞ'।
বেদবিধিমতে পূজা করে ধর্ম্মবিজ্ঞ॥

দ্বাপরে ভগবান্ শ্যামঃ পীতবাসা নিজায়ুধঃ।
শ্রীবৎসাদিভিরঙ্কৈশ্চ লক্ষণৈরুপলক্ষিতঃ॥
তং তদা পুরুষা মর্ত্ত্যা মহারাজোপলক্ষণম্।
যজন্তি বেদতন্ত্রাভ্যাং পরং জিজ্ঞাসবো নৃপ॥
ইতি দ্বাপর উর্ব্বীশ স্তুবন্তো জগদীশ্বরম্।
নানাতন্ত্রবিধানেন কলাবপি তথা শৃণু॥

দ্বাপরে শ্যামবর্ণ ধরে ভগবান্।
শ্রীবৎস কৌস্তুভ অঙ্গে পীত-পরিধান॥

মহারাজরাজাধিপলক্ষণ বিরাজে।
ভাগ্যবান্ লোক তারে বেদ-তন্ত্রে যজে॥

যে যুগে মানবকে যে ধর্ম্ম আচরণ করিতে হইবে, প্রতিযুগে যুগাবতার আসিয়া তাহা শিক্ষা দিয়া থাকেন। সত্য, ত্রেতা এবং দ্বাপর এই তিন যুগের অবতার শুক্ল, রক্ত ও কৃষ্ণবর্ণ। এইবার কলিযুগের কথা বলিতেছেন।

কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং সঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদং।
যজ্ঞৈঃ সঙ্কীর্ত্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ॥

'কৃষ্ণ' এই দুই বর্ণ আছয়ে যাহাতে।
'কৃষ্ণবর্ণ' নাম তার কহে ভাগবতে॥
কান্তিতে 'অকৃষ্ণ' সেই শুন সর্ব্ব জন।
গোরা গোরা বলি গাই এই সে কারণ॥
সাঙ্গোপাঙ্গ অস্ত্র যত পারিষদ আর।
সবার সহিত প্রভু কৈলা অবতার॥
অঙ্গে বলরাম বলি—তেঞি কহি 'সাঙ্গ'।
উপ-অঙ্গ আভরণ—তেঞি সে উপাঙ্গ॥
সুদর্শন-আদি অস্ত্র—যত পারিষদ।
সংহতি আইলা সভে প্রহ্লাদ নারদ॥
পূর্ব্ব অবতারে আর দাস দাসী যত।
সাঙ্গোপাঙ্গে অবতার—নাম লৈব কত॥

* * * *

সংকীর্ত্তন-প্রায় যজ্ঞ-ধর্ম্ম পরকাশ।
সুমেধা যে জন—তাতে পরম উল্লাস॥

পূর্ব্বোদ্ধৃত শ্রীমদ্ভাগবতীয় শ্লোক যে সময়ে জগতে প্রচারিত হইয়াছিলেন সে সময়ে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাব ভবিষ্যতের

ঘটনা ছিল। কাজেই শ্লোকটীর অর্থ বিশেষ বিবেচনা পূর্ব্বক নির্দ্ধারণ করিতে হইবে। শ্রীল লোচনদাস ঠাকুরও বলিয়াছেন।

সাবধান হঞা শুন কলির কাহিনী।

শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত-গ্রন্থেও পূর্ব্বোদ্ধৃত শ্লোক ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

"কৃষ্ণ এই দুই বর্ণ সদা যার মুখে।
অথবা কৃষ্ণকে তেঁহো বর্ণে নিজ সুখে॥
কৃষ্ণ-বর্ণ শব্দের অর্থ দুই ত প্রমাণ।
কৃষ্ণ বিনু মুখে নাহি আইসে আন॥
কেহ তাঁরে বলে যদি 'কৃষ্ণবরণ'।
আর বিশেষণে তার করে নিবারণ॥
দেহকান্ত্যে হয় তেঁহো অকৃষ্ণবরণ।
অকৃষ্ণবরণে কহে পীতবরণ॥
প্রত্যক্ষ তাঁহার তপ্তকাঞ্চনের দ্যুতি।
যাহার ছটায় নাশে অজ্ঞান-তমস্ততি॥
জীবের কল্মষতমো নাশ করিবারে।
অঙ্গ উপাঙ্গ-নাম নানা অস্ত্র ধরে॥
ভক্তির বিরোধী কর্ম্ম ধর্ম্ম বা অধর্ম্ম।
তাহার কল্মষনাম সেই মহাতমঃ॥
বাহুতুলি হরিবলি প্রেমদৃষ্টে চায়।
করিয়া কল্মষ নাশ প্রেমেতে ভাষায়॥
শ্রীঅঙ্গ শ্রীমুখ যেই করে দরশন।
তার পাপ ক্ষয় হয়, পায় প্রেমধন॥
অন্য অবতারে সব সৈন্য-শস্ত্র সঙ্গে।
চৈতন্য কৃষ্ণের সৈন্য অঙ্গ উপাঙ্গে॥

অঙ্গোপাঙ্গ অস্ত্র করে স্বকার্য্য-সাধন।
অঙ্গ শব্দের অর্থ আর শুন দিয়া মন॥
অঙ্গ শব্দে অংশ কহে শাস্ত্র-পরমাণ।
অঙ্গের অবয়ব উপাঙ্গ ব্যাখ্যান॥

* * *

'অঙ্গ' শব্দে অংশ কহে, সেহো সত্য হয়।
মায়া কার্য্য নহে সব চিদানন্দ ময়॥
অদ্বৈত নিত্যানন্দ চৈতন্যের দুই অঙ্গ।
অঙ্গের অবয়বগণ কহিয়ে উপাঙ্গ॥
অঙ্গোপাঙ্গ তীক্ষ্ণ অস্ত্র প্রভুর সহিতে।
সেই সব অস্ত্র হয় পাষণ্ড দলিতে॥
অদ্বৈত আচার্য্য গোসাঞি সাক্ষাৎ ঈশ্বর॥
শ্রীবাসাদি পারিষদ সৈন্য সঙ্গে লঞা।
দুই সেনাপতি বলে কীর্ত্তন করিয়া॥
পাষণ্ড-দলন-বানা নিত্যানন্দ রায়।
আচার্য্য হুঙ্কারে পাপ পাষণ্ড পলায়॥
সঙ্কীর্ত্তন প্রবর্ত্তক শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
সঙ্কীর্ত্তন যজ্ঞে তাঁরে ভজে সেই ধন্য॥
সেই ত সুমেধা, আর কুবুদ্ধি-সংসার।
সর্ব্বযজ্ঞতৈ কৃষ্ণনাম-যজ্ঞ সার॥

কলিযুগের যুগাবতার-সম্বন্ধে শ্রীভাগবতের শ্লোকের এই অর্থ বঙ্গদেশের বৈষ্ণবাচার্য্যগণ প্রচার করিয়াছেন। অবতার-কথা আলোচনায় এই ব্যাখ্যা বিশেষরূপে আলোচ্য।

বোপদেবের মত

বোপদেব প্রণীত 'মুক্তাফল' নামক গ্রন্থ প্রাচীন ও অত্যন্ত প্রসিদ্ধ। এই গ্রন্থের তৃতীয় অধ্যায়ে বিষ্ণুর অবতার কথা

আলোচিত হইয়াছে। এই গ্রন্থে অবতারগণকে চারি ভাগ করা হইয়াছে; কল্প, মন্বন্তর, যুগ ও স্বল্প। অবতারের সংখ্যা এই গ্রন্থানুসারে চল্লিশ। বোপদেবের গ্রন্থ শ্রীরূপ গোস্বামীর গ্রন্থের বহু পূর্ব্ববর্ত্তী। এই গ্রন্থের টীকা হেমাদ্রি বিরচিত। হেমাদ্রির টীকায় অবতার-কথা কোন্ অবস্থায় এবং কি কারণে আলোচ্য তাহা বিবৃত হইয়াছে সমাধিভঙ্গের পর অর্থাৎ ব্যুত্থানদশায় যোগের নানারূপ বিঘ্ন ঘটিবার সম্ভাবনা। ব্যাধি, স্ত্যান, সংশয়, প্রমাদ, আলস্য, অবিরতি, ভ্রান্তিদর্শন, লব্ধভূমিকত্ব এই সমুদয় চিত্ত বিক্ষেপ। তাহা ছাড়া দুঃখ, দৌর্ম্মনস্য, শ্বাস-প্রশ্বাস-বিক্ষেপ প্রভৃতি দৈহিক অবস্থা এই চিত্ত-বিক্ষেপের আনুষঙ্গিক। ভগবানের জন্ম ও কর্ম্মাদির অনুসন্ধান এই অবস্থায় মহৎ লাভ অর্থাৎ ব্যুত্থান দশায় জন্ম কর্ম্মের শ্রবণ কীর্ত্তনাদি করিলে চিত্ত-বিক্ষেপ ও দেহ-বিক্ষেপাদি যে যোগের অন্তরায় তাহার হস্তে পরিত্রাণ পাওয়া যায়। "তত্র কল্পাবতারান্ শৃণ্বন্ অধ্ববিঘ্নোপশান্তয়ে বরাহং ভাবয়েৎ" এই অবস্থায় কল্পাবতারগণের কথা শুনিয়া অধ্ববিঘ্নের উপশান্তির জন্য বরাহদেব (১) কে চিন্তা করিবে। অধ্ব শব্দের অর্থ পথ। বোপদেবের গ্রন্থে প্রথমে বরাহ দেবের কথা বলা হইয়াছে।

সাধকাবস্থ অবতার স্মরণ।

লোকাপবাদ-নিরাশের জন্য যজ্ঞ (২)। "রাজসত্বাদিদোষ-হানার্থংকপিলাবতারমাহ।" রজোগুণ হইতে উৎপাদিত যে সমুদয় দোষ অর্থাৎ অহঙ্কারাদির উপশমের জন্য কপিলাবতার (৩)। অলব্ধভূমিকত্ব নিবারণের জন্য দত্তাত্রেয় (৪)। কামোপশমের জন্য (চতুঃসন)। প্রমাদ-বিনাশের জন্য নারদ। (৬)। উগ্র ধর্ম্ম নাশের জন্য নারায়ণ (৭)। উদ্দিষ্ট-সিদ্ধির জন্য ধ্রুবপ্রিয় (৮) কে চিন্তা করিবে। ক্ষুৎপিপাসা শান্তির জন্য পৃথু (৯)। অনবস্থিতত্ব নাশের জন্য ঋষভদেব (১০)। দেবহেলন-জাত দোষ খণ্ডনের জন্য হয়গ্রীব অবতার (১১)।

জিহ্বোপসর্গ নাশের জন্য মৎস্য (১২)। নরক হেতু নাশের জন্য, কূর্ম্ম ১৩। অরণ্যভয়-হানি জন্য নৃসিংহ ১৪। আর্ত্তি-নাশের জন্য হরি ১৫। স্থলোপসর্গনাশের জন্য বামন ১৬। স্থান-নাশের প্রতিকারের জন্য হংসাবতার ১৭। দুর্গোপসর্গ নাশের জন্য মন্বন্তবেশ ১৮। ব্যাধি নাশের জন্য ধন্বন্তরি ১৯। অতিরতি নাশের জন্য মোহিনী ২০। অদ্রিকূটোপসর্গ হানির জন্য পরশুরাম অবতার ২১। প্রবাসদুঃখনাশের জন্য রামাবতার ২২। সর্ব্ববিধ অন্তরায় নাশের জন্য ব্যাস ২৪। ভ্রান্তি-দর্শন নিবৃত্তির জন্য বুদ্ধ, ২৫। কলিদোষ নিরাসের জন্য কল্কি ২৬।

বোপদেবের মুক্তাফলগ্রন্থে এই ২৬ জনকে কল্পাবতার বলিয়াছেন, তাহার পর চৌদ্দ মন্বন্তরের ১৪ জন মন্বন্তরাবতার তৎপরে চারিযুগের চারি যুগাবতার। সর্ব্বসমেত ৪৪ জন হইবার কথা। কিন্তু চারিজন কল্পাবতার অর্থাৎ যজ্ঞ, হরি, কূর্ম্ম ও বামন, তাঁহারা যেমন কল্পাবতার তেমনি মন্বন্তরাবতার, সুতরাং তাঁহাদের দুইবার গণনা করার প্রয়োজন নাই। তাহা হইলে সর্ব্বসমেত ৪০ জনকে আমরা পাইতেছি। আমাদের দেশের বৈষ্ণবাচার্য্যগণ শ্রীকৃষ্ণকে অবতারতালিকার ভিতর গণনা করেন নাই, বলরামকে ধরিয়াছেন। কিন্তু বোপদেব বলরামকে না ধরিয়া শ্রীকৃষ্ণকেই ধরিয়াছেন।

শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে বোপদেবের মত।

শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে বোপদেবের মত এবং হেমাদ্রির ব্যাখ্যা আলোচনা করা আবশ্যক, কারণ ইহাতে আমরা ভাগবত-সম্প্রদায়ের প্রাচীন মতের পরিচয় পাইব। এই প্রাচীন ভাগবত সম্প্রদায়ের মত শ্রীমদ্ভাগবতের নিম্নের শ্লোকগুলির আলোচনার মধ্যে পরিদৃষ্ট হয়।

ভূমেঃ সুরেতরবরুথ বিমর্দ্দিতায়াঃ
ক্লেশব্যয়ায় কলয়া সিতকৃষ্ণকেশঃ।
জাতঃ করিষ্যতি জনানুপলক্ষ্যমার্গঃ
কর্ম্মাণিচাত্মমহিমোপনিবন্ধনানি ॥ ১

তোকেন জীবহরণং যদুলুকিকায়া-
স্ত্রৈমাসিকস্য চাপদা শকটোপবৃত্তঃ।
যদ্রিঙ্গতান্তরগতেন দিবিস্পৃশোর্বা
উন্মূলনং ত্বিতরথার্জ্জুনয়োর্ন ভাব্যম্ ॥ ২
যদ্বৈব্রজে ব্রজপশূন্ বিষতোয়পীতান্
গোপাংস্তজীবয়দনুগ্রহদৃষ্টিদৃষ্ট্যা।
তচ্ছুদ্ধয়েঽতিবিষবীর্য্যবিলোলজিহ্ব-
মুচ্চাটয়িষ্যদুরগং বিহরন্ হ্রদিন্যাম্ ॥ ৩

অসুরেতরবরূথবিমর্দ্দিত (অসুরগণ কর্ত্তৃক-নিপীড়িত) পৃথিবীর ক্লেশ দূর করিবার জন্য সিতকৃষ্ণকেশ কলায় জন্মগ্রহণ করিয়া মানবসকলের অনুপলক্ষ্য পন্থায় অর্থাৎ সাধারণ মানবের পক্ষে যাহা একেবারে অসম্ভব এই প্রকারের কার্য্য সমুদয় করিবেন, এই সমুদয় কার্য্য এমন যে তাহার দ্বারা তাঁহার অর্থাৎ শ্রীভগবানের মহিমা প্রতিষ্ঠিত হইবে।

প্রথম শ্লোকের ইহাই সাধারণ বঙ্গানুবাদ। এইবার হেমাদ্রির টীকা অনুসারে শ্লোকটির তাৎপর্য্য নির্দ্ধারণ করিতে হইবে। মূলে আছে 'কলয়া'—"কলয়া পূর্ণরূপেণ নত্বংশেন কৃষ্ণস্তু ভগবান স্বয়ম্ ইত্যনেন বিরোধাৎ। 'কলয়া' শব্দের অর্থ পূর্ণরূপে, অংশরূপে নহে, কারণ 'অংশরূপে' এই অর্থ করিলে "কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং" অর্থাৎ কৃষ্ণই স্বয়ং ভগবান্ এই বাক্যের সহিত বিরোধ হয়। 'সিত' শব্দের অর্থ নির্ম্মল,—মুক্তিরূপ। 'কৃষ্ণ' শব্দের অর্থ মলিন, অনির্ম্মল মুক্তিরূপ। 'ক' শব্দের অর্থ সুখ, সুতরাং কেশ শব্দের অর্থ সুখেশ। 'কেশ' এই শব্দের যদি অন্যরূপ অর্থ করা যায় অর্থাৎ যদি ইহার সাধারণ অর্থ গ্রহণ করা যায়, তাহা হইলে পূর্ব্ববৎ বিরোধ হইবে। বিষ্ণু-পুরাণের পঞ্চম অংশের প্রথমাধ্যায়ের ৫৯ শ্লোকে কথিত হইয়াছে।

উজ্জহারত্মিনঃ কেশৌ সিতকৃষ্ণৌ মহামুনে।

অর্থাৎ হে মহামুনে. ভগবান্, পরমেশ্বর এই প্রকারে স্তুত হইয়া আপনার শ্বেত ও কৃষ্ণ দুগাছি কেশ উৎপাটন করিলেন। এই যে উক্তি ইহারও ব্যাখ্যা আবশ্যক। দুটি কেশ শব্দের অর্থ দুইজন সুখস্বামী। "কেশৌ সুখস্বামিনৌ"। সিত—রাম। 'আত্মনঃ স্বমূর্ত্তে সকাশাদুজ্জহার উদ্ধৃতবান কল্পিতবান্' নিজ মূর্ত্তির নিকট হইতে উদ্ধৃত করিলেন বা কল্পনা করিলেন। হরিবংশে আছে যে ভগবান্ কোন পর্ব্বত গুহায় নিজের মূর্ত্তি নিক্ষেপ করিয়া গরুড়কে তথায় রাখিয়া বলিলেন "আমি স্বয়ং এখানে আসিয়াছি।" হরিবংশে এই কথা এইরূপভাবে আছে—

স দেবানভ্যনুজ্ঞায় বিবিক্তে ত্রিদশালয়ে।
জগাম বিষ্ণুঃ স্বং দেশং ক্ষীরোদস্যোত্তরাং দিশং॥
তত্র বৈ পার্ব্বতী নাম গুহাদেবৈ সুদুর্গমা।
ত্রিভিস্তস্যৈব বিক্রান্তৈর্নিত্যং পর্ব্বসু পূজিতা॥
পুরাণং তত্র বিন্যস্য দেহং হরিরুদারধীঃ।
আত্মানং যোজয়মাস বসুদেবগৃহে বিভুঃ॥

নির্জ্জন স্বর্গভবনে বিষ্ণু দেবগণকে এইরূপ আদেশ করিয়া ক্ষীরোদসাগরের উত্তর দিগবর্ত্তী নিজের দেশে গমন করিলেন। সেখানে পার্ব্বতী নামে অতি দুর্গম এক গুহা আছে, ঐ গুহা তিনজন বিক্রমশালী দেব কর্ত্তৃক পর্ব্বে পর্ব্বে নিত্য পূজিত হইয়া থাকে। উদার বুদ্ধি বিভু হরি সেই গুহায় নিজের নিজের পুরাতন দেহ বিন্যাস করিয়া বসুদেবগৃহে আপনাকে যোজনা করিলেন।

হরিবংশের এই উক্তি যাঁহারা যথাশ্রুত ব্যাখ্যা করিয়াছেন অর্থাৎ ভিতরে প্রবেশ করিয়া রহস্য নির্ণয় না করিয়া সাধারণভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাঁহারা সম্যকরূপে তত্ত্ব বুঝিতে পারেন

নাই। কারণ প্রত্যেক দেবতাই নিজের অর্থাৎ দেবতাদের কাহারও জরা হয় না, ইহা প্রসিদ্ধ আছে, সুতরাং অকাল-কলিত বা কালাতীত যে ভগবান্ তাঁহার জরাই বা কি প্রকারে হইতে পারে, আর জরার ফলস্বরূপ যে কেশের শুক্লতা, তাহাই বা কি প্রকারে হইতে পারে? তাহা ছাড়া এমনও প্রমাণ আছে যে তাঁহার কেশে নৈসর্গিক শুক্লকৃষ্ণতা নাই অর্থাৎ কেহ বলিতে পারেন যে জরার জন্য ভগবানের কেশ শুক্ল হয় নাই তাঁহার মস্তকে স্বভাবতঃই শ্বেতবর্ণ ও কৃষ্ণবর্ণ কেশ আছে—কিন্তু এ কথা সত্য নহে, তাহার প্রমাণ আছে। এই কারণে নরসিংহ পুরাণে কৃষ্ণাবতার প্রসঙ্গে শক্তিশব্দই প্রযুক্ত হইয়াছে কেশশব্দ প্রযুক্ত হয় নাই। নরসিংহ পুরাণে আছে—

বসুদেবাচ্চ দেবক্যামবতীর্য্যমহীতলে।
সিতকৃষ্ণে চ তচ্ছক্তী কংসাদ্যান্ ঘাতয়িষ্যত॥

শ্বেত এবং কৃষ্ণ, তাহার এই দুই শক্তি বসুদেব হইতে দেবকীকে আশ্রয়পূর্ব্বক মহীতলে অবতীর্ণ হইয়া কংস প্রভৃতিকে বিনাশ করিবে।

তাহা হইলে কেশশব্দের দ্বারা অংশ বুঝাইতেছে। যিনি সাক্ষাৎ আদিপুরুষ তিনি 'অবিলুপ্ত সর্ব্বশক্তি' অর্থাৎ তাঁহার সর্ব্বশক্তি সকল সময়েই সমভাবে থাকে বা থাকিতে পারে, অতএব কেশশব্দ সেই সাক্ষাৎ আদিপুরুষকে বুঝাইতে পারে। বিষ্ণু কৃষ্ণ প্রভৃতি শব্দ একই অর্থ বুঝাইতে তুল্যরূপে প্রযুক্ত হইয়া থাকে শ্রীকৃষ্ণ-ব্যতীত অন্য কোন অবতারের জন্মাদিন জয়ন্তী' এই নামে অতিশয় প্রসিদ্ধি লাভও করে নাই। এই কারণে মহাভারতে কথিত হইয়াছে—

ভগবান্, বাসুদেবস্য কীর্ত্ত্যতেঽত্র সনাতনঃ।
শাশ্বতং ব্রহ্মপরমং যোগিধ্যেয়ম্ নিরঞ্জনম্॥

ইহাতে সনাতন, ভগবান্, বাসুদেবের কথা কীর্ত্তন করা হইয়াছে, তিনি শাশ্বত, পরব্রহ্ম, যোগিধ্যেয় এবং নিরঞ্জন ;

শ্রীমদ্ভাগবতে আছে 'ততো জগন্মঙ্গলমচ্যুতাংশ" এখানে বহুব্রীহি সমাস করিয়া অর্থ বুঝিতে হইবে। শ্রীমদ্ভাগবতে অন্যত্র আছে "তত্রাংশেনাবতীর্ণস্য" এখানে 'অংশেন' শব্দের অর্থ অংশের সহিত, আর অংশ বলিতে বলভদ্রকে বুঝায়। সর্ব্বত্রই এই প্রকারে অর্থ নির্দ্ধারণ করিতে হইবে। শ্রীমদ্ভাগবতে আর এক স্থলে আছে "মৎ কেশৌ বসুধাতলম্" ইহাও ব্যাখ্যাত হইয়াছে। অন্যত্র আছে ইহারা দুইজন ভগবান্ হরির অংশ এখানে আসিয়াছেন—এ কথা অন্য কল্পবিষয়ক। অথবা "অংশশ্চ অংশশ্চ অংশৌ" এ প্রকারেও অর্থ করা যায় ; তাহা হইলে এক অংশের বিষয় অর্জ্জুন, তাহা ছাড়া অন্য অংশও আছে। 'অর্শাদ্যচ্' প্রত্যয় করিলে অপর অংশ-শব্দের বিষয় ভগবান্। শ্রীকৃষ্ণ সেই আদি পুরুষ হইতে অভিন্ন।

হেমাদ্রির টীকার এই অনুবাদ দেওয়া হইল, যাহারা তত্ত্বালোচনা করেন তাঁহারা ইহা হইতে অনেক বিষয় চিন্তা করিয়া বুঝিতে পারিবেন। আমরা এইবার অন্যান্য শ্লোকগুলির অর্থনির্ণয় করিতেছি।

তিনমাসের শিশু কর্তৃক উলুকিকা বা পূতনার প্রাণ নাশ, পদাঘাতে শকটকে বিপর্য্যস্তকরণ, জানুতে ভর দিয়া যাইতে যাইতে গগনস্পর্শী অর্জ্জুনবৃক্ষদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী হইয়া তাহাদের উন্মূলন, ইহা কি সাধারণের পক্ষে সম্ভাব্য ? ব্রজপশুগণ ও গোপগণ বিষজল পান করিয়া প্রাণ হারাইয়াছিল, তাহাদিগকে অনুগ্রহদৃষ্টিতে দৃষ্টিপাত করিয়া তাহাদের প্রাণ রক্ষা করিলেন, তাহার পর সেই বিষজলের শুদ্ধিসাধনের জন্য অতিবিষবীর্য্য ও বিলোলজিহ্বা সেই কালিয় সর্পকে হ্রদে বিহার করিয়া উচ্চাটিত করিলেন।

শ্রীবোপদেব এই প্রকারে শ্রীকৃষ্ণ-কর্তৃক অনুষ্ঠিত দাবাগ্নি-পান, বদনে ব্রহ্মাণ্ড প্রদর্শন, বরুণপাশ হইতে নন্দমোচন, ব্রজবাসিগণকে বৈকুণ্ঠপ্রদর্শন, সপ্তবর্ষ বয়ঃক্রমকালে সপ্তদিন গোবর্দ্ধনধারণ, রাসনৃত্য, প্রলম্ব গর্দ্দভাসুর বধ প্রভৃতি অলৌকিক কর্ম্মের কথা শ্রীমদ্ভাগবতের শ্লোকের সাহায্যে উল্লেখ করিয়া প্রতিপাদন করিয়াছেন যে শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্ বা আদ্যপুরুষ।

বোপদেবের মতই আমরা আরও বিকশিত অবস্থায় আমাদের বাঙ্গালা দেশে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু কর্তৃক প্রবর্ত্তিত মতের মধ্যে দেখিতে পাইব। প্রকৃত কথা এই যে 'শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্,' এই কথা ভাগবত-সম্প্রদায়ের বিশেষ মত। তবে এই স্বয়ং ভগবত্তা কি প্রকারে উপলব্ধি করিতে হইবে তাহা জানিবার জন্য আমাদিগকে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাব পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে হইবে।

বোপদেবের আর একটি মত এই প্রসঙ্গে আলোচনা করা আবশ্যক। যুগাবতার চতুষ্টয় সম্বন্ধে তিনি কি বলিয়াছেন তাহা আমাদিগকে আলোচনা করিতে হইবে. যুগাবতার-সম্বন্ধে তাঁহার মত ভ্রান্ত, এবং বঙ্গদেশের বৈষ্ণবাচার্য্যগণ তাঁহার নামের উল্লেখ না করিলেও তাঁহার মত নানাস্থানে নানারূপে খণ্ডন করিয়াছেন : গর্গাচার্য্য কর্তৃক কথিত শ্লোক এবং শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশ স্কন্ধের যুগাবতার সম্বন্ধীয় শ্লোক আমরা পূর্ব্বে আলোচনা করিয়াছি। তাহাতে আমরা দেখিয়াছি যে যুগাবতার দ্বাপরে কৃষ্ণবর্ণ আর কলিতে পীতবর্ণ। কিন্তু বোপদেব সেভাবে ব্যাখ্যা করেন নাই তিনি দ্বাপরে পীতবর্ণ আর কলিতে কৃষ্ণবর্ণ করিয়াছেন।

বোপদেব কল্পাবতার মন্বন্তরাবতার, যুগাবতার ও স্বল্পাবতার এই চারিটি বিভাগ করিয়াছেন।

স্বল্পাবতার।

স্বল্পাবতার-সম্বন্ধীয় তাঁহার শ্লোকটি এই —

সর্গে তপোঽহমৃষয়ো নব যে প্রজেশাঃ
স্থানেঽথধর্ম্মমখমনুমরাবনীশাঃ।
অন্তেত্বধর্ম্মহরমন্যুবশাসুরাদ্যাঃ
মায়াবিভূতয় ইমাঃ পুরুশক্তিভাজঃ॥

সৃষ্টিকালে আমি তপঃ, ঋষিগণ এবং নবপ্রজাপতি, পালনে আমি ধর্ম্ম, যজ্ঞ, মনু, দেবতা ও পৃথ্বীপতিগণ, আর অন্তে আমি অধর্ম্মহর সর্প ও অসুরাদি, অসিম শক্তিশালী শ্রীভগবানের এ সমুদয় মায়া বিভূতি

শ্রীবোপদেবের মুক্তাফল গ্রন্থে ও হেমাদ্রি কৃত তাহার টীকায় শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে যাহা বলা হইয়াছে, আমরা তাহার আলোচনা করিয়াছি, প্রাচীন ভাগবত ও পঞ্চরাত্র-সম্প্রদায়ের যাবতীয় মতের শেষ আলোচনা ও সমন্বয় আমাদের এই বাঙ্গালা দেশে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর কৃপাপাত্র গোস্বামী-পাদগণ কর্ত্তৃক সাধিত হইয়াছে সুতরাং এ সম্বন্ধে এবং পৌরাণিকী ব্রহ্মবিদ্যার অন্যান্য রহস্য-সম্বন্ধে যাহা ভারতবর্ষের শেষ কথা আমরা তাহার গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণের গ্রন্থে অন্বেষণ করিব।

শ্রীকৃষ্ণ।

শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে এইরূপ কথিত হইয়াছে—

ঈশ্বর পরম কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্।
সর্ব্ব অবতারী সর্ব্বকারণ-প্রধান॥
অনন্ত বৈকুণ্ঠ যার অনন্ত অবতার।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড ইহো সভার আধার॥
সচ্চিদানন্দতনু ব্রজেন্দ্র-নন্দন
সর্ব্বৈশ্বর্য্য সর্ব্বশক্তি সর্ব্বরসপূর্ণ॥

বৃন্দাবনে অপ্রাকৃত নবীন মদন।
কাম বীজ কাম গায়ত্রী যার উপাসন॥
পুরুষ যোষিৎ কিবা স্থাবর জঙ্গম।
সর্ব্ব চিত্তাকর্ষক সাক্ষাৎ মন্মথ-মদন॥
নানাভক্তের রসামৃত নানাবিধ হয়।
সেই সব রসামৃত বিষয় আশ্রয়।
শৃঙ্গার রসরাজময় মূর্ত্তিধর।
অতএব আত্মপর্য্যন্ত সর্ব্বচিত্তহর॥
লক্ষ্মীকান্ত আদি অবতারের হরে মন।
লক্ষ্মী আদি নারীগণের করে আকর্ষণ॥
আপন মাধুর্য্যে হরে আপনার মন।
আপনে আপনা চাহে করিতে আলিঙ্গন॥

শ্রীরূপ-গোস্বামীর ভক্তিরসামৃত সিন্ধুগ্রন্থে কথিত হইয়াছে—

অবিচিন্ত্য মহাশক্তি কোটিব্রহ্মাণ্ডবিগ্রহঃ।
অবতারাবলী-বীজং হতারিগতিদায়কঃ॥
আত্মরামাগণাকর্ষীত্যমীকৃষ্ণে কিলাদ্ভুতাঃ।
সর্ব্বাদ্ভুত চমৎকার-লীলাকল্লোল-বারিধিঃ॥
অতুল্য মধুর প্রেমমণ্ডিত প্রিয়মণ্ডলঃ।
ত্রিজগন্মানসাকর্ষি-মুরলীকলকূজিতঃ॥
অসমানোর্দ্ধরূপশ্রীবিস্মাপিতচরাচরঃ॥

কৃষ্ণ-পারম্য-বাদ।

বাঙ্গালাদেশের বৈষ্ণবমতের নাম "কৃষ্ণ পারম্য-বাদ" অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণই যে পরতত্ত্বসীমা এই মত বিশেষভাবে আমাদের দেশে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। প্রাচীন শাস্ত্র সমূহের কিরূপ সমালোচনা ও সমন্বয়ের দ্বারা এইমত প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে তাহা শ্রীজীব-গোস্বামীকৃত শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ ও শ্রীলঘু-ভাগবতামৃত প্রভৃতি শ্রীগ্রন্থের

আলোচনা করিলে বুঝিতে পারা যাইবে। আমরা নিম্নে শ্রীলঘুভাগবতামৃত গ্রন্থের আলোচনায় দু'একটি সিদ্ধান্ত নিম্নে লিপিবদ্ধ করিলাম।

বিল্বমঙ্গল ঠাকুর বলিয়াছেন—

সন্তবতারা বহবঃ পুস্করনাভস্য সর্ব্বতোভদ্রাঃ।
কৃষ্ণাদন্যঃ কো বা লতাস্বপি প্রেমদো ভবতি॥

পদ্মনাভের সর্ব্বতোভাবে মঙ্গলকর বহু বহু অবতার আছেন, কিন্তু কৃষ্ণ-ব্যতীত কে লতাসমূহকে পর্য্যন্ত প্রেমদান করিয়া থাকেন ?

শ্রীরামচন্দ্র, নৃসিংহদেব ও শ্রীকৃষ্ণ ইঁহাদের তিনজনের মধ্যে বিষ্ণু পুরাণের চতুর্থ অংশে তুলনা করা হইয়াছে। সেই তুলনার ফলে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত পাওয়া যায়। নৃসিংহমূর্ত্তি দর্শন করিয়া তাহাতে অর্থাৎ ঐ মূর্ত্তিতে হিরণ্যকশিপুর বিষ্ণু-বুদ্ধি হয় নাই। হিরণ্যকশিপুর প্রকৃতিতে তখন রজোগুণ অতিমাত্রায় উদ্রিক্ত হইয়াছিল এবং হিরণ্যকশিপু মৃত্যুকালে অনুভব করিয়াছিলেন যে ইনি অর্থাৎ এই নৃসিংহদেব যিনি যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া আমার প্রাণনাশ করিতেছেন, ইনি—বিশেষরূপ কোন পুণ্যরাশিসমদ্ভূত এক অতিতেজস্বী ও আমার অপরিচিত কোন প্রাণী। এই ভাবনা লইয়া হিরণ্যকশিপুর মৃত্যু হইল, তাহার ফলে সুদুর্লভ ভোগ সম্পত্তি-সহ তিনি রাবণ-দেহ প্রাপ্ত হইলেন। ভগবান্ নৃসিংহদেব পরব্রহ্ম, তিনি সম্মুখে প্রকট, কিন্তু, হিরণ্যকশিপুর দোষক্ষয় হইল না। অত্যন্ত আবেশ না হইলে দোষক্ষয় হয় না। দোষক্ষয় না হওয়ায়, ভগবানের শুদ্ধ-স্বরূপ তিনি অন্তকালে অনুভব করিতে পারিলেন না, ফলে নৃসিংহের সম্মুখে এবং অতি নিকটে থাকিলেও তিনি সাযুজ্যলাভ করিতে

পারিলেন না, রাবণ হইয়া তাঁহার চিত্ত অতিরিক্ত পরিমাণে কামার্ত্ত ছিল, কাজেই মৃত্যুকালেও শ্রীরামচন্দ্র মনুষ্যবুদ্ধি সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করিতে পারেন নাই। তৃতীয়বারে তিনি শিশুপাল হইয়া জন্মগ্রহণ করিলেন এবং এবারেও সর্ব্বোত্তম ভোগসম্পত্তি লাভ করিলেন। এবারে তাহার অবস্থা অনুরূপ হইল। বিষ্ণুর যে সকল নাম শ্রীকৃষ্ণেরও সেই সকল নাম—অবশ্য বিষ্ণুতে প্রযুক্ত হয় এক কারণে আর শ্রীকৃষ্ণে প্রযুক্ত হয় অন্য কারণে। কিন্তু নামগুলি এক। শিশুপাল পরমাবিষ্ট হইয়া, অবশ্য শক্রভাবে, শ্রীকৃষ্ণের এই নামগুলি সর্ব্বদা উচ্চারণ করিত এবং তাঁহাব রূপও সর্ব্বদা চিন্তা করিত। তাহার ফলে শিশুপালের দ্বেষ-জনিত পাপরাশি ভস্মীভূত হইয়াছিল, শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক নিক্ষিপ্ত সুদর্শনচক্র প্রভাবে তাহার দৈত্যভাবও অন্তহিত হইয়াছিল। ইহার ফলে শিশুপাল শ্রীকৃষ্ণে সাযুজ্য লাভ করে।

তস্মাৎ ত্রয়াণামেবায়ং শ্রেষ্ঠ ইত্যত্র বিস্ময়ঃ।
কো বা স্যাৎ ন তথা যস্মাৎ স্বভাবোঽনাত্রদৃশ্যতে ॥
অতো মন্বক্ষরমনোঃ কল্পে স্বায়ম্ভুবাগমে।
পূজাস্তেঽস্যাবৃতিত্বেন রাম সিংহাসনাদয়ঃ ॥

অতএব নৃসিংহ এবং রাম মধ্যে কৃষ্ণই শ্রেষ্ঠ, ইহাতে বিস্ময়ের কারণ কি? নিহত শক্রকে সাযুজ্য-গতি দান আর কেহই করেন না। শিবাগমে চতুর্দ্দশাক্ষর মন্ত্রের বিধানে রাম ও নৃসিংহাদি শ্রীকৃষ্ণের আবরণ দেবতারূপে পূজিত হইয়া থাকেন।

এই সিদ্ধান্ত না বুঝিয়া পাঠ করিলেই সাম্প্রদায়িক বিরোধের আগুন জ্বলিয়া উঠিবে। যিনি নৃসিংহ মন্ত্রের উপাসক তিনি বলিবেন, কি আমার নৃসিংহ ছোট হইয়া গেলেন? যিনি রামচন্দ্রের উপাসক তিনি বলিবেন, কি রামচন্দ্র ছোট হইলেন?

আর যিনি কৃষ্ণমন্ত্রের গুরু তিনি খুসী হইয়া মনে মনে হাস্য করিবেন এবং দুই চারিজন ধনবান্ ব্যক্তিকে হাত করিয়া সভা করিয়া বুঝাইয়া দিবেন যে তোমরা নৃসিংহমন্ত্র ও রামমন্ত্র ছাড়িয়া আমাদের নিকট কৃষ্ণমন্ত্র গ্রহণ কর; আর উপাসকেরা অমনি তাড়াতাড়ি কৃষ্ণমন্ত্র লইবেন, ফলে নৃসিংহমন্ত্র ও রামমন্ত্র দিয়া যাঁহারা পয়সা রোজগার করিতেছিলেন, তাঁহাদের গুরুগিরির পশার বা কাট্‌তি কমিয়া যাইবে, কৃষ্ণমন্ত্রের গুরুর আয় বাড়িয়া যাইবে। কাজেই সাম্প্রদায়িক স্বার্থ যখন পয়সা লইয়া টানা-টানি, তখন এ প্রকারের কথা প্রচার করা সত্যই বড় বিপজ্জনক এবং এই সিদ্ধান্তের সহিত যখন গুরুগিরির পয়সা রোজগারের সম্বন্ধ রহিয়াছে, তখন এ কথা বড় সাবধানে প্রচার করা উচিত। আমার উত্তর এই যে সম্প্রদায়ের দোহাই দিয়া যে সব পাপিষ্ঠ অর্থার্জ্জনের চেষ্টা করে, সেই সব কাণ্ড-জ্ঞানহীন মূর্খের জন্য আমার এ পুস্তক নহে, আর অন্যায় উপায়ে ধনোপার্জ্জনশীল তাহাদের বিষয়ী চেলাদের জন্যও এ গ্রন্থ নহে—এই গ্রন্থ চিন্তাশীল ভদ্রলোকের জন্য।

নৃসিংহ, রাম ও শ্রীকৃষ্ণ ইহাদের মধ্যে এইরূপ তুলনা করার পর শ্রীরূপ গোস্বামী মহোদয় যাহা বলিতেছেন ধীরভাবে তাহা শ্রবণ করিলেই সাম্প্রদায়িক বিরোধের আর কোনই কারণ থাকিবে না। মহাবরাহপুরাণে কথিত হইয়াছে—

> সর্ব্বে নিত্যাঃ শাশ্বতাশ্চ দেহাস্তস্য পরাত্মনঃ।
> হানোপাদানরহিতা নৈব প্রকৃতিজাঃ ক্বচিৎ॥
> পরমানন্দসন্দোহা জ্ঞানমাত্রাশ্চ সর্ব্বতঃ
> সর্ব্বে সর্ব্ব গুণৈঃ পূর্ণা সর্ব্বদোষবিবর্জ্জিতাঃ॥

সেই পরাত্মা শ্রীভগবানের সমুদয় দেহই নিত্য এবং শাশ্বত অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ আবির্ভূত হইয়া থাকে। স্বরূপ হইতে অভিন্ন বলিয়া হানোপাদান রহিত। সুতরাং উহা প্রাকৃত নহে। সকল

দেহই ঘনীভূত পরমানন্দ, জ্ঞানমাত্র, সর্ব্বসদ্‌গুণপূর্ণ এবং সর্ব্বদোষবিরহিত।

নারদপঞ্চরাত্রে কথিত হইয়াছে—

মণির্যথাবিভাগেন নীলপীতাদিভির্যুতঃ।
রূপভেদমবাপ্নোতি ধ্যানোভেদাৎ তথাচ্যুতঃ॥

মণি (বৈদূর্য্য, কারণ বৈদূর্য্যমণির বহুরূপ) যেমন অবস্থানভেদে নীল পীত প্রভৃতি বহু বর্ণযুক্ত হয় সেইরূপ শ্রীভগবান্‌ অচ্যুত ধ্যানভেদে রূপভেদ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

একথা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে এই সকল অবতারের তারতম্য বিচার কেন? উত্তর সমুদয় অবতারই পরিপূর্ণ, কিন্তু সমুদয় অবতারে সমুদয় শক্তির অভিব্যক্তি বা প্রাকট্য হয় নাই। ঐশ্বর্য্য, মাধুর্য্য, কৃপা এবং তেজঃ প্রভৃতিকে শক্তি বলে। শক্তি-প্রাকট্যের তারতম্যানুসারেই অবতারের তারতম্য বিচারিত হয়। শ্রীভগবান্ স্বরূপে অদ্বয়, ইহা সকল সময়েই মনে রাখিতে হইবে। ভাবনাভেদে একই স্বরূপের সগুণ নির্গুণ এই দুই প্রকার প্রতীতি। শ্রীমদ্ভাগবতের তৃতীয় স্কন্ধে কথিত হইয়াছে—

কর্ম্মাণ্যনীহস্য ভবোঽভবস্য তে।
দুর্গাশ্রয়োঽথারিভয়াৎ পলায়নম্।
কালাত্মনো যৎ প্রমদাযুতাশ্রমঃ
স্বাত্মন্‌রতেঃ খিদ্যতি ধীর্বিদামিহ।

নিরীহের কর্ম্ম, অজের জন্ম, কালস্বরূপ যিনি তাঁহার শক্রভয়ে দুর্গমধ্যে আশ্রয়-গ্রহণ ও পলায়ন, আত্মারাম হইয় ষোড়শ সহস্র রমণীর সহিত বিলাস, এই সকল বিষয়ে তত্ত্বজ্ঞানীরও বুদ্ধি বিমোহিত হয়।

অতএব শ্রীভগবানের অচিন্ত্যশক্তিই লীলার হেতু। ভগবানের যেমন ইচ্ছা হইবে, ঐ অচিন্ত্যশক্তি অমনি সেইরূপ লীলার ব্যবস্থা করিবেন।

এই সিদ্ধান্ত লইয়া আলোচনা করিলে আমরা বুঝিতে পারিব যে ভক্ত-হৃদয়ের অনুভূতি বা আস্বাদনই ভগবানের প্রাকট্যের তারতম্যের হেতু। অতএব অবতার-বিশেষের স্বরূপ লইয়া বৃথা গণ্ডগোল না করিয়া নিজ নিজ জীবনের ও হৃদয়বৃত্তির উৎকর্ষবিধান করিয়া লীলার প্রাকট্য যাহারা অনুভব করিয়াছেন ও আস্বাদন করিয়াছেন তাঁহাদের সেই অনুভব ও আস্বাদনকে নিজের করিতে হইবে। ইহার অর্থ এই, তুমি যত জোরেই কৃষ্ণকে স্বয়ং ভগবান্ বলনা কেন, কৃষ্ণপারম্যবাদীর দলভুক্ত হইয়া যতই হুঙ্কার গর্জ্জন করনা কেন, তোমার কোনই উপকার হইবে না। কৃষ্ণে যাহাদের ভগবত্তা জ্ঞান হইয়াছিল তাঁহাদের সেই অনুভূতি ও আস্বাদন যতক্ষণ না তুমি লাভ করিবে, ততক্ষণ মুখের কথা কেবল একটি আওয়াজ মাত্র। প্রত্যেক সম্প্রদায়ের সাধক যেদিন এই গূঢ় সত্য যথার্থরূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়া নিজের জীবনে প্রয়োগ করিতে পারিবেন, সেইদিন পৃথিবীবাসীর ধর্ম্মজীবনে এক অতি গৌরবময় নবযুগের আবির্ভাব হইবে। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এই প্রকারের এক নবযুগের ঊষালোক লইয়াই এই নদীয়ায় আবির্ভূত হইয়াছিলেন।

একদল লোক মনে করে একজন নামজাদা গুরুর নিকট মন্ত্র লইলেই আমি উদ্ধার হইব। এইরূপ মনে করায় তাহার আর কুলগুরু বা দেশের গুরু পসন্দ হয় না, বিজ্ঞাপনের আড়ম্বর-ওয়ালা, বড় বড় শিষ্য ওয়ালা এক গুরুর শরণাগত হয়। এই ক্রীতদাস মুরুব্বি ধরিয়া বড় চাকুরী পাইয়াছে, তাই মনে করে যে কোন প্রকারে এক বড় মুরুব্বি ধরিতে পারিলে ধর্ম্মরাজ্যেও জয়যুক্ত হইব। কিন্তু তাহা হইবার নহে।

"উদ্ধরেদাত্মনাত্মানম্ নাত্মানমবসাদয়েৎ।" আত্মাদ্বারাই আত্মাকে উদ্ধার করিবে, আত্মাকে অবসন্ন করিও না।

"আত্মৈব হ্যাত্মনো বন্ধুরাত্মৈবরিপুরাত্মনঃ।" আত্মাই আত্মার বন্ধু আর আত্মাই আত্মার শত্রু। এই ভগবদ্বাণী সকল রকমের সাধন-পথের পথিক সম্বন্ধেই সত্য। ভুল করিয়া শ্রীকৃষ্ণের এই কথাকে জ্ঞানপন্থী অদ্বৈতবাদীদের কথা মনে করিবেন না। আসল কথা আমি অঙ্ক কষিয়া উত্তর ঠিক করিয়াছি, আপনি কষা অঙ্কের উত্তর মুখস্থ করিয়া এখানে পাশ করিয়াছেন বলিয়াই যে ধর্ম্মজীবনেও সেইরূপ সুবিধা হইবে, সেরূপ আশা করিবেন না। তাহা হইলে গুরু কি করিবেন? তিনি পথ দেখাইয়া দিবেন, সাহায্য করিবেন, এইমাত্র। কিন্তু আমার পথ, শত পরীক্ষার মধ্য দিয়া আমাকেই চলিতে হইবে। অধ্যাত্মজীবনের অনুশীলনে এমন একদিন আসিবে যেদিন বাহিরের গুরু আমারই ভিতরে লুকাইয়া যাইবেন—"সে বড় কঠিন ঠাঁই, গুরু শিষ্যে দেখা নাই।" গুরু-সম্বন্ধে যাহা সত্য, উপাস্য সম্বন্ধেও ঠিক তাহাই সত্য, অর্থাৎ কৃষ্ণ সর্ব্বোত্তম আর আমি সেই কৃষ্ণ উপাসনার সম্প্রদায়ভুক্ত হইয়াছি বলিয়াই যে আমি অন্য সম্প্রদায়ের লোক হইতে বড় হইয়া গিয়াছি কদাচ এরূপ মনে করিবেন না। অনেকে কৃষ্ণ-উপাসনা করেন বলিয়া মনে করেন কিন্তু কার্য্যতঃ এক সামান্য দেবতার উপাসনা করেন। আমি কাহার উপাসনা করি তাহা আমার জীবনের দ্বারা নির্দ্ধারিত হয় কথার দ্বারাও নহে বেশভূষার দ্বারাও নহে। পূর্ব্বের সিদ্ধান্ত ভাল করিয়া বুঝিলে আমরা এই মহতী শিক্ষা লাভ করিব।

শ্রীকৃষ্ণ ক্ষীরোদক-শায়ী-বিষ্ণুর অবতার, এই প্রকারের মতও প্রচলিত ছিল, শ্রীরূপগোস্বামী সেই মত খণ্ডন করিয়াছেন। আমরা পূর্ব্বে শ্রীমদ্ভাগবতের দ্বিতীয় স্কন্ধের শ্লোকের "সিত-কৃষ্ণকেশ" এই পদের অর্থ বোপদেবের মতানুসারে বর্ণনা

করিয়াছি—শ্রীরূপ গোস্বামী তাহার আর একরূপ অর্থ করিয়াছেন। মূলে আছে "কলয়া সিতকৃষ্ণকেশঃ," শ্রীরূপ গোস্বামী অর্থ করিয়াছেন কলয়া অর্থাৎ কলা বা শিল্পনৈপুণ্যের দ্বারা যিনি তাঁহার কৃষ্ণ অর্থাৎ শ্যামল কেশরাশি, সিত বা বদ্ধ করিয়াছেন, ইহার দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের রসিকশেখরত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে। কথাটির আর একপ্রকার অর্থও তিনি করিয়াছেন—শ্বেতকৃষ্ণকেশ সমূহে সুশোভিত ক্ষীরোদশায়ী পুরুষ যাহার অংশে আবির্ভূত হইয়াছেন, সেই লীলা-পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ। শ্রীরূপ গোস্বামী মহোদয় শ্রীমদ্ভাগবতের পুরুষাবতার সম্বন্ধীয় শ্লোকগুলি বিস্তৃতরূপে ব্যাখ্যা করিয়া কারণার্ণবশায়ী ও গর্ভোদশায়ী যে শ্রীকৃষ্ণের অংশ এবং শ্রীকৃষ্ণই যে পূর্ণ তাহা স্থাপন করিয়াছেন।

শ্রীকৃষ্ণ পরমব্যোমপতি নারায়ণের চতুর্ব্যূহের মধ্যে প্রথম ব্যূহ যে বাসুদেব, তাঁহার অবতার এই প্রকারের আর একটি মত প্রচলিত ছিল বা সম্প্রদায়-বিশেষে এখনও প্রচলিত আছে। শ্রীরূপ গোস্বামী এ মতও খণ্ডন করিয়াছেন। অপর মতে শ্রীকৃষ্ণ পরমব্যোমপতি নারায়ণের বিলাস সে মতও খণ্ডিত হইয়াছে। নির্বিশেষ ব্রহ্ম অপেক্ষা শ্রীকৃষ্ণ শ্রেষ্ঠ, ব্রহ্ম তাঁহার অঙ্গকান্তি। সর্ব্বশেষে শ্রীরূপ গোস্বামী প্রতিপাদন করিয়াছেন, শ্রীকৃষ্ণই স্বয়ংরূপ, নারায়ণই শ্রীকৃষ্ণের বিলাস।

গুণাবতার।

পুরুষাবতারের কথা আমরা প্রবন্ধান্তরে বিস্তৃতরূপে আলোচনা করিব। গুণাবতার-সম্বন্ধে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের উক্তি উদ্ধৃত হইল। ইহাই শ্রীরূপ গোস্বামীর মত।

ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব তিন গুণ অবতার।
ত্রিগুণাঙ্গীকারে করে সৃষ্ট্যাদি ব্যবহার॥
ভক্তিমিশ্রিত কৃতপুণ্য কোন জীবোত্তম।
রজোগুণে বিভাবিত করি তার মন॥

গর্ভোদকশায়ী দ্বারে শক্তি সঞ্চারী।
ব্যষ্টি সৃষ্টি করে কৃষ্ণ ব্রহ্মা রূপ ধরি ॥
কোন কল্পে যদি যোগ্য জীব নাহি পায়।
আপনি ঈশ্বর তবে অংশে ব্রহ্মা হয় ॥
নিজাংশ কলায় কৃষ্ণ তমোগুণ অঙ্গীকরি।
সংহারার্থে মায়া-সঙ্গে রুদ্ররূপ ধরি ॥
মায়াসঙ্গে বিকারি রুদ্র ভিন্নাভিন্ন রূপ।
জীবতত্ত্ব নহে নহে কৃষ্ণের স্বরূপ ॥
দুগ্ধ যেন অম্লযোগে দধিরূপ ধরে।
দুগ্ধান্তর বস্তু নহে দুগ্ধ হইতে নারে ॥
শিবমায়া শক্তিযুক্ত তমোগুণাবেশ।
মায়াতীত গুণাতীত বিষ্ণুপরমেশ ॥
পালনার্থ স্বাংশ বিষ্ণুরূপে অবতার।
সত্বগুণদ্রষ্টা তাতে গুণ মায়াপার ॥
স্বরূপ ঐশ্বর্য্যপূর্ণ কৃষ্ণসম প্রায়।
কৃষ্ণ অংশী, তেঁহো অংশ বেদে হেন গায় ॥
ব্রহ্মা শিব আজ্ঞাকারী ভক্ত অবতার।
পালনার্থে বিষ্ণু কৃষ্ণের স্বরূপ আকার ॥

দ্বিতীয় পুরুষ গর্ভোদশায়ী হইতে বিশ্বের পালন, সৃষ্টি ও সংহারের জন্য বিষ্ণু, ব্রহ্মা এবং রুদ্র এই তিন গুণাবতার আবির্ভূত হইয়া থাকেন। হিরণ্যগর্ভ ও বৈরাজভেদে ব্রহ্ম দ্বিবিধ। হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মলোকের সূক্ষ্মরূপ, আর যে রূপের দ্বারা সৃষ্টি কার্য্য হয় তাঁহার নাম বৈরাজরূপ।

মানব সাধনা বলে ক্রমে ক্রমে উন্নতিলাভ করিতে করিতে ব্রহ্মাণ্ড-বিশেষের ব্রহ্মার পদ লাভ করিতে পারেন। এমন করিয়া অনেকেই ব্রহ্মা হইয়াছেন। চরিতামৃতে যাহা বলা হইয়াছে

তাহা পদ্মপুরাণের মত। উক্ত পুরাণে কথিত হইয়াছে কোন কোন মহাকল্পে জীব উপাসনা-প্রভাবে ব্রহ্মা হন, আর কোন কোন মহাকল্পে গর্ভোদশায়ী মহাবিষ্ণুই ব্রহ্মা হইয়া থাকেন। কালভেদে ব্রহ্মাতে জীবত্ব ও ঈশ্বরত্ব এই উভয়ই ছিল।

রুদ্র একাদশব্যূহ এবং অষ্টমূর্ত্তি। রুদ্রের একাদশব্যূহের নাম অজৈকপাৎ, অহির্ব্রধ্ন বিরূপাক্ষ, রৈবত, হর, বহুরূপ, ত্র্যম্বক, সাবিত্র, জয়ন্ত, পিনাকী ও অপরাজিত। ব্রহ্মাকে যেমন কোন কোন স্থানে জীববিশেষ বলা হইয়াছে। ব্রহ্মা সম্বন্ধে যে সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে, রুদ্র সম্বন্ধেও সেই সিদ্ধান্তই প্রযোজ্য।

যিনি গুণাবতার বিষ্ণু, তিনি ক্ষীরোদশায়ী। গর্ভোদশায়ীর বিলাস বলিয়া মুনিগণ বিষ্ণুকে নারায়ণ এবং বিরাটের অন্তর্যামী বলিয়া থাকেন।

বেদে অবতার।

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি বেদে অবতারের কথা আছে। বেদ-সম্বন্ধে কোন কথা আলোচনা করিতে হইলে একটি কথা সর্ব্বদাই স্মরণ রাখিতে হইবে। সমগ্র বৈদিক সাহিত্য আমরা পাই নাই। এখন বৈদিক-সাহিত্য বলিলে আমরা যাহা বুঝি তাহা সমগ্র বৈদিক সাহিত্যের একাংশ মাত্র, ইহা সকলেই জানেন। সুতরাং "বেদে ইহা নাই" এ প্রকারের কথা বলা কোন সময়েই সঙ্গত নহে। স্মৃতি বা ধর্ম্মশাস্ত্রের আলোচনায় দেখা যায় যে অনেক শ্রুতি লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। পুরাণ ও স্মৃতি-শাস্ত্রের অন্তর্গত, অতএব আমরা পুরাণের মধ্যে অবতার সম্বন্ধে যে সমুদয় কথা দেখিতে পাই এবং যে সমুদয় কথা সম্প্রদায়-প্রণালীর সাধনের অঙ্গীভূত হইয়া রহিয়াছে, সে সমুদয় কথার বীজ বেদের মধ্যে আছে, ইহা যাঁহারা বেদ-বিশ্বাসী তাঁহারা স্বীকার করিয়া থাকেন। যাহা হউক বেদ-সম্বন্ধে আর অধিক আলোচনার প্রয়োজন নাই। বৈদিক সাহিত্যে যেটুকু পাওয়া যায়, সেই টুকুই আমাদের ধর্ত্তব্য।

আমরা জানি মৎস্যাবতার বিষ্ণুর, কিন্তু মহাভারতে বনপর্ব্ব ১৮৭ অধ্যায়ে মৎস্যদেবকে ব্রহ্মার অবতার বলা হইয়াছে।

শতপথ ব্রাহ্মণে বামনাবতারের কথা আছে। পুরাণের আখ্যায়িকার সহিত এই আখ্যায়িকার অনেক প্রভেদ আছে। শতপথ ব্রাহ্মণে দুই স্থানে বামনাবতারের প্রসঙ্গ আছে। •

প্রথম অংশে আছে অসুরেরা দেবতাদের পরাস্ত করিয়া পৃথিবীরাজ্য ভোগ করিতে লাগিলেন। বিষ্ণু-যজ্ঞরূপী, দেবতারা এই বিষ্ণুকে নেতা করিয়া অসুরদের নিকট আসিলেন এবং পৃথিবীর কিঞ্চিৎ অংশ ভিক্ষা চাহিলেন। অসুরেরা বলিল বিষ্ণু শয়ন করিয়া যতটুকু স্থান দখল করিতে পারিবে ততটুকু স্থান দেবতারা পাইবেন বিষ্ণু বামনরূপ ধরিয়া যজ্ঞ করিতে পারা যায় এমন পরিমান স্থান অর্থাৎ অতি অল্প স্থান অধিকার করিলেন। এই অল্প স্থানে যজ্ঞ আরম্ভ হইল এবং যজ্ঞের ফলে দেবতারা ক্রমে ক্রমে অসুরদের নিকট হইতে সমগ্র পৃথিবী কাড়িয়া লইলেন। তৈত্তিরীয় আরণ্যকে দেখা যায় যে প্রজাপতির মেদাংশ কূর্ম্মাকার ধারণ করিয়া জলে বিচরণ করিতেছে। উক্ত আরণ্যকে নরসিংহ অবতারেরও আভাস পাওয়া যায়। পৌরাণিকেরা বলেন যে বেদের ন্যায় পুরাণও অনাদি। প্রাচীনতম উপনিষদে পুরাণের নাম আছে। বর্ত্তমান সময়ে পুরাণ সমূহ যে আকারে রহিয়াছে সে আকারে হয়ত চিরকাল ছিলনা, সে আকার হয়ত পরবর্ত্তী কালে আসিয়াছে। কিন্তু আকার লইয়া বৃথা গোলযোগ করিয়া লাভ কি? পুরাণের মধ্যে যে শিক্ষা ও উপদেশ রহিয়াছে, তাহা গুরুশিষ্য-পরম্পরায় চিরকালই রহিয়াছে। অন্ততঃপক্ষে সেই সমুদয় শিক্ষার যাহা মূলসূত্র তাহা চিরকালই আছে, এরূপ অনুমান করায় দোষ কি? আচার্য্য শঙ্কর প্রভৃতি কখনও পুরাণের বিপক্ষে কিছু বলেন নাই, বরং পুরাণের শিক্ষাকে সত্য বলিয়া মানিয়া লইয়াছেন। পৌরাণিক শিক্ষার ভিতরে অবতার-কথা একটি প্রধান কথা। ভগবদ্গীতার চতুর্থ অধ্যায়ে ভগবানের অবতাররূপে আবির্ভাব যে ভাবে বর্ণিত হইয়াছে তাহাতে মনে হয় যে অবতার-কথা

গীতার একটি প্রধান কথা। গীতায় ভগবানের জন্ম ও কর্ম্মের কথা বলিয়া বলা হইয়াছে যে, যে ব্যক্তি তত্ত্বতঃ ভগবানের এই জন্ম ও কর্ম্ম বুঝিতে পারিবে, তাহাকে আর জন্ম কর্ম্মের বাধ্যতায় কষ্ট পাইতে হইবে না। আমি আমার জন্ম দেখি, তাহাতেই আমার এই নিদারুণ মৃত্যুভয়; আমি আমার কর্ম্ম দেখি সেই জন্যই কর্ম্ম আমার বন্ধন হইয়াছে; কিন্তু এই প্রপঞ্চেও ভগবানের জন্ম হইতেছে ও হইয়াছে এবং তিনি কর্ম্ম করিয়াছেন ও করিতেছেন, আমি যদি তাঁহার এই জন্ম ও কর্ম্ম বুঝিতে পারিতাম তাহা হইলে এই জন্ম-কর্ম্মের বাধ্যতা হইতে আমি পরিত্রাণ পাইতাম। ইহাই অবতার-কথার প্রধান সার্থকতা।

সাধারণ মানুষের নিকট অবতার কথা ও পুরাণের অন্যান্য কথা আখ্যায়িকা মাত্র। কিন্তু পুরাণ কেবলমাত্র নিম্নাধিকারীর জন্য নহে, পুরাণ সকলের জন্য। যাঁহারা জীবন্মুক্ত ও ব্রহ্মবিৎ তাঁহারাও পুরাণের লীলার আস্বাদন করেন। কাজেই বুঝিতে হইবে যে পৌরাণিক আখ্যায়িকার ভিতরে আরও গূঢ় তাৎপর্য্য আছে। প্রকৃতির মধ্যে পুরুষের খেলা, ইহাই আমাকে দেখিতে হইবে ও বুঝিতে হইবে। যখনই যিনি অবতার আসিয়াছেন, আমি তাহা দেখিয়াছি। আমার এই চেতনার মধ্যে সেই সমুদয় স্মৃতি রহিয়াছে। সনক, সনন্দ, সনাতন, সনৎকুমার, নারদ, বরাহ, যজ্ঞ, নরনারায়ণ প্রভৃতি যখনই যিনি আসিয়াছেন, আমি সে সব দেখিয়াছি, কিন্তু সে সব কথা আমার মনে নাই, সেই জন্যই আমি নিজেকে এত দুর্ব্বল বলিয়া, এত ক্ষুদ্র ও অসহায় বলিয়া বিবেচনা করিতেছি। এই দুর্ব্বলতার হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইতে হইলে আত্মজ্ঞানের প্রয়োজন। অতীতের সমগ্র স্মৃতি যাহা আমার মধ্যে নিদ্রিত ও নিষ্ক্রিয় অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে, সেই স্মৃতি আমায় জাগাইতে হইবে। পুরাণ, সেই স্মৃতি জাগাইবার জন্য অবতার-কথা কীর্ত্তন করিয়াছেন। বাহিরে পুরাণের কথা শুনুন আর অন্তর্মুখী হইয়া বা অন্তর্দৃষ্টি-সম্পন্ন হইয়া তাহা বুঝুন।

শ্রীমদ্ভাগবতে অবতার-কথা যে ভাবে কীর্ত্তিত হইয়াছে, শ্রীরূপ গোস্বামী মহোদয়ের পদাঙ্কানুসরণ করিয়া আমরা তাহার আলোচনা করিলাম। পূর্ব্বে দশাবতারতত্ত্ব ডার্বিনের মতানুসারে যে ভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে, তাহা যে কিছুই নহে, অন্ততঃপক্ষে পৌরাণিকী ব্রহ্ম বিদ্যার আলোচনায় ঐ মত যে নিতান্তই ক্ষতিকর, তাহা সকলেই বুঝিতে পারিয়াছেন। জয়দেবের গীত-গোবিন্দের টীকাকারগণের মধ্যে পূজারি গোস্বামী বাঙ্গালী। বাঙ্গালা দেশের বৈষ্ণবগণ তাঁহার ব্যাখ্যাই সাদরে গ্রহণ করেন। তিনি বলেন দশ অবতার দশটি রসের ঘণ মূর্ত্তি। প্রাচীন কথার ব্যাখ্যা করার সময় প্রথমে জানিতে হয় এই কথা এতদিন কি ভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। তাহা না জানিয়া তাড়াতাড়ি যাহাহউক একটা ব্যাখ্যা করিলে জাতীয় সভ্যতার অপমান করা হয়। আধুনিক শিক্ষা আমাদিগকে এই প্রকারে পদে পদে আমাদের দেশের প্রাচীন ও পবিত্র জিনিষগুলিকে অবজ্ঞা ও অপমান করিতে শিখাইয়াছে। উকীলি হেতুবাদের দ্বারা অধ্যাত্মবিদ্যার সমর্থন নিতান্তই বালকোচিত প্রয়াস। তবে হইতে পারে এই চেষ্টার দ্বারা একযুগে কিছু উপকার হইয়াছে।

ঐ আলোচনা হইতে একটি কথা বেশ বুঝিতে পারা যায়। সে আমাদের লজ্জার কথা, আমাদের চিত্তজয়ের কথা। পাশ্চাত্য শিক্ষায় আমরা আমাদের মনই হারাইয়াছি। পাশ্চাত্য বিদ্যার মূল্য ও সার্থকতা আছে, ঐ বিদ্যা আমাদিগকে গ্রহণ করিতে হইবে, কিন্তু এই বিদ্যার একটা দারুণ মোহ আছে। আমরা এই বিদ্যাকে একমাত্র বিদ্যা মনে করিয়া তাহাকেই অন্য যাবতীয় বিদ্যার ও চিন্তা-প্রণালীর অভ্রান্ত মানদণ্ড বলিয়া বিবেচনা করি। এই মোহ হইতে ভগবান্ আমাদিগকে রক্ষা করুন।

মন্বন্তর-কথা

কাল-পরিচয়।

হিন্দু-সন্তান পঞ্জিকার পাতা খুলিলেই দেখিতে পাইবেন, এখন শ্বেতবরাহ কল্প চলিতেছে। সেই কল্পের ছয় মনু অতীত, এখন সপ্তম মনু বা বৈবস্বত মনুর শাসন-কাল চলিতেছে। এই মনুর অধীনে সাতাইশটী মহাযুগ অতীত এখন অষ্টাবিংশতি মহাযুগের অন্তর্গত কলিযুগ চলিতেছে। সেই কলিযুগের ৫০৩১ বৎসর অতীত। কোন কোন তীর্থস্থানে সঙ্কল্প করিয়া কোন ধর্ম্মকার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে হইলে সঙ্কল্প-বাক্যেই এই কাল-পরিচয় উল্লেখ করিতে হয়। সুতরাং এই কাল-পরিচয় অত্যন্ত আবশ্যক।

মনুষ্যলোক পিতৃলোক ও দেবলোকের সময়।

প্রত্যেক পুরাণেই কালের বিবরণ দেখিতে পাওয়া যায়। শ্রীমদ্ভাগবতের তৃতীয় স্কন্ধ একাদশ অধ্যায়ে মৈত্রেয় ঋষি বিদুরকে এই তত্ত্ব বলিয়াছেন। আমরা মানুষ, আমাদের পঞ্চদশ অহোরাত্রে একপক্ষ, দুই পক্ষে একমাস। আমাদের একমাস পিতৃলোকে এক অহোরাত্রি, আমাদের শুক্লপক্ষ তাঁহাদের দিবা আর আমাদের কৃষ্ণপক্ষ তাঁহাদের রাত্রি। ছয়মাসে আমাদের এক অয়ন, দক্ষিণায়ণ ও উত্তরায়ণ, এই দুই অয়ণে এক বৎসর। আমাদের এক বছরে দেবতাদিগের এক অহোরাত্রি, সুতরাং আমাদের ৩৬০ বৎসরে দেবতাদিগের এক বৎসর। দেবতাদের হিসাবে কলিযুগের পরিমাণ ১০০০ দৈব সম্বৎসর, এই কলিযুগের সন্ধ্যা ১০০ দৈব সম্বৎসর, আর সন্ধ্যাংশ ১০০ সম্বৎসর। অতএব কলিযুগের পরিমাণ (১০০০+১০০+১০০) অর্থাৎ ১২০০ দৈব সম্বৎসর। আমাদের হিসাবে (১২০০×৩৬০) অর্থাৎ ৪ লক্ষ ৩২ হাজার বৎসর। দ্বাপর যুগ ইহার দ্বিগুণ, ত্রেতা

তিনগুণ, সত্য চারিগুণ। এই চারিযুগে এক মহাযুগ হয়। এক হাজার মহাযুগে এককল্প, এই কল্প ব্রহ্মার একদিন। ব্রহ্মার একদিনে চতুর্দ্দশ মনু রাজত্ব করেন অতএব এক এক মনু কিঞ্চিদধিক একসপ্ততি চতুর্যুগ (৭১ $\frac{৬}{৭}$) কাল ভোগ করেন। এক এক কল্প, সৃষ্টির প্রকট অবস্থা, তাহার পর ব্রহ্মার রাত্রি, সে সময়ে দৈনন্দিন প্রলয়; ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ, এই ত্রিলোক সে সময়ে নাশ প্রাপ্ত হয়। এই প্রকারে ব্রহ্মার দিন রাত্রি চলিতেছে, মাস, বৎসরও চলিতেছে। এই প্রকারের একশত বৎসর ব্রহ্মার পরমায়ু। এই একশত বৎসর দুইভাগে বিভক্ত, পূর্ব্বপরার্দ্ধ আর দ্বিতীয় বা অপর পরার্দ্ধ। সম্প্রতি ব্রহ্মার পরমায়ুর প্রথম পরার্দ্ধ হইয়া গিয়াছে অর্থাৎ ৫০ বৎসর তাঁহার পরমায়ুর শেষ হইয়া গিয়াছে। এখন দ্বিতীয় পরার্দ্ধের প্রথম দিন চলিতেছে। ইহার নাম শ্বেতবরাহ কল্প। কল্প বলিতে ব্রহ্মার একদিন বুঝায়, সুতরাং মাসের ত্রিশদিনে ত্রিশ কল্প। আমরা পুরাণে ত্রিশ কল্পেরই নাম পাই। ১। শ্বেতবরাহ। ২। নীললোহিত। ৩। বামদেব। ৪। গাথান্তর। ৫। রৌরব। ৬। প্রাণ। ৭। বৃহৎ। ৮। কন্দর্প। ৯। সদ্য। ১০। ঈশান। ১১। ধ্যান। ১২। সারস্বত। ১৩। উদান। ১৪। গরুড়। ১৫। কৌর্ম্ম। এই পঞ্চদশ কল্পে ব্রহ্মার শুক্লপক্ষ। ১৬। নারসিংহ। ১৭। সমাধি। ১৮। আগ্নেয়। ১৯। বিষ্ণুজ। ২০। বংশ। ২১। সোমবংশ। ২২। ভাবন। ২৩। বৈকুণ্ঠ। ২৪। আর্চ্চিষ। ২৫। বল্লীকল্প। ২৬। রথান্তর। ২৭। বৈরাজ। ২৮। গৌরী। ২৯। মহেশ্বর। ৩০। পিতৃকল্প। এই পঞ্চদশে কৃষ্ণপক্ষ।

কল্প।

প্রত্যেক কল্প চতুর্দ্দশ মনু ভোগ করেন। চতুর্দ্দশ মনুর নাম·

১। স্বায়ম্ভুব, ২। স্বারোচিষ, ৩। উত্তম, ৪। তামস, ৫। রৈবত, ৬। চাক্ষুষ, ৭। বৈবস্বত, ৮। সাবর্ণীয়, ৯। দক্ষ-

মন্বন্তর।

সাবর্ণীয়, ১০। ব্রহ্ম-সাবর্ণীয়, ১১। ধর্ম্ম-সাবর্ণীয়, ১২। রুদ্র-সাবর্ণীয়, ১৩। দেব সাবর্ণীয়, ১৪। ইন্দ্র-সাবর্ণীয়।

কল্পের অবসানে অর্থাৎ ব্রহ্মার একটি দিন অবসান হইলে শ্রীভগবানের শক্তিরূপ যে সঙ্কর্ষণ দেব, তাঁহার মুখ হইতে অগ্নি নির্গত হয় এবং ভূঃ, ভুবঃ ও স্বঃ এই ত্রিলোক দগ্ধ হইয়া যায়। আমাদের সহিত এই ত্রিলোকেরই সম্পর্ক। আমরা ভূর্ভুবঃ স্বঃ এই ত্রিলোকেই বিচরণ করি। সুতরাং এই ত্রিলোকের উদ্ভব, স্থিতি ও লয় আমাদের প্রথম আলোচ্য বিষয়। এই ত্রিলোককে আয়ত্ত করিতে পারিলে, অর্থাৎ এই ত্রিলোকের অভিজ্ঞতা-দ্বারা আমি যে অস্ফুট বা বীজরূপী সচ্চিদানন্দ, আমার যেটুকু বিকাশ হওয়া আবশ্যক সেই বিকাশ হইয়া গেলে, এই ত্রিলোকের নাশে আমি বিনষ্ট হইব না। ভৃগু প্রভৃতি মহর্ষিগণ দৈনন্দিন প্রলয়ের সময় মহর্লোক হইতে জনলোকে গমন করেন।

ত্রিলোক জয়ের উপায়।

এই ত্রিলোককে জানিয়া সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত করিতে হইবে। আমার পরমার্থ সাধনের জন্য ইহা আবশ্যক। দুই প্রকারে ইহা হইতে পারে। মন্বন্তরের পর মন্বন্তর চলিতেছে। সৃষ্টি-প্রবাহ চক্রাকার পথে ঘুরিতেছে। প্রথমে অবতরণ,—স্থূলতম ভূলোক পর্যান্ত তাহার আগমন এবং জড়, উদ্ভিদ, মানব, দেবতা, ঋষি প্রভৃতি সৃষ্টি (The descent of spirit till it reaches manifestation in the physical plane, the genesis of the various kingdoms of vegetables, animals, men, gods, Rishis.) তাহার পর আরোহণ, আবার স্থূল হইতে সূক্ষ্মে ও সূক্ষ্মতমে প্রত্যাবর্ত্তন। আমি যে দিন মানুষ হইয়াছি, সেই দিন নিজকে চিনিয়াছি ও পাইয়াছি। কারণ ধাতু প্রস্তরাদি কেবলমাত্র আছে, উদ্ভিদ আছে ও অনুভব করে, পশু আছে, অনুভব করে ও জানে; মানুষ আছে, অনুভব করে, জানে এবং জানে যে সে আছে, অনুভব করে ও

জানে। এই যে চতুর্থ লক্ষণ ইহাই মানবের মানবত্ব, ইহাই তাহার গৌরব। ইহারই নাম আত্মজ্ঞান Self-consciousness ইহাই তুরীয় চৈতন্য। ইহাকে আশ্রয় করিয়া অবিকশিত বীজরূপে বিশ্বজ্ঞান ও ব্রহ্মজ্ঞান রহিয়াছে। শ্রীভগবানের স্বরূপের প্রতিবিম্বপাত এই স্থানেই হইয়াছে। আমরা কত সুদূর অতীতের কথা আলোচনা করিব, আজ সপ্তম বা বৈবস্বত মন্বন্তরের কথা অষ্টাবিংশতি কলিযুগের অতি ক্ষুদ্র দরিদ্র ও রুগ্ন একটি মানুষ প্রতিদিন অনশন-সম্ভাবনায় ভীত, সে স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরের কথা আলোচনা করিবে। সে কত দিনের কথা। সে যে একশত পঁচাশি কোটি বৎসরেরও অধিক। কি প্রকারে আমি এই আলোচনায় সাহসী হইয়াছি। পুরাতন গ্রন্থে এ সম্বন্ধে যাহা লেখা আছে, না বুঝিয়া কেবলমাত্র তাহার পুনরাবৃত্তি করিবার জন্যই কি এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছি? যদি কেহ এরূপ মনে করেন তাহা হইলে এই দরিদ্রের প্রতি তাঁহার অবিচার করা হইবে। তাহা হইলে, প্রকৃত কথা কি? প্রকৃত কথা এই যে আমাকে ক্ষুদ্র, দরিদ্র ও রুগ্ন দেখিতেছেন, ইহা আমার নিত্য ভাব নহে, ইহা আমার উপাধির ধর্ম্ম। আমার দুঃখ এই যে আমি আমার উপাধির ধর্ম্মকে আমার ধর্ম্ম (property, attribute) এমন কি আমার স্বরূপ (essence) বলিয়া মনে করি। ধর্ম্ম সাধনা করি কেন? এই দুঃখ হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য। প্রকৃত প্রস্তাবে সমগ্র অতীত ও সমগ্র ভবিষ্যৎ আমার ভিতরে রহিয়াছে, আমি তাহা ফুটাইয়া তুলিতে পারিতেছি না। তাহা হইলে স্বায়ম্ভুব মনু যখন আসিয়াছিলেন, তখন আমিও তো ছিলাম, সেই স্বায়ম্ভুব মনু আজও রহিয়াছেন আমার ভিতরে রহিয়াছেন, পৌরাণিক আমাকে সঙ্কেত মাত্র (Suggestion) দিবেন। সেই সঙ্কেত শ্রবণ করিয়া আমাকে ধ্যান ধারণার পথ আশ্রয় করিতে হইবে। তাহা হইলে ক্রমে ক্রমে সেই সব

পুরাতন কথা, যাহা আমি ভুলিয়া গিয়াছি, তাহা আমার মনে পড়িয়া যাইবে। কেবল অতীত নহে, বিশাল ভবিষ্যৎও দেখিতে পাইব। মহাকালের সহিত সাক্ষাৎ হইবে, সেই মহাকালের বুকে ত্রিগুণময়ী প্রকৃতির অসীম বৈচিত্র্যময়ী খেলা বুঝিতে পারিব, তখন প্রকৃতি-পুরুষ বিবেকজ্ঞান হইতে কৈবল্য বলুন, মোক্ষ বলুন, পরাভক্তি বলুন তাহা আমি উপভোগ করিব। পুরাণের মন্বন্তর-কথার ইহাই প্রয়োজন।

কর্ম্মের বা ধর্ম্ম সাধনের প্রয়োজন।

পূর্ব্বে বলা হইল সৃষ্টিপ্রবাহ চক্রাকার পথে যুগ মহাযুগ ও মন্বন্তরের মধ্য দিয়া কত দ্বীপে, কত গ্রহে লীলাতরঙ্গে নাচিয়া নাচিয়া ভ্রাম্যমান। একবার সূক্ষ্ম হইতে স্থূলে অবতারণ করিয়াছে আবার স্থূল হইতে সূক্ষ্মে আরোহণ করিবে। মানব-সৃষ্টিতে আসিয়া এই আরোহণ-পদ্ধতি বেশ সুস্পষ্ট আকার ধারণ করে। এখন আমার সম্মুখে প্রশ্ন এই, আমি নিশ্চেষ্টভাবে স্রোতে ভাসিয়া সকলের সাথে চলিব, এবং যখন হয় তখন গন্তব্য স্থানে পৌঁছিব, অথবা চেষ্টা করিয়া সাধনা করিয়া এই গতি বাড়াইবার চেষ্টা করিব, নৌকা স্রোতে ছাড়িয়া দিয়া নিদ্রার আয়োজন করিব, অথবা অনুকূল পবন পাইলে পাইল তুলিয়া দাঁড় বাহিয়া গুণ টানিয়া, অবশ্য স্রোতেরও সাহায্য লইয়া অগ্রসর হইব? ইহাই এখন প্রশ্ন। আমি নিশ্চেষ্ট থাকিতে পারি না, অতএব এই অগ্রসর হওয়া যাহাতে শীঘ্র শীঘ্র হয় বিধিপূর্ব্বক আমি তাহাই করিব? ইহারই নাম কর্ম্ম, ইহারই নাম ধর্ম্ম-সাধনা। পুরাণ-শ্রবণ এই জন্য। আমার জানা কথা, দেখা জিনিস, আর আমার ভিতর লুকাইয়া আছে যাহা কিছু, সব আমি ভুলিয়া বসিয়া আছি, তাই আমার দুঃখ কষ্ট, পদে পদে পরাজয়। পৌরাণিক আমায় এই সব কথা শুনাইবেন। শুনিব বাহিরে কিন্তু বুঝিব ভিতরে, তাহা হইলেই আমার এই অজ্ঞানতার কারাদুর্গের প্রাচীর ভূমিসাৎ হইবে।

বিশ্বের ক্রমবিকাশ।

সৃষ্টিতত্ত্ব ও মন্বন্তর কথা আলোচনার প্রারম্ভে আমাদিগকে চিন্তা করিয়া দেখিতে হইবে সৃষ্টি এখন যে অবস্থায় রহিয়াছে ইহা চিরদিন সে অবস্থায় ছিল না। সর্ব্বদাই পরিবর্ত্তন হইতেছে, বহু বহু পরিবর্ত্তনের মধ্য দিয়া সপ্তম মনুর শাসনকালে ইহা বর্ত্তমান অবস্থায় আসিয়াছে; এখনও প্রতিনিয়ত পরিবর্ত্তন চলিতেছে; এই পরিবর্ত্তনের সোপানগুলির সাহায্যে আমাদিগকে বিশ্বতত্ত্ব ও আত্মতত্ত্ব আলোচনা করিতে হইবে।

সৃষ্টির প্রথম অংশের নাম সর্গ বা তত্ত্ব সৃষ্টি, তাহার পর বিসর্গ বা ব্রহ্মা হইতে চরাচর সৃষ্টি। বিসর্গের প্রথমাংশ মানস-সৃষ্টি তাহার পর স্বায়ম্ভুব মনুর আবির্ভাব। স্বায়ম্ভুব মনুর সময় হইতেই মিথুন-সৃষ্টি আরম্ভ হইল।

প্রথমে সূক্ষ্ম হইতে স্থূল বা অবরোহণ।

বিশ্বের অবস্থা যে নানারূপ পরিবর্ত্তনের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইয়াছে, আমরা তাহা মার্কণ্ডেয় পুরাণের মন্বন্তর ও যুগ বর্ণনার মধ্যেই সুস্পষ্টরূপে দেখিতে পাই। বর্ত্তমান সামাজিক জীবনও যে ক্রমশঃ গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহাও সেই বর্ণনায় দেখিতে পাওয়া যায়। পুরাণের মন্বন্তর বর্ণনা পড়িলে মনে হয় যে বর্ত্তমান মন্বন্তরের প্রারম্ভে মানুষের দেহ এখনকার ন্যায় কঠিন উপাদানে গঠিত হয় নাই, দেহ তখন অতিশয় সূক্ষ্ম উপাদানে গঠিত ছিল (was ethereal) প্রারম্ভে লিঙ্গভেদ ছিল না (was sexless)। তাহার পর দেহ ক্রমশঃ অপেক্ষাকৃত ঘন বা দৃঢ় হইল, মানব তখন উভয়লিঙ্গ (Bi sexual), তাহার পর আরও ঘন হইলে লিঙ্গভেদ হইল। ভবিষ্যতে এই মানব ক্রমে ক্রমে আবার পূর্ব্বাবস্থা প্রাপ্ত হইবে, আবার উভয়লিঙ্গ ও পরে লিঙ্গভেদহীন হইবে।

মার্কণ্ডেয় পুরাণে এই সমুদয় অবস্থার নিম্নরূপ বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়।

> ন মূলা ফলপুষ্পাণি নার্ত্তবা বৎসরাণি চ।
> সর্ব্বকালসুখঃ কালো নাত্যর্থং ঘর্ম্মশীততা॥
> কালেন গচ্ছতা তেষাং পত্রা সিদ্ধিবজায়ত।
> ততশ্চ তেষাং পূর্ব্বাহ্ণে চ বিতৃপ্ততা॥
> পুনস্তথেচ্ছতাং তৃপ্তিরনায়াসেন সাহভবৎ।
> ইচ্ছতাঞ্চ তথায়াসো মনসঃ সমজায়ত।
> অপাং সৌক্ষ্ম্যাৎ ততস্তাসাং সিদ্ধির্নাম্না রসোল্লসা।
> সমজায়ত চৈবান্যা সর্ব্বকামপ্রদায়িনী।
> অসংস্কার্য্যৈঃ শরীরৈশ্চ প্রজাস্তাঃ স্থিরযৌবনাঃ।
> তাসাং বিনা তু সঙ্কল্পং জায়ন্তে মিথুনাঃ প্রজাঃ।
> সমং জন্ম চ রূপঞ্চ ম্রিয়ন্তে চৈব তাঃ সমম্॥
> অনিচ্ছাদ্বেষসংযুক্তা বর্ত্তন্তে তু পরস্পরম্।
> তুল্যরূপায়ুষঃ সর্ব্বা অধমোত্তমতাং বিনা।
> চত্বারি তু সহস্রাণি বর্ষাণাং মানুষাণি তু।
> আয়ুঃপ্রমাণং জীবন্তি ন চ ক্লেশাদ্বিপত্তয়ঃ॥

তখন মূল, ফল, ফুল, ঋতু, বৎসর প্রভৃতি কিছুই ছিল না। সকল সময়েই সুখের সময় ছিল, বেশী গরম বা বেশী শীত ছিল না। কিছুদিন পরে তাহাদের নানারূপ আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য সিদ্ধি লাভ হইল। পূর্ব্বাহ্ণে বা মধ্যাহ্নে তাহাদের তৃপ্তি না হইলে, ইচ্ছামাত্রেই তাহাদের অনায়াসে তৃপ্তি ও মনের সুখ উপস্থিত হইত। জল খুব সূক্ষ্ম ছিল, রসোল্লাসবতী সিদ্ধি উপস্থিত হইয়া তাহাদের যাবতীয় অভিলাষ পূর্ণ করিত। দেহের সৌন্দর্য্য-বিধানের জন্য তাহাদের কোনরূপ সংস্কার করিতে হইত না তাহারা স্থিরযৌবন ছিল। সঙ্কল্প ব্যতিরেকে তাহাদের মিথুনপ্রজা উৎপন্ন হইত। এই মিথুন একসঙ্গে জন্মাইত, দেখিতে ঠিক একরূপ হইত এবং একসঙ্গে মরিয়া যাইত।

তাহাদের পরস্পরের প্রতি অভিলাষ বা দ্বেষ ছিল না, সকলেই সমানভাবে দিনযাপন করিত। কেহ উত্তম বা অধম ছিল না, সকলেরই আয়ু ও রূপ সমান ছিল। ইহাদের মনুষ্য-পরিমাণ চারি হাজার বৎসর পরমায়ু ছিল এবং অক্লেশে প্রাণত্যাগ করিত।”

বর্ত্তমান সময়ে মানবজাতির সম্বন্ধে অনেকেই আলোচনা করিতেছেন, এবং ইহা আলোচনা করারও বিশেষ প্রয়োজন আছে। এই আলোচনায় কেবল স্থূল ব্যাপারের (Mere Material Conditions) আলোচনা করিলেই হইবে না। স্থূল ব্যাপারের আলোচনা করিতে হইবে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মানবের প্রাণশক্তি, ইচ্ছাশক্তি প্রভৃতিরও আলোচনা করা দরকার। ভবিষ্যৎ নির্দ্ধারণ করিতে হইলে অতীত সম্বন্ধে সুস্পষ্ট জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। সুতরাং পুরাণে এই অতীত সম্বন্ধে যাহা বলা হইয়াছে, তাহার আলোচনা করিলে আমরা লাভবান্ হইব। ইহাই প্রাচীন ভারতের জ্ঞান, পুরাণ সমূহের মধ্য দিয়া আংশিকরূপে আমাদের নিকট আসিয়াছে, আমরা প্রকৃত অধিকারী হইয়া অন্বেষণ করিলে ইহার অন্যান্য অংশও অর্জ্জন করিতে পারিব।

পূর্ব্বে মার্কণ্ডেয় পুরাণ হইতে যে অংশ উদ্ধৃত করিলাম, তাহা হইতে আমরা কি পাই? প্রথমতঃ দেখিতে পাই যে, এখন যে বৈচিত্র্য রহিয়াছে, তখন তাহা ছিল না; দ্বিতীয়তঃ বাহিরের বা চারিদিকের জড় প্রতিবেশ (Material environment) এখন যেরূপ দৃঢ় ও প্রবল হইয়াছে, তখন তাহা ছিল না। মানবের ইচ্ছাশক্তি (will) খুব সহজে কাজ করিতে পারিত, কাজেই জীবন সংগ্রাম (struggle for existence) এত তীব্র ছিল না। ফলমূল ছিল না, সুতরাং মানুষের দেহ রক্ষা কি প্রকারে হইত? ইহার উত্তরে বলিলেন—“জলের সূক্ষ্মাংশের দ্বারা রসোল্লাস সিদ্ধি হইত” অর্থাৎ দেহের

দ্বারা খুব সূক্ষ্মপদার্থ শোষণ করিয়া দেহের রক্ষা বা পুষ্টি হইত। (By absorption of subtle substances *i. e.* osmosis of what we may perhaps call ethers capable of being indirectly affected by mental effort.)

এখন আমাদের শরীর যেরূপ তখন শরীর য এরূপ ছিল না, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যাইতেছে। এখন দেহে যেমন অসংখ্য প্রকারের যন্ত্র হইয়াছে, তখন তাহাও হয় নাই। সঙ্কল্প ব্যতিরেকে মিথুনের জন্ম পিতা মাতার দেহ হইতেই হইত। (oozed out from the bodies of their parents,)

মার্কণ্ডেয় পুরাণ বলিতেছেন, তাহার পর ক্রমে ক্রমে রাগের উদয় হইল। তাহার ফলে মাসে মাসে ঋতু ও তজ্জন্য পুনঃ পুনঃ গর্ভোৎপত্তি হইতে লাগিল। তখন ফলের মধ্যে মধু পাওয়া যাইত, সেই বলকর মধুপান করিয়া প্রজাগণ প্রাণ ধারণ করিত। তাহার পর মানুষের লোভের উৎপত্তি হইল, এবং মানুষ লোভের প্রেরণায় অন্যকে বঞ্চনা করিয়া একমাত্র নিজেই ঐ সব বৃক্ষের অধিকারী হইতে চেষ্টা করিল, তাহার ফলে ঐ সব বৃক্ষও নষ্ট হইয়া গেল। অতঃপর শীত, উষ্ণ, ক্ষুধা প্রভৃতি দ্বন্দ্ব সকল উৎপন্ন হইল। ক্রমশঃ মানুষ গৃহাদি নির্ম্মাণ করিল। মার্কণ্ডেয় পুরাণের মতে এই সমুদয় হওয়ার পর ব্রহ্মা, ভৃগু প্রভৃতি নয়জন মানসপুত্র সৃষ্টি করিলেন। তাহার পর রুদ্রকে সৃষ্টি করিলেন, তাহার পর স্বয়ম্ভুব মনু।

আমরা বর্ত্তমান প্রবন্ধে সৃষ্টি-তত্ত্ব বিস্তৃতরূপে বর্ণনা না করিয়া মন্বন্তর-কথা আরম্ভ করিতেছি। সৃষ্টির একস্তরে বিশ্বস্রষ্টা ব্রহ্মার মনে হইল আমি সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছি, অথচ আমার প্রজা নিত্য বৃদ্ধিশীল হইতেছে না, ইহা বড়ই দুঃখের ও আশ্চর্য্যের বিষয়। ব্রহ্মার মনে হইল দৈবই ইহার কারণ,

তখন তিনি যেরূপ প্রজা বৃদ্ধির প্রতি দৃষ্টি রাখিয়াছিলেন সেইরূপ দৈবের প্রতিও দৃষ্টি রাখিলেন।

ঋষীণাং ভূরিবীর্য্যাণামপি সর্গমবিস্তৃতঃ।
জ্ঞাত্বা তদ্‌বৃদ্ধয়ে ভূয়শ্চিন্তয়ামাস কৌরব।
অহো অদ্ভুতমেতন্মে ব্যাপৃতস্যাপি নিত্যদা।
নহ্যেধন্তে প্রজা নূনং দৈবমত্র বিঘাতকঃ॥
এবং যুক্তকৃতস্তস্য দৈবঞ্চাবেক্ষতস্তদা।
কস্য রূপমভূদ্দ্বেধা যৎ কায়মভিচক্ষতে॥

মিথুন-সৃষ্টি।

ইহার পূর্ব্বে ব্রহ্মা মহাবীর্য্যশালী ঋষিগণকে অর্থাৎ মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু ভৃগু, বশিষ্ঠ, দক্ষ ও নারদ এই দশজনকে সৃষ্টি করিয়াছেন। কিন্তু দেখিলেন যে তাঁহাদের দ্বারাও সৃষ্টি বিস্তৃত হইতেছে না। তখন তিনি চিন্তিত হইলেন এবং সৃষ্টি কি প্রকারে বিস্তৃত হয় তাহা চিন্তা করিতে লাগিলেন। তাঁহার মনে হইল যে দৈব প্রতিকূল। এতদিন তিনি সৃষ্টির কথাই ভাবিয়াছেন, দৈবের কথা ভাবেন নাই। এখন তিনি যেমন সৃষ্টির কথা ভাবিতে লাগিলেন, তেমনি দৈবের কথাও ভাবিতে লাগিলেন। ঐরূপ ভাবিতে ভাবিতে ব্রহ্মার ঐ মূর্ত্তি আপনা হইতে অত্যাশ্চর্য্যরূপে দুইভাগে বিভক্ত হইল, এই কারণে তাঁহার মূর্ত্তিকে লোকে কায় বলে। এই দুই অংশে তিনি মিথুন অর্থাৎ স্ত্রী পুরুষ হইলেন। স্বায়ম্ভুব মনু ও তাঁহার স্ত্রী শতরূপার ইহাই উৎপত্তি কথা যাহা হউক বিষয়টি আমাদিগকে অন্তর্মুখী হইয়া আত্মতত্ত্বের সাহায্যে বুঝিয়া লইতে হইবে।

চতুর্দ্দশ মনুর শাসনাধীনে, এক সহস্র মহাযুগে এই বিশ্বে যাহা কিছু হইবে সমস্তই আদিতে ব্রহ্মার ভিতরে বীজরূপে রহিয়াছে। পাপ পুণ্য, লোভ হিংসা, আবার তপস্যা ব্রহ্মচর্য্য সমস্তই সেখানে অব্যক্তরূপে বিরাজিত। প্রলয় ও মৃত্যু, আবার

সৃষ্টি ও গঠনের যাহা কিছু শক্তি ও উপাদান সমস্তই সেখানে আছে। ব্রহ্মাকে নিজের ভিতরে অব্যক্ত অবস্থায় বিরাজিত এই বিশ্বকে ব্যক্ত করিতে হইবে, ইহাই ব্রহ্মার দৈনন্দিন সাধনা, ইহাই ব্রহ্মার প্রতিদিনের তপস্যা। দিনের কার্য্য শেষ করিয়া ব্রহ্মা নিদ্রিত হইবেন, আবার জাগিয়া উঠিয়া দৈনিক কার্য্যে লিপ্ত হইবেন। এই প্রকারে আপনাকে ব্যক্ত বা পরিস্ফুট করিয়া ব্রহ্মা নিজেকে সফল করিতেছেন। ইহাই ব্রহ্মার আত্মলাভ (Self Realisation of Brahma) মানুষের আত্মজ্ঞান লাভের বা আত্মদর্শনের একটা ক্রম আছে, সেই ক্রম যাহারা জানেন পৌরাণিক সৃষ্টিতত্ত্ব তাঁহারাই সম্পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন।

জীবনের পূর্ণতা সাধনে আমাদিগকে কত দ্বন্দ্ব ও বিপর্য্যয়ের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইতে হয়। ভিতরকে বাহিরে ব্যক্ত করিতে গিয়া কত বৈপরীত্য ও দ্বন্দ্বের মধ্যে আমাদিগকে কত ক্লেশ ও বিপত্তি সহ্য করিতে হয়। এই সমুদয় ক্লেশ ও বিপত্তির মধ্যে তপস্যার সাহায্যে আমরা সামঞ্জস্য অন্বেষণ করিতেছি। স্বায়ম্ভুব মনুর সৃষ্টি একটা সামঞ্জস্যের (Harmony) অবস্থা। ব্রহ্মার সৃষ্টির প্রথমেই পঞ্চপর্ব্বা অবিদ্যার সৃষ্টি।

শ্রীমদ্ভাগবত বলিতেছেন—

সসর্জ্জাগ্রেঽন্ধতামিস্রমথতামিস্রমাদিকৃৎ।
মহামোহঞ্চ মোহঞ্চ তমশ্চাজ্ঞানবৃত্তয়ঃ॥

প্রারম্ভে তমঃ, মোহ, মহামোহ, তামিস্র, অন্ধতামিস্র—এই অজ্ঞান বৃত্তি সকল সৃষ্টি করিলেন। শ্রীধর স্বামী ইহাদের নিম্নরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন! "তমো নাম স্বরূপাপ্রকাশঃ মোহো দেহাদ্যহং বুদ্ধিঃ মহামোহো ভোগেচ্ছা। তামিস্রঃ তৎপ্রতিঘাতে ক্রোধঃ। অন্ধতামিস্রঃ তন্নাশেঽহমেব মৃতোঽস্মীতি বুদ্ধিঃ।" স্বরূপের অপ্রকাশের নাম তমঃ, দেহাদিতে অহং

বুদ্ধি মোহ, ভোক্তবা বিষয়ে 'আমার' এই যে জ্ঞান, তাহার নাম মহামোহ, ভোগের ইচ্ছা বাধা প্রাপ্ত হইলে যে ক্রোধ হয়, তাহার নাম তামস্র, ভোগের বস্তু নষ্ট হইলে আমি নষ্ট হইলাম এইরূপ বুদ্ধির নাম অন্ধ-তামিস্র।

শ্রীবিষ্ণুপুরাণে আছে—

> তমোঽবিবেকো মোহঃ স্যাদন্তঃকরণবিভ্রমঃ।
> মহামোহস্তু বিজ্ঞেয়ো গ্রাম্যভোগসুখৈষণা।
> মরণং হ্যন্ধতামিস্রং তামিস্রঃ ক্রোধ উচ্যতে।
> অবিদ্যা পঞ্চপর্ব্বৈষা প্রাদুর্ভূতা মহাত্মনঃ॥

পাতঞ্জল যোগশাস্ত্রে অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশ, এই পঞ্চ ক্লেশ বলিয়া ইহাদের বর্ণনা করা হইয়াছে। প্রকৃত প্রস্তাবে অবিদ্যার এই পঞ্চপর্ব্ব, অবিদ্যারই আবরণ ও বিক্ষেপ নামক দুই ধর্ম্মের ক্রিয়ামাত্র—শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী মহোদয় তাঁহার টীকায় এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

এই সৃষ্টিকে পাপীয়সী দেখিয়া ব্রহ্মার আনন্দ হইল না। তখন তিনি সনক, সনন্দ, সনাতন ও সনৎকুমার এই চারিজন মুনির সৃষ্টি করিলেন। অবশ্য এই চতুঃসন মুনির জন্ম প্রতিকল্পে হয় না, কিন্তু এই পাদ্মকল্পে হইয়াছে। আমাদের আলোচ্য, সৃষ্টির প্রথম স্তরের ঘটনাবলী কেমন এক চরম সীমা হইতে অপর চরম সীমায় যাইতেছে, (From one extreme to another) একটা সামঞ্জস্য পাইতেছে না। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী মহোদয় তাঁহার টীকাতেও ইহা ধরিয়াছেন। প্রথম অবিদ্যা, ঠিক তাহার পরেই বিদ্যা। "অবিদ্যায়া নিবর্ত্তিকা বিদ্যৈবেতি জ্ঞাপয়িতুং বিদ্যাবৃত্তয়োঽপি তস্মাদেব সনকাদিরূপেণ আবির্বভূবুঃ" অবিদ্যার নিবর্ত্তিকা বিদ্যা, ইহাই জানাইবার জন্য বিদ্যার বৃত্তিসমূহ সনকাদিরূপে আবির্ভূত হইল।

চতুঃসন মুনিকে ব্রহ্মা সৃষ্টি করিতে বলিলেন, তাঁহাদের তাহাতে প্রবৃত্তি হইল না, ফলে ব্রহ্মার দুর্ব্বিষহ ক্রোধের উদয় হইল। ব্রহ্মা ক্রোধ প্রকাশ না করিয়া মনোমধ্যে সম্বরণ করিতে চেষ্টা করিলেন। কিন্তু ঐ ক্রোধ তাঁহার ভ্রূদ্বয়ের মধ্যস্থল হইতে বাহির হইয়া নীললোহিত কুমার আকারে প্রাদুর্ভূত হইল। ইঁনি রুদ্র, সুতরাং আবার এক চরম সীমা উপস্থিত। তাহার পর ভৃগু প্রভৃতি দশজন মহর্ষি।

স্বায়ম্ভুব মন্বন্তর।

যাহা হউক স্বায়ম্ভুব ও শতরূপার সৃষ্টির পর বিশ্বব্যবস্থা অনেকটা সামঞ্জস্যের অবস্থায় আসিল। অবশ্য আবার বৈষম্য হইবে, তাহা আমরা ক্রমশঃ দেখিতে পাইব। পৌরাণিক সৃষ্টিতত্ত্ব অন্তর্মুখী হইয়া বুঝিতে হইবে। From the abstract to the concrete. প্রথমে ভাব, তাহার পর ভব।

স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরের প্রথম ঘটনা বরাহদেব কর্ত্তৃক জলমগ্না ধরার উদ্ধার। তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে, এই স্থূল ধরিত্রীদেবী, যাহার পৃষ্ঠে আমরা নিরাপদে বাস করিতেছি, এই ধরিত্রীও তখন ছিলেন না। ধরা জলমগ্ন ছিলেন, কিন্তু এই জল আমাদের পার্থিব জল নহে, গর্ভোদক।

স্বায়ম্ভুব মনুর পূর্ব্বে ব্রহ্মা যাহা কিছু সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তাহারা কেহই ব্রহ্মার বাধ্য হয় নাই স্বায়ম্ভুব মনু ব্রহ্মার বাধ্য হইলেন ও জিজ্ঞাসা করিলেন "আমার প্রতি আপনার কি আদেশ বলুন।" ব্রহ্মা আদেশ করিলেন "তুমি তোমার এই পত্নীতে আত্মতুল্য গুণবান্ পুত্রকন্যা উৎপাদন করিয়া ধর্ম্মানুসারে পৃথিবী পালন কর এবং যজ্ঞের দ্বারা যজ্ঞপুরুষের আরাধনা কর। উত্তমরূপে প্রজাপালন করিলে তদ্দ্বারাই আমার সেবা করা হইবে, এবং ভগবান্ হৃষীকেশ তোমার উপর প্রসন্ন হইবেন। ভগবান হরি সকলের আত্মস্বরূপ, সুতরাং তাঁহার তুষ্টিই একমাত্র অন্বেষণীয়।"

ব্রহ্মার আদেশ যথাযথ পালন করিতে সম্মত হইয়া মনু ব্রহ্মাকে বলিলেন, "আপনি আমার জন্য বাসস্থান নির্দ্দেশ করিয়া দিন।"

•

ধরণীকে জলমগ্ন দেখিয়া ব্রহ্মা চিন্তাকুল হইলেন। পূর্ব্বে তিনি একবার জলরাশি পান করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহার পরেই আবার জলরাশি আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। চিন্তাকুল ব্রহ্মা ভগবানকে স্মরণ করিতে লাগিলেন। এই অবস্থায় ব্রহ্মার নাসিকা-রন্ধ্র হইতে একটী সূক্ষ্ম বরাহ নির্গত হইল, তাহার পরিমাণ অঙ্গুষ্ঠমাত্র।

বরাহ অবতার।

এই বরাহদেব অচিরে বৃহদাকার ধারণ করিলেন এবং জলমধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং অনায়াসে আপনার দন্ত দ্বারা ধরণীকে ধারণ করিয়া ক্ষণমধ্যে রসাতল হইতে উত্থিত হইলেন।

•

শ্রীমদ্ভাগবতের তৃতীয় স্কন্ধে বরাহদেবের লীলাপ্রসঙ্গে স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরেই হিরণ্যাক্ষবধের কথা বর্ণিত হইয়াছে। এবিষয়ে বৈষ্ণবাচার্য্যগণের সিদ্ধান্ত এই যে ব্রাহ্মকল্পে বরাহদেবের দুইবার আবির্ভাব হয়। প্রথম স্বয়ম্ভুব মন্বন্তরে ব্রহ্মার নাসারন্ধ্র হইতে বাহির হইয়া রসাতল হইতে পৃথিবীকে উদ্ধার করেন। আর দ্বিতীয় বার চাক্ষুষ মন্বন্তরে জল হইতে তাঁহার আবির্ভাব হয়। স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে যে সময় বরাহদেবের আবির্ভাব হয় সে সময়ে স্বায়ম্ভুব মনুর পুত্রকন্যা হয় নাই। সুতরাং তখন প্রচেতাই বা কোথায়, আর প্রচেতার পুত্র দক্ষই বা কোথায়, দিতিই বা কোথায়, আর দিতির পুত্রই বা কোথায়? সুতরাং সে সময়ে হিরণ্যাক্ষবধ কি প্রকারে হইতে পারে? সুতরাং মৈত্রেয় ঋষি বিদুরকে বরাহদেবের কথা বলিবার সময় স্বায়ম্ভুব মন্বন্তর ও চাক্ষুষ মন্বন্তর এই দুই মন্বন্তরের বরাহলীলা এক সঙ্গে বলিয়াছেন।

মন্বন্তরের অর্থ।

মনু, ইন্দ্রাদি দেবতা, সপ্তর্ষি প্রভৃতি এক মন্বন্তর-স্থায়ী। মন্বন্তরের শেষে ইন্দ্রাদির পতন হয়। মানুষ সাধনা করিয়া এই সমুদয় পদ প্রাপ্ত হইতে পারে। একজন মানুষ যদি এখন হইতে কঠোর সাধনা করিতে আরম্ভ করেন, তাহা হইলে কোন দূর ভবিষ্যৎ মন্বন্তরে তিনি ইন্দ্র, মনু বা মন্বন্তরের সপ্ত-ঋষির একজন হইতে পারেন। এই যে মনুষ্যজীবন ইহার উন্নতি-পথ অনন্ত প্রসারী। স্বারোচিষ মন্বন্তরে সুরথরাজা কঠোর তপস্যা করিয়া মহামায়াকে সন্তুষ্ট করিয়াছিলেন, এই মন্বন্তর শেষ হইলে যে মন্বন্তর হইবে তাহাতে তিনি মনু হইবেন। যুগের পর যুগ যাইতেছে, মন্বন্তরের পর মন্বন্তর যাইতেছে, কিন্তু ধর্ম্মের ব্যবস্থা মনু ও সপ্তর্ষি যথাযথ বজায় রাখিতেছেন এবং সৃষ্টির পারম্পর্য্য তাঁহাদের দ্বারা রক্ষিত হইতেছে। এই পারম্পর্য্য যাঁহারা রক্ষা করেন, পূর্ব্ব পূর্ব্ব মন্বন্তরের স্মৃতি যাঁহাদের মধ্যে আছে এবং সেই স্মৃতির সাহায্যে বিশ্ব-ব্যবস্থার সনাতন বিধির অনুবর্ত্তনে যাহারা মানবকে পরিচালনা করেন, শাস্ত্রে তাঁহাদিগকে শিষ্ট বলে।

শিষ্ট ও শিষ্টাচার।

বর্ত্তমান মন্বন্তরে সাধনার দ্বারা যাঁহারা যথেষ্ট উন্নতিলাভ করেন, তাঁহারা পরবর্ত্তী মন্বন্তরে বা ভবিষ্যৎ মন্বন্তরে এই শিষ্টগণের পদবী লাভ করিয়া প্রকৃত লোক-শিক্ষকের কার্য্য করেন। সমাজকে বা মানবজাতিকে প্রকৃত উন্নতি ও কল্যাণের পথে পরিচালনা করা বড়ই কঠিন শিষ্টগণের ন্যায় অধিকারী পুরুষ না হইয়া এই কার্য্য করিলে অন্ধ যেমন অন্ধকে লইয়া উভয়েরই সর্ব্বনাশের দিকে অগ্রসর হয়, ঠিক তাহাই ঘটিয়া থাকে।

শিষ্টেশর্দ্ধাতোশ্চ নিষ্ঠান্তাচ্ছিষ্টশব্দং প্রচক্ষতে।
মন্বন্তরেষু যে শিষ্টা ইহ তিষ্ঠন্তি ধার্ম্মিকাঃ॥
মনুঃ সপ্তর্ষয়শ্চৈব লোকসন্তানকারিণঃ।
তিষ্ঠন্তীহ চ ধর্ম্মার্থং তান শিষ্টান্ সম্প্রচক্ষতে॥

মন্বন্তরস্যাতীতস্য স্মৃত্বা তান্ মনুরব্রবীৎ।
তস্মাৎ স্মার্ত্তঃ স্মৃতো ধর্ম্মঃ শিষ্টাচারঃ স উচ্যতে॥
শিষ্টৈরাচর্য্যতে যস্মাৎ পুনশ্চৈবং যুগক্ষয়ে।
পূর্ব্বে পূর্ব্বৈর্ম্মতত্বাচ্চ শিষ্টাচারঃ স শাশ্বতঃ॥

"শিষ্" এই ধাতুর অর্থ পশ্চাতে পড়িয়া থাকা, বা অন্য সকলের হইতে পৃথক হওয়া। 'শিষ্ট' এই শব্দের দ্বারা এই অর্থই পাওয়া যায়। ধার্ম্মিক লোকেরা অর্থাৎ যাহারা ধর্ম্ম জানেন ও ধর্ম্ম আচরণ করেন, তাহারা এক মন্বন্তরের পরের মন্বন্তরেও থাকেন, তাঁহারাই মনু ও সপ্তর্ষি। তাঁহাদের এই প্রকারে থাকিবার কোনরূপ বাধ্যতা নাই, কেবলমাত্র ধর্ম্ম রক্ষা করিবার জন্য থাকেন। তাঁহাদিগকেই শিষ্ট বলে। মনু এই সপ্তর্ষিগণকে লইয়া অতীত মন্বন্তর স্মরণ করিয়া ধর্ম্ম প্রবর্ত্তন করেন। এই কারণে ধর্ম্মকে স্মার্ত্ত ও শিষ্টাচার বলে। আবার যুগক্ষয়ে শিষ্টগণ ইহা আচরণ করিয়া অপরকে শিক্ষাদান করেন বলিয়াও ইহাকে শাশ্বত শিষ্টাচার বলে।

পুরাণের এই শিক্ষা, বিশেষরূপে আলোচনা করা উচিত। প্রথম কথা মানবজাতি যে অন্ধকারে অসহায় অবস্থায় এক অনিশ্চিত ভবিষ্যতের অভিমুখে চলিয়াছে, তাহা নহে। দেহ-সর্ব্বস্ব ও ইন্দ্রিয়-সর্ব্বস্ব মানুষ তাহার সীমাবদ্ধ ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানের সাহায্যে মানুষকে ধর্ম্মভ্রষ্ট ও বিপথগামী করিতে পারে সত্য কিন্তু ইহা আসুরিক শক্তির সাময়িক প্রাদুর্ভাব মাত্র। বিশ্বনাথ শ্রীভগবান্ সৃষ্টির প্রারম্ভে ব্রহ্মাকে যন্ত্র করিয়া বেদাদি শাস্ত্র দিয়াছেন, আমরা মানুষ, সেই শাস্ত্রে ও সেই জ্ঞানে আমাদের অধিকার আছে। আমরা আঁধারের কীটাণু নহি, অদৃষ্টের ক্রীড়নক নহি। সেই অনন্ত জ্ঞানে আমাদের অধিকার আছে। কেবল যে এই শাস্ত্র ও ধর্ম্ম দিয়াই তিনি ক্ষান্ত হইয়াছেন তাহা নহে, এই ধর্ম্ম শিষ্টাচারের সাহায্যে রক্ষা করিবারও কেমন সুন্দর ব্যবস্থা রহিয়াছে।

বর্ত্তমান সময়ে সমগ্র পৃথিবী জুড়িয়া ভীষণ বিপ্লব উপস্থিত হইয়াছে। ইহলোকের ভোগসুখ লইয়া কাড়াকাড়ি করাই এই বিপ্লবের প্রধান হেতু। মানুষের কর্ম্মদোষে পৃথিবীর ব্যবস্থা অস্বাভাবিক অবস্থায় আসিয়াছে। তাহার কারণ আর কিছুই নহে, ব্রহ্মবিদ্যার সহিত মানব সমাজের যাঁহারা নেতৃস্থানীয় তাঁহাদের পরিচয় নাই, শিষ্টাচারের অনুবর্ত্তন নাই।

মনু বলিয়া গিয়াছেন,

"সেনাপত্যং চ রাজ্যং চ দণ্ডনেতৃত্বমেব চ।
সর্ব্বলোকাধিপত্যং চ বেদশাস্ত্রবিদর্হতি।"

যিনি বেদ জানেন, অর্থাৎ সকল জ্ঞানের সার ও প্রতিষ্ঠা স্বরূপ সেই শাশ্বত জ্ঞান যিনি লাভ করিয়াছেন, সেনাপতি হওয়া, রাজা হওয়া, বিচারক হওয়া কেবল তাঁহাদিগকেই শোভা পায়। কারণ ভোগ-সর্ব্বস্ব স্বার্থপর ক্ষুদ্র ও অবিবেকী মানুষের হস্তে এই সব গুরুভার ও প্রবল শক্তি ন্যস্ত হইলে তাহার অপব্যবহার হইবে এবং জগতের অকল্যাণ হইবে। বর্ত্তমান সময়ে যে পৃথিবী-ব্যাপী বিপ্লব তাহার ইহাই হেতু।

যাহা হউক নৈরাশ্যের কোন কারণ নাই, সত্যের জয় অবশ্যম্ভাবী। মহাপ্রলয়ের ঘন কৃষ্ণমেঘে আকাশ সমাচ্ছন্ন, ভীষণ অশনি-গর্জ্জন, গভীর অন্ধকার। মহাসাগরের বুকে প্রলয়ের উত্তাল তরঙ্গমালা জাগিয়া উঠিয়াছে, কিন্তু যাঁহারা শিষ্ট, যাঁহারা কঠোর তপস্যার পর স্বেচ্ছায় এই মানবজাতিকে প্রকৃত শিক্ষাদান করিবার ও সনাতন ধর্ম্ম রক্ষা করিবার ভার লইয়াছেন, তাঁহারা নিদ্রিত নহেন, তাঁহারা একদিকে মানবের কর্ম্মক্ষয়ের অপেক্ষা করিতেছেন ও অপরদিকে উপযুক্ত পাত্রের সাহায্যে তাঁহাদের শিক্ষা ও সদাচার জগতে প্রচার করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছেন।

বৈবস্বত মনু তাঁহার সুমহৎ সঙ্কল্প লইয়া এই বিপ্লবের মধ্যেই নূতন জগৎ নির্ম্মাণ করিতেছেন। তাঁহার সঙ্কল্প চির-বিজয়ী। কে তাঁহার গতিরোধ করে? সেই সঙ্কল্পই জয়যুক্ত হইবে। সেই সঙ্কল্প বুঝিয়া তাহার সাধনে যিনি নিজের দেহ মন প্রাণ সমর্পণ করিবেন, তিনিই ধন্য হইবেন। আর অজ্ঞানতা বশে বা রিপুর উত্তেজনায় যিনি অন্য পথে যাইবেন, তিনি আত্ম-ঘাতী হইবেন। আমরা আমাদের মনুকে অতীত মন্বন্তর সমূহের সাহায্যে জানিবার জন্যই এই আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছি।

প্রথম মন্বন্তরের নাম স্বায়ম্ভুব মন্বন্তর। এই মন্বন্তরে স্বায়-ম্ভুব মনু, তুষিত নামক দেবতা, মরীচি প্রভৃতি সপ্তর্ষি, ভগবান হরির যজ্ঞ নামে অংশাবতার, ইন্দ্র নামে দেবরাজ, প্রিয়ব্রত ও উত্তানপাদ এই দুইজন মনুপুত্র পৃথিবী-পালক আদি নৃপতি, তাঁহাদের বংশধরগণ এই মন্বন্তর প্রতিপালন করেন।

মনু

মন্বন্তরের বিষয় আলোচনার পূর্ব্বে 'মনু' কি তাহা 'তত্ত্বতঃ' অর্থাৎ তত্ত্বের সাহায্যে বুঝিয়া লওয়া প্রয়োজন। আমরা মানব, মনুর অপত্য বা বংশধর বলিয়াই আমরা এই নাম পাইয়াছি। প্রস্তর, বৃক্ষ এবং পশু হইতে আমরা পৃথক ও উচ্চ, কারণ আমাদের মননক্রিয়া আছে। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে মানবই সর্ব্বপ্রথম এই আত্মজ্ঞানের অধিকার পাইয়াছে। বিশ্বব্যবস্থার ক্রমোন্নতি সাধিত হইতে হইতে আত্মজ্ঞানের (Self Consciousness) অধিকারী মানবের যেমন আবির্ভাব হইল বিশ্বব্যবস্থাও তেমনি এক নূতন স্তরে উপস্থিত হইল। মানব পরমাত্মাকে জানিতে পারে। মানব মননশীল আর এই মননশীলতার যিনি প্রতিষ্ঠা ও সমষ্টি তিনিই মনু। সমগ্র মন্বন্তর ধরিয়া যাবতীয় নরনারী যাহা কিছু মনন করিবে তৎসমুদয় মনুতে রহিয়াছে। আমরা আজ চারিদিকের সমস্যায় আলোড়িত হইয়া ধ্যানযোগে ও নির্ম্মল হৃদয়ে মনন-ক্রিয়ার দ্বারা যে সমুদয় সত্যোপেত মীমাংসা করিতেছি, তাহা আমাদের যিনি মনু

অর্থাৎ বৈবস্বত মনু তাঁহারই চিন্তা. আমাদের মধ্য দিয়া প্রকটিত হইতেছে। যেমন একই সমুদ্র অসংখ্য তরঙ্গের মধ্য দিয়া পরিব্যক্ত হয়, সেই প্রকারে আমরা সকলেই সেই আদি পিতা যে মনু তাঁহারই চিন্তায় সত্যচিন্তা করিতে পারিতেছি। আমাদের মধ্যেও যক্ষ আছে, রক্ষ আছে, নিশাচর আছে, পশু আছে, অনেক সময়ে তাহারাই লম্ফ ঝম্ফ করে, সে সময়ে মনুর মনন আমার মনে প্রতিবিম্বিত হয় না, কিন্তু বিশ্বসমস্যার মীমাংসার জন্য আমি যে সময়ে শান্ত, পবিত্র ও সমাহিতমনা, অবিদ্যার আবরণ শক্তি ও বিক্ষেপ শক্তি যে সময়ে অপগত, তখন সেই সত্য-সঙ্কল্প আদি পিতা মনুর মনন আমার মধ্য দিয়া ক্রিয়া করে। মনু বলিতে The All-Thinker বলা যাইতে পারে।

মনু সংহিতায় আছে—

"ধ্যানিকং সর্ব্বমেবৈতৎ যদেতদভিশব্দিতম্।
ন হ্যনধ্যাত্মবিৎ কশ্চিৎ ক্রিয়াফল মুপাশ্নুতে॥"

"এতৎ" বলিতে যাহা কিছু বুঝায় অর্থাৎ যাহা কিছু আমাদের জ্ঞানের বিষয়ীভূত, তাহা সমস্তই ধ্যানিক, অর্থাৎ ধ্যানমূলক; যিনি অধ্যাত্মবিৎ নহেন, তিনি কোন কার্য্যই প্রকৃত প্রস্তাবে সফল করিতে পারেন না।

মানব এই ধ্যানিক ও অধ্যাত্ম জ্ঞানের অধিকারী · অতীত ও অনাগতের সহিত সম্বন্ধ রাখিয়া আত্মার আলোকে বর্ত্তমানকে আয়ত্ত করা, আত্ম ও অনাত্ম এতদুভয়ের মধ্যে পার্থক্য উপলব্ধি করা এবং বিশ্বব্যবস্থার মর্ম্মকথা হৃদয়ঙ্গম করা ইহা মানবের পক্ষেই সম্ভব, কারণ মানব মনুর অপত্য। মনু ইহা করিয়া গিয়াছেন, ইহা আমাদের পিতৃধন, সাবালক ও সক্ষম হইলেই আমরা ইহার অধিকারী হইব। মানবে আসিয়া

বিশ্বব্যবস্থার প্রবাহ এক নবমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে। মানবই সসীমের সহিত অসীমের যোগসূত্র।

এই অধ্যাত্মবিদ্যা বা আত্মবিদ্যাই 'মনু'তে পূর্ণাঙ্গরূপে বিদ্যমান এবং এই বিদ্যা আশ্রয় করিয়া অন্যান্য বিদ্যা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, এবং বর্ণাশ্রম ব্যবস্থার উপর প্রতিষ্ঠিত আদর্শ সমাজও এই অধ্যাত্ম বিদ্যার উপরেই গড়িয়া উঠিয়াছে। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন বিদ্যা সমূহের মধ্যে আমি আধ্যাত্মবিদ্যা। "অধ্যাত্মবিদ্যা বিদ্যানাং" ইহাই রাজগুহ্য রাজবিদ্যা। গীতায় অন্যত্র শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন এই বিদ্যা মনুর নিকট হইতে রাজর্ষিগণ পরম্পরাক্রমে পাইয়াছিলেন। মনুসংহিতার শ্লোকের দ্বারা এই প্রবন্ধে আমরাও বলিয়াছি যে যাঁহারা সমাজের নেতৃ-স্থানীয় তাঁহারা যদ্যপি এই বিদ্যা ভুলিয়া যান, তাহা হইলে মানব সমাজে দুঃখ দুর্দ্দশা প্রভৃতি ঘটিয়া থাকে, বর্ত্তমান সময়েও পৃথিবীতে ঠিক তাহাই হইয়াছে, এই বিদ্যার পুনঃ প্রতিষ্ঠাই জগতের কল্যাণ সাধনের একমাত্র উপায় এবং সেই জন্যই আমরা পৌরাণিকী ব্রহ্মবিদ্যার অন্তর্গত মন্বন্তর-কথা আলোচনা করিতেছি।

স্বায়ম্ভুব মনু।

স্বায়ম্ভুব মনুর দুইটী পুত্র, প্রিয়ব্রত ও উত্তানপাদ। তিনটি কন্যা দেবহূতি, আকূতি ও প্রসূতি প্রজাপতি কর্দ্দম, মহর্ষি রুচি ও ব্রহ্মপুত্র দক্ষ যথাক্রমে এই তিন কন্যাকে বিবাহ করেন। বিষ্ণুপুরাণে দেবহূতির নামোল্লেখ নাই। শ্রীমদ্ভাগবত এই দেবহূতি ও কর্দ্দম প্রজাপতির কথাই প্রথম আলোচনা করিয়াছেন।

কর্দ্দম প্রজাপতির পত্নীগ্রহণ ও গার্হস্থ্যধর্ম্ম প্রতিপালন আলোচনার বিষয়। মন্বন্তরের প্রারম্ভে প্রজাপতিগণ ও মহর্ষিগণ কি প্রকারে অপত্য উৎপাদনাদি করিয়াছেন তাহার আলোচনা করিলে সে সময়ের যাঁহারা লোক অর্থাৎ যাঁহারা সেই স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরের আদি পুরুষ তাঁহাদের চিত্তবৃত্তি কিরূপ

ছিল তাহা বুঝিতে পারা যাইবে। ব্রহ্মা যখন স্বায়ম্ভুব মনুকে সৃষ্টি করেন বা ব্রহ্মা যখন স্বায়ম্ভুব মনুর মূর্ত্তিধারণ করেন, সে সময়ে, যাহারা পূর্ব্বে সৃষ্ট হইয়াছিলেন তাঁহারা সকলেই ব্রহ্মার প্রশংসা করিয়া বলিয়াছিলেন।

অহো এতৎ জগৎ স্রষ্টঃ সুকৃতং বত তে কৃতং।
প্রতিষ্ঠিতা ক্রিয়া যস্মিন্ সাকমন্নমদামহে ॥

হে জগৎস্রষ্টঃ ব্রহ্মন্, আপনি অতি উত্তম কর্ম্ম করিলেন, এই যে মনু সৃষ্টি হইল, ইহাতে অগ্নিহোত্রাদি ক্রিয়া সমস্ত প্রতিষ্ঠিত হইবে এবং আমরাও সকলে একত্র হবির্ভাগাদি ভক্ষণ করিতে সমর্থ হইব।

তাহার পর ব্রহ্মা তপস্যা, উপাসনা, আসনাদি যোগ এবং বৈরাগ্য ও অণিমা লঘিমা প্রভৃতি ঐশ্বর্য্যযুক্ত সমাধির সাহায্যে ইন্দ্রিয়গণকে বশীভূত করিয়া ঋষিগণকে সৃষ্টি করিলেন। এই ঋষিগণ তাঁহার অভিমত প্রজা অর্থাৎ বেশ মনের মত হইলেন পূর্ব্বেই ব্রহ্মা অসুর, গন্ধর্ব, অপ্সরা, ভূত, পিশাচ, পিতৃগণ, কিন্নর, কিংপুরুষ ও সর্প সৃষ্টি করিয়াছেন। এই সমুদয় সৃষ্টি ব্রহ্মাকে তাঁহার ভাবময়ী তনুর দ্বারা করিতে হইয়াছিল। তাহারও পূর্ব্বে ব্রহ্মা মানস সৃষ্টির মধ্যে বেদ, বাণপ্রস্থ ধর্ম্ম প্রভৃতিও সৃষ্টি করিয়াছেন এখন এই সকল ভাব (Idea) ও উপকরণের সাহায্যে মনুর অপত্যগণ সৃষ্টির বিস্তার বিধান করিবেন।

কর্দ্দম প্রজাপতি।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে কর্দ্দম প্রজাপতি একজন মহাযোগী ছিলেন, তাঁহাকে স্ত্রীলোকের প্রেমে বদ্ধ করিয়া গৃহস্থাশ্রমে নিয়োজিত করাও যেমন কঠিন ব্যাপার আবার সেই কর্দ্দম প্রজাপতির পক্ষে দাম্পত্যধর্ম্ম পালন করাও ততোধিক কঠিন ব্যাপার। এখনকার দিনে সাধারণ মানবের পক্ষে প্রবৃত্তি মাত্রই স্বাভাবিক; কাম ভোগ ও ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তি অন্বেষণই

মানবের পক্ষে স্বাভাবিক, কচিৎ কেহ সাধনার ফলে নিবৃত্তি-মার্গের পথিক হইয়া থাকেন। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের নিকটেও আমরা শিক্ষা করি যে মানব স্বভাবতঃ দেহসর্ব্বস্ব ও ইন্দ্রিয় সর্ব্বস্ব, দেহ ও ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তিই সে অন্বেষণ করে। ক্রমশঃ সমাজের উন্নতির ফলে মানুষ সংযত ও পরার্থপর হয় এবং সামাজিক সদ্‌গুণাবলী ক্রমশঃ বিকশিত হইতে থাকে। ভারতবর্ষ মানবতত্ত্ব এরূপভাবে দেখেন নাই। প্রথমযুগে যাঁহারা মানবের সংখ্যা বিস্তার করিলেন তাঁহারা পশু-ভাবাপন্ন এবং ভোগ সর্ব্বস্ব ছিলেন না। তাঁহারা স্বভাবতঃ জিতেন্দ্রিয় ও নিবৃত্তি-মার্গের পথিক ছিলেন, শিশু মানব আত্মাকে দেহধারী করিয়া জগতে আনিয়া তাহাদের জন্য উপযুক্ত সামাজিক জীবন ও গার্হস্থ্য জীবনের ব্যবস্থা করিয়া তাহাদের ক্রমবিকাশের সাহায্যের জন্যই তাঁহারা এই মিথুন ধর্ম্ম স্বীকার করিয়াছিলেন, প্রবৃত্তির তাড়নায় নহে। মন্বন্তরের ইতিহাস আলোচনায় আমরা ইহাই সর্ব্বপ্রথমে দেখিতে পাইব। ইহারই নাম ঋষিগণের বা প্রজা-পতিগণের তপস্যা ও আত্মত্যাগ। আমাদিগের জন্য সত্যের ও কল্যাণের পথ প্রস্তুত করিতে তাঁহারা কি না করিয়াছেন? শ্রীভগবানের করুণার অমৃতধারা এই সমুদয় ঋষি ও প্রজাপতি-গণের মধ্য দিয়া চিরদিনই কত তপস্বীর কঠোর তপস্যা, কত যোগীর যোগসাধনা, কত ভক্তের ভক্তিরস আমাদিগের পশ্চাতে ও সম্মুখে, আমাদের অতীতে ও বর্ত্তমানে, ইহা যদি আমরা অনুমাত্রও হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি তাহা হইলেই আমাদের মন্বন্তর-কথার আলোচনা সফল হইবে।

ভগবান্ ব্রহ্মা কর্দ্দম প্রজাপতিকে বলিলেন, তুমি প্রজা সৃষ্টি কর। কর্দ্দম চিন্তা করিলেন কি প্রকারে প্রজা সৃষ্টি করিব? তিনি তপোধন, কাজেই তপস্যা ব্যতীত আর কিছুই তিনি জানেন না, এবং আর কিছু তাঁহার পক্ষে স্বাভাবিকও নহে। সরস্বতী নদীতীরে গমন করিয়া কর্দ্দম প্রজাপতি দশ সহস্র

বৎসর তপস্যা করিলেন। চিত্ত একাগ্র করিয়া ক্রিয়াযোগের দ্বারা (সমাধিযুক্তেন ক্রিয়াযোগেন) ভক্তগণের বরদাতা শ্রীহরির শরণাগত হইলেন। ভগবান্ প্রসন্ন হইলেন এবং সচ্চিদানন্দময় আকারে কর্দ্দম প্রজাপতিকে দেখা দিলেন।

"স তং বিরজমর্কাভং সিতপদ্মোৎপলস্রজং।
স্নিগ্ধনীলালকব্রাতবক্ত্রাব্জং বিরজাম্বরং॥
কিরীটিনং কুণ্ডলিনং শঙ্খচক্রগদাধরং।
শ্বেতোৎপল ক্রীড়নকং মনঃস্পর্শস্মিতেক্ষণং॥
বিন্যস্তচরণাম্ভোজমংশদেশে গরুত্মতঃ।
দৃষ্ট্বা খেঽবস্থিতং বক্ষঃশ্রিয়ং কৌস্তুভ-কন্ধরং॥

ভগবান্ সূর্য্যের ন্যায় আকাশে প্রকাশ পাইতেছেন, গলদেশে শ্বেতপদ্ম ও উৎপলমালা, বদনকমলে সুস্নিগ্ধ নীলবর্ণ অলকাবলী, কটিতটে নির্ম্মল অম্বর। মস্তকে কিরীট, কর্ণে কুণ্ডল, হস্ত চতুষ্টয়ে শঙ্খ চক্র গদা ও পদ্ম বিরাজমান। তাঁহার হাস্য ও দৃষ্টি সকলের চিত্তে পরমানন্দ জাগাইয়া দিতেছে। গরুড়ের স্কন্ধদেশে তাঁহার চরণ বিন্যস্ত, বক্ষঃস্থলে লক্ষ্মী ও কণ্ঠদেশে কৌস্তুভমণি।

কর্দ্দম প্রজাপতি শ্রীভগবানের শ্রীমূর্ত্তি দর্শনে হর্ষে পুলকিত হইলেন, ভূমিষ্ঠ প্রণিপাত করিয়া ভগবানের স্তব করিলেন। কর্দ্দম প্রজাপতির এই স্তব ব্যাখ্যার প্রারম্ভে শ্রীধর স্বামী তাঁহার টীকায় একটি শ্লোক দিয়াছেন। সেই শ্লোকের দ্বারা এই স্তবের মর্ম্মকথা পাওয়া যায়।

ত্বাম্‌তে পরমানন্দং ধিগন্যবরকামুকং।
অথাপি কৃপণং মানুগৃহাণ বরদানতঃ॥

হে ভগবন্, তুমিই পরমানন্দ, তোমার সেবা ব্যতীত তোমার নিকট যাহারা অন্য বর কামনা করে, তাহাদের ধিক্। কিন্তু তথাপি আমি ক্ষুদ্র, আমাকে বরদান করিয়া কৃপা কর।

ইহার তাৎপর্য্য এই, যাহারা ভগবানের স্বরূপের পরমানন্দ জানে না. তাহারা স্বভাবতঃই বিষয় সুখ অন্বেষণ করে। কিন্তু কর্দ্দম প্রজাপতি ভগবানের স্বরূপের আনন্দ জানিয়াও সম্প্রতি ব্রহ্মার আদেশে বিশ্বসৃষ্টি বিস্তৃত করিবার জন্য সাংসারিক সুখ প্রার্থনা করিলেন। কর্দ্দম প্রজাপতি পত্নী লাভের অভিলাষ প্রকাশ করিলেন। বলিলেন, এই প্রার্থনা কেবল লোকানু-গত নহে পত্নী ব্যতীত দেব, ঋষি, পিতৃগণের ঋণ পরিশোধ হয় না। তপস্যার পর লোক-সংগ্রহের আদর্শের দ্বারা অণুপ্রাণিত হইয়া ঋণত্রয় হইতে মুক্ত হইবার জন্য কর্দ্দম প্রজাপতি বিবাহ করিবেন, বিবাহের এই আদর্শ জগতে প্রতিষ্ঠিত হইল। ঋষিশক্তি আশ্রয় করিয়া বিশ্বসৃষ্টি বিস্তৃত হইবার ব্যবস্থা হইল। ভগবান্ কর্দ্দম প্রজাপতিকে তাঁহার প্রার্থনা মত বর দিলেন।

তাহার পর স্বায়ম্ভুব মনু, কন্যা দেবহুতিকে সঙ্গে লইয়া ঋষি-বর কর্দ্দমের আশ্রমে গমন করিলেন ও কন্যা সম্প্রদান করিলেন। কর্দ্দম ঋষি যোগবলে যাবতীয় ভোগ্যবস্তু অনায়াসে সংগ্রহ করিলেন। প্রজাপতি কর্দ্দম আত্মজ্ঞ ছিলেন, এ নিমিত্ত পত্নীতে তাঁহার চিত্ত আসক্ত হয় নাই। দেবহুতির ইচ্ছা ছিল অনেকগুলি পুত্র কন্যা হয়, কর্দ্দম প্রজাপতি তাহা জানিতেন। একেবারেই দেবহুতি অনেকগুলি কন্যা প্রসব করিলেন। কর্দ্দমের এইরূপ কথা ছিল যে, অপত্য উৎপাদিত হইলেই তিনি সংসারাশ্রম পরিত্যাগ করিয়া প্রব্রজ্যায় গমন করিবেন। কন্যাগুলির জন্ম হইলেই প্রজাপতি সংসারাশ্রম পরিত্যাগ করিতে উদ্যত হইলেন। তখন দেবহুতি তাঁহার শরণাপন্ন হইয়া দুইটি প্রার্থনা করিলেন। প্রথম প্রার্থনা কন্যাগুলিকে সৎপাত্রে সমর্পণ করেন, আর দ্বিতীয় প্রার্থনা আপনি যখন সন্ন্যাসাশ্রমে যাইবেন তখন এমন কাহাকেও রাখিয়া যান, যিনি আমাকে তত্ত্ব উপদেশ দিতে পারেন। দ্বিতীয় প্রার্থনার অর্থ এই যে আপনি আরও কিছুদিন থাকুন এবং একটি ব্রহ্মজ্ঞ পুত্র হউক।

প্রজাপতি কর্দ্দম সহ-ধর্ম্মিণীর অভিলাষ পূর্ণ করিলেন। কপিল-দেবের জন্ম হইল। ইনি শ্রীভগবানের অংশাবতার, কর্দ্দমকে বরদান করিবার সময়েও শ্রীভগবান্ বলিয়াছিলেন যে তিনি অংশে তাঁহার পুত্রত্ব স্বীকার করিবেন। কর্দ্দম তাঁহার কন্যাগণের নিম্নরূপ বিবাহ দিলেন। মরীচিকে কলা, অত্রিকে অনুসূয়া, অঙ্গিরাকে শ্রদ্ধা, পুলস্ত্যকে হবির্ভূ, পুলহকে গতি, ক্রতুকে ক্রিয়া, ভৃগুকে খ্যাতি, বশিষ্ঠকে অরুন্ধতী, অথর্ব্বাকে শান্তি। কন্যাগণের বিবাহের ব্যবস্থা করিয়া এবং পুত্ররূপে শ্রীভগবান্ আবির্ভূত হইয়াছেন ইহা জানিতে পারিয়া তাঁহার নিকট অনুমতি গ্রহণ পূর্ব্বক প্রজাপতি কর্দ্দম অরণ্যে গমন করিলেন। অব্যভিচারিণী ভক্তি দ্বারা তাঁহার স্বদেহে ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার হইল। কপিলদেব তাঁহার জননী দেবহূতি কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া ভক্তি, জ্ঞান, যোগ প্রভৃতি উপদেশ দিলেন; কপিলদেবের উপদেশে তাঁহার মাতা দেবহূতির জ্ঞান-লাভ ও জীবন্মুক্তি হইল। মহাযোগী কপিল মাতার অনুমতি লইয়া পিতার আশ্রম হইতে প্রথমতঃ উত্তরদিকে গমন করিয়াছিলেন; তিনি ত্রিলোকের উপশান্তির জন্য এখনও যোগাবলম্বনপূর্ব্বক সমাহিত হইয়া রহিয়াছেন, সাংখ্যাচার্য্যগণ তাহার স্তব করিয়া থাকেন।

আস্তে যোগং সমাস্থায় সাংখ্যাচার্য্যৈরভিষ্টুতঃ।
ত্রয়াণামপি লোকানামুপশান্ত্যৈ সমাহিতঃ॥

স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরের ইহাই প্রথম ঘটনা, মানবজাতির ইতিহাসের ইহাই প্রথম অধ্যায়। বর্ত্তমান সময়ে প্রতীচ্য জগতের অনেক পণ্ডিত মানবের উৎপত্তি ও ক্রমোন্নতি সম্বন্ধে যে মতবাদ প্রচার করিতেছেন, অনেকেরই হৃদয়ে তাহা বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছে। অধ্যাত্মবিদ্যার প্রবর্ত্তনের জন্য এই সমুদয় ভ্রান্ত মত সমূলে উৎপাটন করা আবশ্যক।

মানবের দেহ ইন্দ্রিয় এবং নিম্নমন বা কামমন পশুদেহের ক্রমোন্নতির দ্বারা নির্ম্মিত হইয়াছে, এই যে বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত ইহাতে আপত্তি করিবার কোনই কারণ নাই। কিন্তু মানুষ যে এই প্রকারে নীচের দিক্ হইতে উপরের দিকে ক্রমশঃ গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহা ঠিক্ নহে। এই পশুদেহ গ্রহণ করিয়া তাহার ভিতর মানব-নামধারী যে জীব, তাহাকে পরিস্ফুট করিবার নিমিত্ত স্থাপন করা ও ঐ দেহের মধ্যে তাহাকে ক্রিয়ান্বিত করার যে কার্য্য, তাহা ব্রহ্মার আদেশে প্রজাপতিগণের তপস্যার দ্বারা সুদীর্ঘকালে সাধিত হইয়াছে। অমৃতের পুত্র আমি, সচ্চিদানন্দরূপ আমি, আমি নিরালম্ব অবস্থায়, কোন্ শূন্যে, কোন্ কল্পনার রাজ্যে স্বপ্নমগ্ন ও কর্ম্মহীন অবস্থায় বসিয়াছিলাম। আমার তখন সকলই ছিল, কিন্তু নিজেকে নিজে জানার যে আনন্দ, প্রতি মুহূর্ত্তে আত্মশক্তির বিলাসের যে পরিতৃপ্তি, তাহা আমাতে ছিল না। ক্রমশঃ দেখিতেছিলাম ও বুঝিতেছিলাম, প্রলয়ের নিশি অবসান হইয়াছে, ব্রহ্মা জাগিয়াছেন, বিশ্ব আবার ধীরে ধীরে ফুটিয়া উঠিতেছে, কিন্তু এ বিশ্ব আমার নহে, আমি বিশ্বের বাহিরে রহিয়াছি। আমার গৃহ নাই, কোথায় যাইব? অতীতের সংস্কার ভিতরে ক্রিয়া করিতেছিল, কিন্তু গৃহ নাই। ক্রমশঃ দেবগণের চেষ্টায় পুর নির্ম্মিত হইল, তখনও আমি আসিতে পারি না। শেষে প্রজাপতির তপস্যা সেতুর মত এই সব পুরের সহিত আমার সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠা করিল, জনলোক হইতে মহর্লোক স্বর্লোক, ভুবর্লোক অতিক্রম করিয়া ভূলোকে মনুষ্যরূপে অবতরণ করিলাম। এখন আবার কর্ম্মক্ষেত্র পাইয়াছি, এখন নিজেকে প্রায়ই ভুলিয়া যাই, নিজের স্বরূপ মনে থাকে না, আমি যে পুরুষ, পুর নহি, আমি যে দেহী দেহ নহি, এ কথা আমার মনে থাকে না।

দক্ষ যজ্ঞ।

স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরের দ্বিতীয় ঘটনা দক্ষযজ্ঞ। পুরাণে এই দক্ষ প্রজাপতির কথা যে ভাবে বর্ণিত হইয়াছে তাহা বুঝিতে হইলে

শ্রীমদ্ভাগবতের চতুর্থ স্কন্ধে ত্রিংশৎ অধ্যায়ে যাহা বলা হইয়াছে, তাহা আলোচনা করা আবশ্যক। আমরা দেখিয়াছি স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে ব্রহ্মার মানসপুত্ররূপে দক্ষ আবির্ভূত হইলেন, স্বায়ম্ভুব মনুর কন্যা প্রসূতিকে ইনি বিবাহ করেন। মহাদেবকে অবজ্ঞা করার জন্য বীরভদ্রের হস্তে একবার, তাহার পর কালপ্রভাবে আর একবার এই দক্ষের মৃত্যু হয়। তাহার পর এই দক্ষ পূর্ব্ব-জন্মের ঐশ্বর্য্য লাভ করিবার জন্য পাঁচ মন্বন্তর পর্য্যন্ত তপস্যা করেন। তাহার ফলে ষষ্ঠ মন্বন্তরে অর্থাৎ চাক্ষুষ মন্বন্তরে তিনি পুনর্ব্বার জন্ম গ্রহণ করিলেন। এবারে তিনি প্রচেতাগণের ঔরসে বৃক্ষদিগের কন্যা মারিষার গর্ভে গর্ভবাস-জাত দুঃখভোগ করিয়া ক্ষত্রিয়বংশে জন্মগ্রহণ করিলেন।

চাক্ষুষ মন্বন্তরে পুনরাবির্ভূত দক্ষের কথা এখন আলোচনার প্রয়োজন নাই। দক্ষ যজ্ঞের সার কথা বিশেষভাবেই আলোচ্য। দক্ষ এবং শিব ইঁহারা উভয়েই এক এক চরম সীমা। দক্ষকে বলুন কর্ম্ম আর শিবকে বলুন জ্ঞান এবং কর্ম্ম ও জ্ঞানের যে বিরোধ সেই বিরোধের তত্ত্ব সাহায্যে দক্ষযজ্ঞ আলোচনা করুন, সমস্ত কথা বুঝিতে পারা যাইবে। শ্রীধর স্বামী তাঁহার টীকায় এই তত্ত্ব পুনঃ পুনঃ ঈঙ্গিত করিয়াছেন। দক্ষকে কৃপণাত্মবাদী বা দেহাত্মবাদী বলিয়াছেন দক্ষ মনে করেন, দ্রব্য কাল ও মন্ত্র যদি ঠিক হয় তাহা হইলেই যজ্ঞ ও সর্ব্বার্থসিদ্ধি হইবে। দক্ষ যেমন একান্তভাবে স্থূল ও বাহির লইয়া রহিয়াছেন, শিবও তেমনি একান্তভাবে সূক্ষ্ম বা ভাব ও ভিতর লইয়া রহিয়াছেন। শিব সতীকে বলিয়াছিলেন, আমি দক্ষকে মনে মনে সম্মান করিয়া-ছিলাম, বাহিরে সম্মান দেখাইবার প্রয়োজন কি? দক্ষযজ্ঞের ফলে এই ভিতর বাহিরের মিলন হইল। মানব সৃষ্টির অর্থ, ভাবের মূর্ত্তিগ্রহণের ব্যবস্থা। সৃষ্টির দুই প্রান্ত জড় ও চেতন, এই দুইকে মিলাইবার চেষ্টাই সৃষ্টিপ্রবাহ, মানবসৃষ্টিতে এই চেষ্টাই সম্যক্ সফলতা লাভ করিয়াছে। দক্ষযজ্ঞে আমরা এই

দ্বন্দ্বই দেখিতে পাই। অবশ্য সতীর দেহত্যাগের দ্বারা এই দ্বন্দ্বের নিষ্পত্তি হইল। সতীর শোকে যেমন মহাদেব রুষ্ট ও শোকার্ত্ত হইলেন, দক্ষও তেমনি বিগলিত হইলেন। প্রকৃত কথা এই যে দক্ষ ও শিব, এই দুইজন দুইটি বিরোধী চরম সীমা, ইঁহাদের যোগসূত্ররূপে সতী আবির্ভূতা হইয়াছিলেন।

স্বায়ম্ভুব মনুর দুই পুত্র প্রিয়ব্রত ও উত্তানপাদ। উত্তানপাদের পুত্র ধ্রুব। শ্রীমদ্ভাগবতে চতুর্থ স্কন্ধের সপ্তম অধ্যায় হইতে ধ্রুবচরিত্র বর্ণনা করা হইয়াছে। সুনীতি রাণীর পুত্র ধ্রুব বিমাতার দুর্ব্বাক্যে পাঁচবৎসর বয়সের সময় গৃহত্যাগ করেন, তিনি স্থানাভিলাষী অর্থাৎ উচ্চপদ পাইবার কামনায় বাহির হইয়াছিলেন। প্রথমে সুনীতি মাতা ও পরে দেবর্ষি নারদ তাহাকে শম অর্থাৎ ত্যাগ ও ক্ষমার ধর্ম্ম শিক্ষা দিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহাদের চেষ্টা সফল হয় নাই। রজঃগুণের ক্রিয়ার যে দৃঢ়তা, ধ্রুবের মধ্যে তাহাই দেখিতে পাওয়া যায়। ধ্রুব তপস্যা করিলেন, সফলকাম হইলেন। রাজা হইলেন, কিন্তু শেষে দেখিতে দেখিতে রজঃগুণের যাহা অকল্যাণকর প্রকাশ ধ্রুবের শেষ জীবনে তাহাই উপস্থিত হইল। ধ্রুবের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা উত্তমকে যক্ষগণ বধ করিয়াছিল, তাহার প্রতিশোধ লইবার জন্য ধ্রুব প্রচণ্ড বিক্রমে নির্দ্দয়ভাবে যক্ষ বিনাশ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। বিশ্বব্যবস্থায় দারুণ বৈষম্য বা গোলযোগ উপস্থিত হইল। তখন স্বায়ম্ভুব মনু স্বয়ং আসিয়া স্বকীয় পৌত্র ধ্রুবের নিকটে উপস্থিত হইয়া তাহাকে সদুপদেশ দিলেন এবং এই বিশ্বনাশী অসৎ কর্ম্ম হইতে তাহাকে প্রতিনিবৃত্ত করিলেন। মনু এই প্রকারে বিশ্বপালন করিতেছেন। প্রথম সময়ে প্রত্যক্ষভাবে কার্য্য করিয়াছেন, তাহার পর তাঁহার অপত্য বা বংশধরগণের উপর কার্য্যের ভারার্পণ করিয়া তিনি সমাধিস্থ হইয়া রহিয়াছেন। বিশ্বের কার্য্য চলিতে চলিতে গোলযোগ যখন খুব অধিক পরিমাণে উপস্থিত হয় অর্থাৎ বিশ্বব্যবস্থা যখন

ধ্রুব।

প্রায় অচল হইয়া পড়ে, তখন তিনি উপস্থিত হইয়া মীমাংসা করেন। মনুর এই নিত্যজাগ্রত দৃষ্টি বিশ্বের উপর সর্ব্বদাই রহিয়াছে।

পৃথু।

ধ্রুবের বংশেই পৃথুরাজার আবির্ভাব হয়। ধ্রুবের পুত্র উৎকল নিবৃত্তিমার্গাবলম্বী, তিনি বিশ্বপালনের ভার গ্রহণ করিলেন না। উৎকলের কনিষ্ঠ ভ্রমির পুত্র, বৎসর রাজা হইলেন। এই বংশেই চাক্ষুষ মনুর উৎপত্তি হয়। তিনি অবশ্য ভবিষ্যতে মনু হইয়া পালনকার্য্য করিবেন। এই মনুর পৌত্রের নাম অঙ্গ। তিনি বড় সাধু প্রকৃতি সম্পন্ন রাজা ছিলেন, কিন্তু তাঁহার পুত্র বেণ বড়ই দুঃশীল। পুত্রের দুঃশীলতা দেখিয়া অঙ্গরাজা বনগমন করেন, বেণ রাজা হইয়া নিরতিশয় অত্যাচার আরম্ভ করেন। তাহার ফলে ব্রাহ্মণগণ একত্র হইয়া এই বেণকে বিনাশ করেন এবং তাহার দেহ মন্থন করেন। বেণের উরুদেশ হইতে প্রথমে নিষাদের উৎপত্তি হয় ঐ নিষাদ জন্ম গ্রহণ করিয়াই বেণের গুরুতর পাপ গ্রহণ করিয়াছিল। তাহার পর বেণর বাহুদ্বয় মন্থন করায় পৃথু ও অর্চ্চিঃ এই উভয়ের আবির্ভাব হয়। এই পৃথুই সকল রাজার প্রথম, ইনি বিষ্ণুর অংশ আর অর্চ্চিঃ লক্ষ্মীর অংশ।

পৃথিবী দোহন।

মহারাজা পৃথুর প্রধান কার্য্য ধরিত্রী-দোহন। দুর্ভিক্ষে প্রজাগণ কাতর হইয়া মহারাজার নিকট আবেদন করিল, মহারাজা বিবেচনা করিয়া স্থির করিলেন যে পৃথিবী ওষধি সকলের বীজ গ্রাস করিয়াছে, সেই কারণে আর শস্যাদি হইতেছে না এবং প্রজাদের দুর্ভিক্ষে ক্লেশ হইতেছে। এইরূপ স্থির করিয়া তিনি পৃথিবীকে লক্ষ্য করিয়া শর-সন্ধান করিলেন ধরণী গোরূপ ধারণ করিয়া পলায়ন করিলেন, কিন্তু পৃথুর হস্তে নিজেকে রক্ষা করিতে পারিলেন না, কাজেই তাঁহার শরণাপন্ন হইলেন। মহারাজা পৃথু ধরণীকে বলিলেন, "ব্রহ্মা যে সকল ওষধি বীজ সৃষ্টি করিয়াছেন, তুমি তাহা নিজের দেহে রুদ্ধ

করিয়া রাখিয়াছ, অতএব আমি তোমার শরীর ছিন্ন ভিন্ন করিয়া তোমার মাংস দিয়া এই সমুদয় ক্ষুধাতুর প্রাণীর প্রাণরক্ষা করিব। মহারাজা পৃথুর কথা শুনিয়া ধরণী বলিলেন, "মহারাজ, পূর্ব্বে ব্রহ্মা যে সকল ওষধি সৃষ্টি করিয়াছিলেন, আমি দেখিলাম, অকৃত-ব্রত দুষ্টলোকে তাহা উপভোগ করিতেছে। লোকে চৌর হইয়া উঠিতেছে। রাজা তাহাদের শাসন করিতেছেন না, এবং যজ্ঞাদিও হইতেছে না, এই কারণে যজ্ঞের জন্য আমি ওষধি সমূহ গ্রাস করিয়া রাখিয়াছি। এরূপ না করিলে দুষ্টলোকে সমুদয় ভক্ষণ করিয়া ফেলিত, ওষধি সকলের নামও শুনিতে পাইতেন না এবং ভবিষ্যতে যজ্ঞাদি হইবার কোন সম্ভাবনাও থাকিত না। ওষধি সকল আমার উদরের মধ্যে থাকায় ক্রমে ক্রমে জীর্ণ হইয়া নষ্ট হইতেছে, আপনি যথাবিধি তাহা আকর্ষণ করুন। প্রথমে আমাকে সমান করুন, সর্ব্বত্র সমান-ভাবে দেবতাগণ জলবর্ষণ করুন; বৎস, দোহনপাত্র ও দোগ্ধা সংগ্রহ করুন।

তাহার পর প্রথমে মহারাজ পৃথু পরে অন্যান্য সকলে দোহন করিয়া পৃথিবী হইতে সার গ্রহণ করিতে লাগিলেন। শ্রীমদ্ভাগবতে পৃথিবী-দোহনের এই বিবরণ পাওয়া যায়:—

	দোগ্ধা	বৎস	পাত্র	দোহনের ফল
১।	ঋষিগণ	বৃহস্পতি	বাক্য, মন, শ্রোত্রাদি;	বেদময় পবিত্র দুগ্ধ
২।	দেবতাগণ	ইন্দ্র	হিরণ্ময় পাত্র	অমৃত, মানসিক, ঐন্দ্রিয়িক ও দৈহিক শক্তি।
৩।	দৈত্য ও দানবগণ	প্রহ্লাদ	লৌহময় পাত্র	সুরা ও আসব

	দোগ্ধা	বৎস	পাত্র	দোহনের ফল
৪।	গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরাগণ	বিশ্বাবসু	পদ্মময় পাত্র	সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্যময় মধু
৫।	শ্রাদ্ধদেব পিতৃগণ	অর্য্যমা	অপক্ক মৃণ্ময় পাত্র	(কব্য) বা পিতৃ-লোকের অন্ন
৬।	সিদ্ধগণ	কপিল		অণিমাদি সিদ্ধি
৭।	বিদ্যাধর প্রভৃতি	কপিল	আকাশ	খেচরত্বাদি বিদ্যা
৮।	কিংপুরুষাদি	ময়দানব		অন্তর্দ্ধানাদি মায়া
৯।	যক্ষ রাক্ষস, ভূত, পিশাচাদি	রুদ্র	কপাল (মাথার খুলি)	রুধির রূপ আসব
১০।	সর্প, বৃশ্চিকাদি	তক্ষক	বিলপাত্র (মুখ)	বিষময় পয়ঃ
১১।	পশুগণ	শিববাহন বৃষভ	অরণ্য পাত্র	তৃণময় ক্ষীর
১২।	মাংসভোজী জন্তুগণ	মৃগেন্দ্র	স্ব স্ব শরীর	মাংস
১৩।	পক্ষিগণ	গরুড়		কীট ও ফল
১৪।	বৃক্ষগণ	বটবৃক্ষ		রস
১৫।	পর্ব্বত সকল	হিমালয়	সানুরূপ পাত্র	বিবিধ ধাতু

শ্রীমদ্ভাগবতে পৃথিবী-দোহনের এই বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায়। বিষ্ণুপুরাণে ইহা সংক্ষেপে বর্ণিত হইয়াছে—

"ততশ্চ দেবৈর্ম্মুনিভির্দৈত্য রক্ষোভিরদ্রিভিঃ।
গন্ধর্ব্বৈরুরগৈর্যক্ষৈঃ পিতৃভিস্তরুভিস্তথা॥
তৎ তৎ পাত্রমুপাদায় তৎ তদ্ দুগ্ধং মুনে পয়ঃ।
বৎসদোগ্ধৃবিশেষাশ্চ তেষাং তদ্‌যোনয়োঽভবন্॥
সৈষা ধাত্রী বিধাত্রী চ ধারিণী পোষণী তথা।
সর্ব্বস্য জগতঃ পৃথ্বী বিষ্ণুপাদতলোদ্ভবা।

"অন্নাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে। অন্নেন জাতানি জীবন্তি অন্নং প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তি।"

অন্ন হইতেই এই সমুদয় ভূতের জন্ম, জন্মের পর অন্নের দ্বারাই তাহারা জীবন ধারণ করে, মৃত্যুর পর তাহারা এই অন্নেই প্রবেশ করে। অন্নই ব্রহ্ম।

অন্ন-ব্রহ্মের উপাসনা করিতে হইলে এই পৃথিবীকে উত্তমরূপে আয়ত্ত করিতে হইবে—The earth in its twofold aspect of matter and utility. বর্ত্তমান যুগে এই তপস্যার ফলে মানব কতকগুলি বিজ্ঞান শাস্ত্র সৃষ্টি করিয়াছে, তাহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। Geology—ভূতত্ত্ববিদ্যা অর্থাৎ নদী, পর্ব্বত, ভূমি-কম্প প্রভৃতি বিষয়ের মূলতত্ত্ব ও নিয়ম সম্বন্ধীয় বিজ্ঞান শাস্ত্র। পদার্থবিদ্যা (Physics), রসায়ন শাস্ত্র (Chemistry), ধাতুবিদ্যা (Minerology) উদ্ভিদ্‌বিদ্যা (Botany) পশুবিদ্যা (Zoology) নরদেহ-বিজ্ঞান (Anthropology) তাহার পর স্বাস্থ্য বিজ্ঞান, চিকিৎসা বিজ্ঞান প্রভৃতি, তাহার পর অন্নের বা মানবের প্রয়োজনীয় স্থূল দ্রব্য-সম্ভারের উৎপত্তি (Production), বিতরণ, (Distribution) বিনিময় (Exchange) প্রভৃতি নিয়ম, ব্যবস্থা প্রভৃতি, জনাকীর্ণ সুবৃহৎ নগরের খাদ্য জল প্রভৃতি সর-বরাহ করিবার বিধি ব্যবস্থা, ভিন্ন ভিন্ন দেশের মধ্যে বিনিময় (International commerce) দারিদ্র্য, দুর্ভিক্ষ, সামাজিক সাম্য, ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের স্বার্থ সমন্বয় (The problem of adjusting the Jarring interests of nations) ভাড়া, মজুরি, লাভ, জীবিকা, (Rent, wages, profits, livelihood) প্রভৃতিও এই অন্ন-ব্রহ্মের উপাসনার জন্য যে তপস্যা সেই তপস্যার অন্তর্গত। বর্ত্তমান পৃথিবীতে আমরা সেই তপস্যা ও পৃথিবীদোহন প্রত্যক্ষ করিতেছি। মহারাজা পৃথুর দ্বারা এই কার্য্য আরব্ধ হইয়াছে, আজও আমরা সেই তপস্যায় রহিয়াছি।

পৃথু-চরিত্রের পরবর্ত্তী কথা ইন্দ্রের সহিত পৃথুর বিরোধ। জড়বাদ আশ্রয় করাই প্রথম অবস্থায় স্বাভাবিক, এই যে প্রত্যক্ষ ও স্থূল ইহাকে আদর করিতে হইবে, ইহার সদ্ব্যবহার করিতে হইবে। কিন্তু আমাদের দৃষ্টি যেন এই প্রত্যক্ষের মধ্যে একেবারে অবরুদ্ধ হইয়া না যায়। স্থূলে থাকিয়া যেন সূক্ষ্মকে অস্বীকার না করি, জড়ে থাকিয়া যেন শক্তি বা জ্ঞানকে অস্বীকার না করি। যদি অস্বীকার করি তাহা হইলেই বিশ্ব-ব্যবস্থায় গোলোযোগ (Dea llock) উপস্থিত হইবে। তপস্যার পথে সরলভাবে চলিলে অন্ন ব্রহ্ম হইতে, প্রাণ ব্রহ্ম, মন ব্রহ্ম, বিজ্ঞান ব্রহ্ম এবং সর্ব্বশেষে আনন্দ ব্রহ্মে বা বৃন্দাবনে যাওয়া স্বাভাবিক কিন্তু পথে অনেক বিঘ্ন আছে।

পৃথিবী দোহনের পর মহারাজা পৃথু শত অশ্বমেধ যজ্ঞ আরম্ভ করিলেন ইন্দ্র যজ্ঞের পশু হরণ করেন। ইন্দ্রের সহিত পৃথু রাজার ইহাই বিরোধ। ব্রহ্মা আসিয়া বিরোধের নিষ্পত্তি করিয়া দিলেন। তাহার পর ভগবান্ বিষ্ণু পৃথুকে সুনির্ম্মল জ্ঞানোপদেশ দিলেন, মহর্ষি সনৎকুমারও তাঁহাকে উপদেশ দিলেন। এই সমুদয় আত্ম শিক্ষার দ্বারা মহারাজ পৃথুর চিত্তের একাগ্রতা জন্মিলে তিনি আত্মাতেই অবস্থিত হইয়া আপনাকে পূর্ণমনোরথ বোধ করিলেন।

স্বায়ম্ভুব মনুর এক পুত্র উত্তানপাদ, তাঁহার বংশের কথা বলা হইল। এইবার অপর পুত্রের কথা আলোচ্য। তাঁহার নাম প্রিয়ব্রত। শ্রীমদ্ভাগবতের পঞ্চম স্কন্দের প্রথম অধ্যায়ে প্রিয়ব্রতের উপাখ্যান কথিত হইয়াছে। প্রিয়ব্রত আত্মজ্ঞ ছিলেন। উত্তান-পাদ, এই কথাটির অর্থ যাহার চরণ উপরের দিকে অর্থাৎ যিনি বিপর্য্যস্ত। দুইটি জিনিস, একটি জড় আর একটি চৈতন্য। এই দুইয়ের মধ্যে নিত্য দ্বন্দ্ব। আমাদের ন্যায় বদ্ধ জীবের নিকট তাহাই সংসার আর শ্রীভগবানের তাহাই লীলা বা খেলা। উত্তানপাদ বিপর্য্যস্ত, অর্থাৎ তাঁহার প্রকৃতিতে জড়েরই আধিপত্য।

উত্তানপাদের দুই মহিষী সুরুচি এবং সুনীতি। একদিকে রুচি অর্থাৎ যাহা স্বভাবতঃ ভাল লাগে অর্থাৎ প্রেয় (The pleasant) আর একদিকে নীতি, যিনি কল্যাণে লইয়া যান (The good) রাজা যখন উত্তানপাদ, তখন সুরুচি যে তাহার প্রেয়সী হইবেন ইহা স্বাভাবিক। সুরুচির পুত্র উত্তম, আর সুনীতির পুত্র ধ্রুব।

উত্তানপাদ আত্মজ্ঞ ছিলেন না ধ্রুব বিমাতার বাক্যে আহত হইয়া বনগমন করিলে নারদের উপদেশে তিনি পরমার্থের অভিমুখী হইয়াছিলেন। প্রিয়ব্রত উত্তানপাদের ঠিক বিপরীত, তিনি প্রথম হইতেই আত্মজ্ঞ। গৃহাশ্রমে যে আসক্তি তাহা অভিনিবেশ দ্বারা হইয়া থাকে। অনাত্মাকে চিন্তা করিতে করিতে অনাত্মের সহিত যে এক হইয়া যাওয়া, তাহারই নাম অভিনিবেশ। স্বরূপের জ্ঞান অর্থাৎ আমি যে শুদ্ধ চৈতন্য-স্বরূপ, এই বোধ এ অবস্থায় একেবারে লুপ্ত হইয়া যায়। মনু প্রিয়ব্রতকে রাজ্য পালনে নিযুক্ত করেন, কিন্তু প্রিয়ব্রত প্রথমে এই ভার গ্রহণ করেন নাই। দেবর্ষি নারদের সেবা করিয়া প্রিয়ব্রত পরমার্থ জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন। প্রিয়ব্রত যদি রাজ্যভার গ্রহণ না করেন তাহা হইলে ব্রহ্মার সৃষ্টি প্রবাহ লুপ্ত হইয়া যায়, সুতরাং ব্রহ্মা আসিয়া প্রিয়ব্রতের নিকটে উপস্থিত হইলেন। প্রিয়ব্রত তখন গন্ধমাদন পর্ব্বতের গুহায় দেবর্ষি নারদের নিকট অধ্যাত্মবিদ্যা শিক্ষা করিতেছিলেন। ব্রহ্মা প্রিয়ব্রতকে যে উপদেশ দিলেন, তাহা নিষ্কাম কর্ম্ম।

প্রিয়ব্রত।

ভয়ং প্রমত্তস্য বনেষ্বপি স্যাদ্‌যতঃ স আস্তে সহ ষট্‌-সপত্নঃ।
জিতেন্দ্রিয়স্যাত্মরতের্বুধস্য গৃহাশ্রমঃ কিংনু করোত্যবদ্যং॥
যঃ ষট্ সপত্নান্ বিজিগীষমাণো গৃহেষু নির্ব্বিশ্য যতেত পূর্ব্বং।
অত্যেতি দুর্গাশ্রিত ঊর্জ্জিতারীন্ ক্ষীণেষু কামং
বিচরেদ্বিপশ্চিৎ॥

যে ব্যক্তি প্রমত্ত অর্থাৎ ইন্দ্রিয় সমূহের অধীন, সে যদি সংসার-বন্ধনের ভয়ে বন হইতে বনান্তর ভ্রমণ করিয়া বেড়ায়, তাহা হইলে তাহার বনেও বিপদ ঘটে, কারণ মন ও পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, এই যে ছয় শত্রু, ইহারা তাহার সঙ্গেই রহিয়াছে। যে ব্যক্তি জিতেন্দ্রিয় আত্মরত ও জ্ঞানী, গৃহাশ্রম তাহার কিছুই অনিষ্ট করিতে পারে না।

এই ছয়টি প্রবল শত্রুকে যে ব্যক্তি জয় করিতে চাহে, গৃহে থাকিয়াই তাহার সে জন্য চেষ্টা করা উচিত। শত্রু দুর্ব্বল হইলে তখন পথে বা অন্যত্র ভ্রমণ করা চলে। দুর্গের ভিতরে থাকিয়াই শত্রুকে জয় করা উচিত। গৃহাশ্রম দুর্গ-স্বরূপ।

ব্রহ্মার আদেশে প্রিয়ব্রত সংসারাশ্রমে প্রবেশ করিলেন। প্রিয়ব্রতের রথচক্রের অগ্রভাগের দ্বারা যে সাতটি গর্ত্ত হইয়াছিল, ঐ সপ্তখাত সাত সমুদ্রের দ্বারা সপ্তদ্বীপ নির্ম্মিত হইয়াছে। ঐ সপ্তদ্বীপের নাম জম্বু, প্লক্ষ, শাল্মলি, কুশ, ক্রৌঞ্চ, শাক ও পুষ্কর। সপ্ত সমুদ্রের নাম লবণ, ইক্ষু, সুরা, ঘৃত, দধি, দুগ্ধ ও শুদ্ধ জল।

সপ্তদ্বীপ।

এই সপ্তদ্বীপের তত্ত্ব বড়ই গূঢ়। গল্পের ন্যায় পৌরাণিক বলিয়া যাইতেছেন, স্ত্রীলোক, শূদ্র, মূর্খ ব্রাহ্মণ (দ্বিজ-বন্ধু) সকলেই নিজ নিজ কল্পনাশক্তির সাহায্যে পৌরাণিকের বর্ণনা গ্রহণ করিতেছেন কিন্তু আধ্যাত্মবিজ্ঞানের রহস্য অল্প-লোকেই বুঝিতে পারিবেন তবে জড়-বিজ্ঞানের ও দার্শনিক চিন্তা-পদ্ধতির ক্রমোন্নতির ফলে এ সকল কথা অনেকেই বুঝিতে পারিবেন। আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি, দেখিব বাহিরে কিন্তু বুঝিব ভিতরে। Read the things of the flesh with the eyes of the spirit, not the things of the spirit with the eyes of the flesh.

দেশ ও কাল সম্বন্ধীয় যে ধারণা আশ্রয় করিয়া আমরা ব্যবহারিক জগতে কার্য্য করি, ঠিক্ সে ধারণা লইয়া আমরা পুরাণের মন্বন্তর-কথা আলোচনা করিলে কিছুই বুঝিতে পারিব

না। ঋষি অন্তর্মুখী হইয়া বা সমাধিস্থ হইয়া দেশ ও কালকে যেন এক করিয়া অনেকস্থলেই কথা বলিয়াছেন। কত লক্ষ-কোটি বৎসর আসিয়াছে এবং চলিয়া গিয়াছে, কালের সাগরে প্রবেশ করিয়াছে, আবার কত লক্ষ কোটি বৎসর আসিবে। এই অনন্তকাল ভিতরে, বাহিরে অনন্ত দেশ। কাল এবং দেশ যেন একই অনন্তের দুই মূর্ত্তি। এই দুইকে অর্থাৎ অনন্তকাল ও অনন্ত দেশকে আশ্রয় করিয়া ব্রহ্মাণ্ড-লীলা চলিতেছে। কালকে জানিলেই দেশকে জানিতে ও আয়ত্ত করিতে পারা যাইবে। কিন্তু ইহার উপায় কি? অধ্যাত্মবিজ্ঞানের এই এক অতি কঠিন সমস্যা। কালের কাল মহাকাল, কাল সেই অনন্তপুরুষের বিক্রম, আবার সেই যে বিশ্বরূপ, তিনি "লোকক্ষয়কৃৎ" মহাকাল। সেই অনন্তপুরুষের মধ্যে আপনাকে ডুবাইয়া দিতে পারিলে, অথবা তাঁহার জ্ঞানের সচেতনভাবে অংশী হইতে পারিলে (To be a self-conscious sharer in His Consciousness) এই তত্ত্ব বুঝিতে পারা যায়। সেই কালাতীত অথচ কালের কর্ত্তা, অনন্তপুরুষকে জানিতে হইলে দূরে যাইতে হইবে না, আমাদের অন্তরের মধ্যেই অন্তর্য্যামীরূপে তিনি রহিয়াছেন, আমরা আমাদের বহির্মুখী চিত্তবৃত্তি নিরুদ্ধ করিয়া অন্তরে প্রবেশ করিলেই ক্রমশঃ তাঁহাকে জানিতে পারিব। সীমার মধ্যে অসীমকে ধরিবার শক্তি, কালের মধ্যে মহাকালকে জানিবার সামর্থ্য আমাদের আছে। পৌরাণিক যে এই পথে দাঁড়াইয়া পুরাণ বর্ণনা করিয়াছেন তাহার প্রমাণ শ্রীমদ্ভাগবতে বহু স্থানেই আছে।

এই সপ্তদ্বীপকে কেবল দেশের মধ্যে দেখিবেন না। দেশ ও কাল এক করিয়া চিন্তা করিলে বুঝিতে পারিবেন। মানবের দেহের ও মনোবৃত্তির পরিবর্ত্তন (Changes in the Psychophysical constitution of man) হইতেছে। কত যুগ ও কত মন্বন্তরব্যাপী কত পরিবর্ত্তনের ফলে এই অনুভূতি-সমূহ, এই শক্তি-

সমূহ গড়িয়া উঠিয়াছে। কতরূপ অবস্থার ভিতর দিয়া আমরা চলিয়া আসিয়াছি। আজ যে পৃথিবীতে আমরা রহিয়াছি, এই পৃথিবীতে আমরা চিরদিন ছিলাম না এবং এই পৃথিবী চিরদিন মানবজাতির বাসের উপযুক্ত থাকিবে না, ইহা জড়-বিজ্ঞানের সাহায্যে অসংশয়িতরূপে বুঝিতে পারা যায়। মানবের বাস এই পৃথিবী-গ্রহেই প্রথম আরম্ভ হয় নাই, ইহার পূর্ব্বে অন্যান্য গ্রহে হইয়াছে, অন্য গ্রহ ত্যাগ করিয়া মানব পৃথিবীতে আসিয়াছে, ইহাই পৌরাণিকের মত। সুপণ্ডিত শ্রীযুক্ত ভগবান্ দাস এম, এ মহাশয় তাঁহার মনু-সংহিতা সম্বন্ধীয় ইংরাজী পুস্তকে 'দ্বীপ' সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহাই পুরাণের প্রকৃত ব্যাখ্যা।

After passing through enormous periods of time, and evolving sensory and motor organs, and inner and outer faculties, on various globes of the physical plane; in different stages of substantiality, known in Sanskrit story as globes of the physical plane (Dwipas of the Bhu-loka), through Rounds and Races and sub-races and still more minute divisions, on succesive and separate continents and subcontinents and countries—indicated in the Puranas by the seven circlings of Priyavrata's car around the globes and by the septinates of divisions and sub-divisions of land ruled over by his 'sons' and 'grand sons'—after all this, the human race has arrived at the globe and the condition or substantiality of this e arth.

ইহার তাৎপর্য্য বহু বহু যুগে মানুষের অনুভব করিবার ও শক্তিপ্রয়োগ করিবার স্নায়ুতন্ত্রী, এবং অন্যান্য শক্তি বিকশিত হইয়াছে। ভিন্ন ভিন্ন স্তরে অবস্থিত ভিন্ন ভিন্ন 'জগতে' এই

বিকাশ ক্রমে ক্রমে সাধিত হইয়াছে। এই যে ভিন্ন ভিন্ন জগৎ, ইহাই ভূলোকের ভিন্ন ভিন্ন দ্বীপ। সুবৃহৎ মহাদেশে, ভিন্ন ভিন্ন মহাদেশে ও দেশে ভিন্ন ভিন্ন জাতির ভিতর দিয়া এই মানব-জাতির অভিব্যক্তি হইয়াছে। পুরাণে ইহাই প্রিয়ব্রতের রথচক্রের সপ্ত আবৃত্তি বলিয়া কথিত হইয়াছে।

যাহা হউক এই যে প্রসঙ্গ, ইহা বড়ই কঠিন, বিশেষরূপে চিন্তা করা আবশ্যক। প্রিয়ব্রতের সাত পুত্র, এক একজন এক এক দ্বীপের আধিপত্য লাভ করিলেন আমরা জম্বুদ্বীপবাসী, জম্বুদ্বীপের আধিপত্য লাভ করিলেন, আগ্নীধ্র। জম্বুদ্বীপ পৃথিবীর একটি অংশ নহে, আমাদের সমগ্র পৃথিবীই জম্বুদ্বীপ। পৃথিবীর উৎপত্তি সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক তথ্য একালে প্রায় সকলেই অবগত আছেন। একটি গলিত ও উত্তপ্ত পিণ্ড আরও বৃহত্তর পিণ্ড হইতে উৎক্ষিপ্ত হইয়া স্বাতন্ত্র্য লাভ করিয়াছে। প্রিয়ব্রতের সময়ে এইরূপ হওয়াও সম্ভব। আগ্নীধ্রের নয়পুত্র, জম্বুদ্বীপকে নয়টি বর্ষে বিভক্ত করিয়া প্রিয়ব্রত এক একজনকে এক এক বর্ষের আধিপত্য-ভার অর্পণ করিলেন। আগ্নীধ্রের পুত্র নাভি। নাভির পুত্র ঋষভদেব, শ্রীভগবানের অবতার। ঋষভদেব নিজ পুত্রগণকে মোক্ষধর্ম্ম ও পারমহংস্য জ্ঞান উপদেশ করেন। ঋষভদেবের শতপুত্রের মধ্যে ভরত সর্ব্বজ্যেষ্ঠ এবং ঋষভদেব তাঁহাকেই রাজ্যভার অর্পণ করেন। আমাদের এই বর্ষের নাম পূর্ব্বে অজনাভ ছিল, রাজর্ষি ভরতের নাম অনুসারেই ইহার নাম ভারতবর্ষ হইয়াছে। ভরতের ইতিহাস বড়ই অপূর্ব্ব, অনেকেই ইহা জানেন, কিন্তু ভরতের ইতিহাসই যে ভারতবর্ষের নিত্য ইতিহাস তাহা একটু গভীর ভাবে আলোচনা না করিলে বুঝা যাইবে না।

শ্রীমদ্ভাগবতের পঞ্চম স্কন্ধে স্বায়ম্ভুব মন্বন্তর বর্ণনার পর ষষ্ঠ স্কন্ধে দক্ষ প্রজাপতি হইতে যে সৃষ্টির কথা বর্ণনা করিতেছেন তাহা চাক্ষুষ মন্বন্তরের। শ্রীমদ্ভাগবতের অষ্টমস্কন্ধে অন্যান্য

মন্বন্তরের বর্ণনা পরিদৃষ্ট হয়। প্রথম মন্বন্তর অর্থাৎ স্বায়ম্ভুব
মন্বন্তরের বর্ণনা পরিদৃষ্ট হয়। প্রথম মন্বন্তর অর্থাৎ স্বায়ম্ভুব
মন্বন্তরের কথা বলা হইয়াছে। দ্বিতীয় মনুর নাম স্বারোচিষ, তিনি অগ্নির পুত্র। ইন্দ্রের নাম রোচন, তুষিতাদি দেবতা। মন্বন্তরের অবতারের নাম বিভু, ইনি বেদশিরা ঋষির তুষিতা নাম্নী পত্নীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন।

পরবর্ত্তী মন্বন্তর।

তৃতীয় মনুর নাম উত্তম, তিনি প্রিয়ব্রতের সন্তান। বশিষ্ঠ-পুত্র প্রমদাদি সপ্তর্ষি, সত্য, বেদশ্রুত, ভদ্র প্রভৃতি দেবতা এবং সত্যজিৎ ইন্দ্র; মন্বন্তরাবতার সত্যসেন। চতুর্থ মনুর নাম তামস, ইনি তৃতীয় মনু উত্তমের ভ্রাতা। সত্যক, হরি, বীর ও বৈধৃতিগণ নামক মন্বন্তর দেবতা, মন্বন্তর অবতার হরি। ইনি গ্রাহগ্রস্ত গজেন্দ্রকে মুক্ত করেন।

এই যে কুম্ভীর, ইনি পূর্ব্বজন্মে হুহু নামক গন্ধর্ব্ব ছিলেন। একদিন এই গন্ধর্ব্বরাজ স্ত্রীগণের সহিত সরোবরে ক্রীড়া করিতে-ছিলেন, এমন সময়ে দেবল ঋষি সেই সরোবরে স্নান করিতে আসেন, গন্ধর্ব্বরাজ আমোদ করিয়া জলের ভিতরে ঋষির চরণ ধরিয়া আকর্ষণ করেন। ঋষি ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে অভিশাপ দেন, 'তুই, গ্রাহ হইয়া জন্মগ্রহণ কর।' এই প্রকারে গন্ধর্ব্বরাজ গ্রাহ হইয়া অনেকদিন জলমধ্যে ছিলেন, সম্প্রতি শ্রীভগবানের সুদর্শনচক্রে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়া শাপমুক্ত হইলেন।

গজেন্দ্র মোক্ষণ

গজেন্দ্র পূর্ব্বজন্মে ইন্দ্রদ্যুম্ন নামক পাণ্ড্যদেশের রাজা ছিলেন। তিনি দেবপূজায় রত ছিলেন, সশিষ্য অগস্ত্য ঋষি তাঁহার আশ্রমে আসিলে তিনি অভ্যর্থনা করেন নাই। এই কারণে অগস্ত্য তাঁহাকে অভিশাপ দেন। সেই শাপে তিনি গজেন্দ্র হইয়াছিলেন, এখন শাপমুক্ত হইয়া শ্রীভগবানের পার্ষদ হইলেন।

পঞ্চম মনুর নাম রৈবত ইনি চতুর্থ তামস মনুর সহোদর ভ্রাতা। এই মন্বন্তরে বিভু নামে ইন্দ্র, ভূতরয়াদি দেবতা, হিরণ্য-

রোমা, বেদশিরা, ঊর্দ্ধবাহু প্রভৃতি ঋষি। অবতারের নাম বৈকুণ্ঠ।

ষষ্ঠ মনুর নাম চাক্ষুষ। মন্ত্রদ্রুম ইন্দ্র, আপ্যাদিগণ দেবতা, হর্য্যস্মৎ বীরকাদি ঋষি। অবতারের নাম অজিত। চাক্ষুষ মন্বন্তরের প্রধান ঘটনা সমুদ্র-মন্থন।

বিবস্বানের পুত্র শ্রাদ্ধদেব সপ্তম মনু। এই মন্বন্তরে আদিত্য, বসু, রুদ্র, বিশ্বদেব, মরুদ্গণ, অশ্বিনীকুমারদ্বয়, ও ঋভুগণ দেবতা। পুরন্দর ইন্দ্র কশ্যপ, অত্রি, বসিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র, গৌতম, জমদগ্নি ও ভরদ্বাজ এই সপ্ত ঋষি। অবতারের নাম বামন ইনি বলিকে বঞ্চনা করেন।

অষ্টম মনুর নাম সাবর্ণি। এই মন্বন্তরে বলি ইন্দ্র হইবেন। অষ্টম মন্বন্তরে গালব, দীপ্তিমান, পরশুরাম, অশ্বত্থামা, কৃপ, ঋষ্য-শৃঙ্গ এবং বাদরায়ণ ব্যাস এই সাত জন সপ্তর্ষি হইবেন। তাঁহারা এখন যোগাবলম্বন করিয়া নিজ নিজ আশ্রমে রহিয়াছেন। অবতারের নাম সার্ব্বভৌম।

নবম মনু দক্ষ-সাবর্ণি, দশম ব্রহ্ম সাবর্ণি, একাদশ ধর্ম্ম সাবর্ণি দ্বাদশ রুদ্র সাবর্ণি, ত্রয়োদশ দেব-সাবর্ণি, চতুর্দ্দশ ইন্দ্র-সাবর্ণি। মার্কণ্ডের পুরাণে প্রত্যেক মনুর পূর্ব্ব জন্মের বিবরণ ও কঠোর সাধনা বর্ণিত হইয়াছে।

“জ্ঞানঞ্চানুযুগং ব্রূতে হরিঃ সিদ্ধস্বরূপধৃক্।
ঋষিরূপধরঃ কর্ম্মযোগং যোগেশরূপধৃক্।
সর্গং প্রজেশরূপেণ দস্যূন্ হন্যাৎ স্বরাড়্ বপুঃ।
কালরূপেণ সর্ব্বেষামভবায় পৃথগ্ গুণঃ॥”

ভগবান্ হরি প্রতিযুগেই সনকাদি সিদ্ধরূপ ধারণ করিয়া জ্ঞানোপদেশ, যাজ্ঞবল্ক্যাদি ঋষিরূপ ধারণ করিয়া কর্ম্মের উপদেশ, দত্তাত্রেয়াদি যোগেশ রূপ ধারণ করিয়া যোগোপদেশ করিয়া থাকেন। তিনিই প্রজাপতিরূপে প্রজাসৃষ্টি করেন, রাজা হইয়া

দস্যুবধ করেন, কালরূপী হইয়া সমস্ত ধ্বংশ করেন, যাবতীয় গুণ তাঁহা হইতেই হয়।

পৌরাণিক মন্বন্তর-কথা বা অন্যান্য কথা আলোচনার প্রারম্ভেই একটি বিশেষ কথা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য। পুরাণ-সমূহ সাধারণ কল্পনাপ্রসূত ঘটনাবলীর বর্ণনামাত্র নহে। শ্রীধর স্বামী শ্রীমদ্ভাগবত সম্বন্ধে বলিয়াছেন "ব্রহ্মবিদ্যারূপমেতৎ পুরাণম্" এই পুরাণ ব্রহ্মবিদ্যারূপ। সুতরাং প্রত্যেক পুরাণেই এই ব্রহ্মবিদ্যা আংশিকরূপে জগতে বিতরিত হইয়াছে। এই ব্রহ্মবিদ্যার সাহায্যে মানব-সাধক আত্মজ্ঞান লাভ করিবে। এই আত্মজ্ঞানই ব্রহ্মজ্ঞান বা ভগবদ্ জ্ঞান, ইহাই পরাভক্তি বা প্রেমভক্তি. ইহাই প্রয়োজন। শ্রীমদ্ভাগবতের দ্বিতীয় শ্লোকে বলিয়াছেন এই পারমহংস্য সংহিতার সাহায্যে বাস্তব বস্তুর জ্ঞান হইবে। "বাস্তব বস্তু" এই কথাটির অর্থ কি? শ্রীধর স্বামী বলিয়াছেন পরমার্থভূত বস্তু। ইহাতেও যদি কেহ বুঝিতে না পারেন এবং আরও বিশ্লেষণ করিয়া বুঝাইয়া দিতে বলেন, সে জন্য শ্রীধর স্বামী বলিলেন "বাস্তব শব্দেন বস্তুনোংশো জীবঃ বস্তুনঃ শক্তির্মায়া চ বস্তুনঃ কার্য্যং জগচ্চ তৎসর্ব্বং বস্তেব ন ততঃ পৃথগিতি" অর্থাৎ বস্তুর অংশ জীব, বস্তুর শক্তি মায়া এবং বস্তুর কার্য্য জগৎ, এই তত্ত্বত্রয় অর্থাৎ জীব, মায়া ও জগৎ এই তিনের পরম জ্ঞান এই শ্রীগ্রন্থের অনুশীলনের দ্বারা উপার্জ্জিত হইবে। এই ব্যাখ্যায় 'জীব' প্রথমেই উল্লিখিত হইয়াছে। 'আমি' সেই পরমার্থভূত বস্তুকে জানিতে পারি, কারণ আমি তাঁহার অংশ কিন্তু তাঁহার অংশ হইলেও আমি তাঁহার শক্তি অর্থাৎ মায়ার দ্বারা অভিভূত ও আত্মবিস্মৃত এবং ঐ মায়ার কার্য্য যে জগৎ সেই জগতে বিভ্রান্ত সুতরাং জগতের জ্ঞান ও শক্তির জ্ঞান আবশ্যক, তাহার সাহায্যেই আত্মজ্ঞান সাধিত হইবে। এই আত্মজ্ঞান সাধনই উদ্দেশ্য। এই আত্মজ্ঞানের ভূমিতে দাঁড়াইয়া পৌরাণিক ঋষি মায়া-শক্তির কার্য্য এই জগতের সৃষ্টি স্থিতি লয় আলোচনা করিয়া-

ছেন। বর্ত্তমান কালের বৈজ্ঞানিক আলোচনার পদ্ধতির সহিত এই আলোচনা পদ্ধতির যে বেশ একটা প্রভেদ রহিয়াছে তাহা বুঝিতে পারা যাইতেছে। আত্মজ্ঞানই প্রয়োজন ও মুখ্য-রূপে সাধ্য বিষয় অন্যান্য জ্ঞানও আত্মজ্ঞানের ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত না হইলে অপূর্ণ। মানবজন্মেই এই আত্মজ্ঞান সাধিত ও পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। এই যে জীব সৃষ্টি; ইহার চরমসীমা মানব সৃষ্টি একথা আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি। মন্বন্তর সমূহের মধ্যে যে সমুদয় কথা কীর্ত্তিত হইয়াছে, তৎ সমুদয়ের উদ্দেশ্য মানুষ-সৃষ্টি।

উপনিষদে সৃষ্টিকথা।

ঋগ্বেদীয় ঐতরেয় উপনিষদে আমরা সংক্ষেপে সৃষ্টি তত্ত্ব দেখিতে পাই। সেখানে এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে। পূর্ব্বে একমাত্র আত্মা ছিলেন, তিনি ভাবিলেন লোকসকল সৃষ্টি করিব। লোক-সকল সৃষ্টি করিয়া ভাবিলেন লোকপালগণকে সৃষ্টি করিব। এইরূপ চিন্তা করিয়া তিনি জল হইতে এক পুরুষ গ্রহণ করিয়া গঠন করিলেন। তিনি পুরুষ সম্বন্ধে চিন্তা করিলেন, তাহার ফলে পাখার যেমন ডিম্ব ফুটে ঠিক সেইরূপ ঐ পুরুষের মুখ ফুটিয়া বাহির হইল। মুখ হইতে বাক্য, বাক্য হইতে অগ্নি। তাহার পর দুইটি নাসারন্ধ্র বাহির হইল, নাসা হইতে প্রাণ, প্রাণ হইতে বায়ু। তাহার পর অক্ষিদ্বয় বাহির হইল, অক্ষি হইতে চক্ষু, চক্ষু হইতে আদিত্য। কর্ণদ্বয় বাহির হইল, তাহা হইতে শ্রবণেন্দ্রিয়, শ্রবণেন্দ্রিয় হইতে দিক্। তাহার পর ত্বক্ বাহির হইল, ত্বক্ হইতে লোম, লোম হইতে ওষধি ও বনস্পতি। হৃদয় বাহির হইল, হৃদয় হইতে মন, মন হইতে চন্দ্রমা। নাভি বাহির হইল, নাভি হইতে অপান বায়ু, অপান বায়ু হইতে মৃত্যু। জননেন্দ্রিয় বাহির হইল, জননেন্দ্রিয় হইতে রেতঃ, রেতঃ হইতে জল। এই প্রকারে পুরুষ হইতে দেবগণ সৃষ্টি হইয়া "অস্মিন্মহত্যর্ণবে" এই মহাসাগরে বা মহৎ সাগরে পতিত হইলেন। তখন দেবতারা তাঁহাদের স্রষ্টাকে বলিলেন আমাদের আশ্রয় স্থান দাও, যেখানে থাকিয়া আমরা অন্ন আহার করিতে পারি। তখন বিশ্বস্রষ্টা

একটি গো আনয়ন করিলেন, তাহাতে দেবতাদের তুষ্টি হইল না। একটি অশ্ব আনিলেন তাহাতেও হইল না, শেষে একটি পুরুষ অর্থাৎ মানুষ আনিলেন। মানুষ দেখিয়া দেবতারা খুব সন্তুষ্ট হইলেন। দেবতাদের স্থান হইল। অগ্নি বাক্ হইয়া মুখে প্রবেশ করিলেন। সূর্য্য চক্ষু হইয়া অক্ষিদ্বয়ে প্রবেশ করিলেন দিক্ সকল শ্রবণেন্দ্রিয় হইয়া কর্ণদ্বয়ে প্রবেশ করিলেন। ওষধি ও বনস্পতিগণ লোম হইয়া ত্বকে প্রবেশ করিলেন। চন্দ্রমা মন হইয়া হৃদয়ে প্রবেশ করিলেন, মৃত্যু অপান হইয়া নাভিতে প্রবেশ করিলেন। জল রেতঃ হইয়া জননেন্দ্রিয়ে প্রবেশ করিলেন। ইহার পর অন্ন সৃষ্টি মিথুন সৃষ্টি প্রভৃতি।

মানব-সৃষ্টি।

মূল কথা মানব-সৃষ্টি। এই মানুষ কি প্রকারে সংসারের কর্ম্মক্ষেত্রে আসিল তাহা চিন্তা করিতে গেলে তিনটি ধারা আলোচনা করিতে হইবে। প্রথমতঃ তাহার আধ্যাত্মিক জীবন—Spiritual ancestry—আত্মার জীবনে যাঁহারা চির-বিরাজিত তাঁহারা ক্রমে ক্রমে এই মানবের চৈতন্যরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন তাহার পর The physical ancestry এই জড় ক্রমে ক্রমে পরিবর্ত্তিত হইয়া দেবতাগণের কর্ত্তৃত্বাধীনে মানবের এই দেহ নির্ম্মাণ করিয়াছে। চিন্তা করুন এই দেহ নির্ম্মিত হইতে কত সময় লাগিয়াছে। তাহার পর মানসিক জীবন The intellectual ancestry এই তৃতীয় ধারাটি ব্যতীত পূর্ব্বোক্ত দুইটি ধারা অর্থাৎ চৈতন্যধারা ও জড়-ধারা পৃথক্ হইয়া রহিয়াছে, তাহারা মিলিত হইতেছে না। ব্রহ্মা হইতে চরাচর সৃষ্টির বর্ণনায় আমরা দেখিয়াছি সৃষ্টি দুই চরমসীমার মধ্যে দোলায়িত হইতেছে, কিছুতেই একটা সামঞ্জস্যে আসিতেছে না।

তিনটি ধারা।

তাহার পর আর একটি কথা চিন্তা করিতে হইবে, স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে কেবল যে প্রিয়ব্রত ও উত্তানপাদ মহারাজার বংশ বিস্তার ও রাজ্য শাসন বর্ণিত হইয়াছে তাহা নহে। দেবতাদের সৃষ্টিও

বর্ণিত হইয়াছে। আমরা যাহাকে 'গুণ' বলি (Abstract qualities) তাহাদেরও জন্ম কথা বর্ণিত হইয়াছে।

ধর্ম্মের বংশ বিস্তার।

স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে ধর্ম্ম ও অধর্ম্মের যে বংশ তালিকা (Geneology) শ্রীমদ্ভাগবতে দেওয়া হইয়াছে তাহা হইতেই গুণ সমূহের অবতরণ (Matcrealising of abstract Qualities) দেখিতে পাই। স্বায়ম্ভুব মনুর কনিষ্ঠা কন্যার নাম প্রসূতি, দক্ষের সহিত তাঁহার বিবাহ হয় এই দক্ষের যোলটি কন্যা। ধর্ম্ম তাহার তেরটিকে বিবাহ করেন। এই তেরটি কন্যার নাম শ্রদ্ধা, মৈত্রী, দয়া, শান্তি, তুষ্টি, পুষ্টি ক্রিয়া, উন্নতি, বুদ্ধি, মেধা, তিতিক্ষা, হ্রী, মূর্ত্তি। শ্রদ্ধার পুত্র সত্য, মৈত্রীর পুত্র প্রসাদ, দয়ার পুত্র অভয়, শান্তির পুত্র শম, তুষ্টির পুত্র হর্ষ, পুষ্টির পুত্র গর্ব্ব, ক্রিয়ার পুত্র যোগ উন্নতির পুত্র দর্প, বুদ্ধির পুত্র অর্থ, মেধার পুত্র (কন্যা ?) স্মৃতি, তিতিক্ষার পুত্র ক্ষেম আর হ্রীর পুত্র বিনয়।

বারটি কন্যার এইরূপ বংশ বিস্তার বর্ণনা করিয়া শ্রীমদ্ভাগবত বলিলেন,

"মূর্ত্তি সর্ব্বগুণোৎপত্তির্নরনারায়ণাবৃষী।
যয়োর্জন্মন্যদো বিশ্বমভ্যনন্দৎসুনির্বৃতং॥"

শ্রীধরস্বামীর মতানুসারে এই শ্লোকের অর্থ,—যাহাতে সকল গুণের উৎপত্তি হয় সেই যে মূর্ত্তি, তিনি নর নারায়ণ নামে দুইটি ঋষি প্রসব করেন। ঐ দুই ঋষির জন্ম সময়ে এই চরাচর বিশ্বের সুমহৎ স্বাস্থ্য ও পরম আনন্দ জন্মিয়াছিল। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী অর্থ করিয়াছেন, এই মূর্ত্তি ইনি শুদ্ধ সত্ব স্বরূপা ভগবৎ প্রকাশিকা শক্তি, তাঁহা হইতে নিখিল কল্যাণ গুণের অর্ণব-স্বরূপ যে শ্রীভগবান্ তাঁহার উৎপত্তি হইল।

তাহা হইলে দেখা গেল যে, বারটি পত্নীতে ধর্ম্ম বারটি গুণ বা ধর্ম্মের বারটি লক্ষণ উৎপাদন করিলেন, আর মূর্ত্তিতে, সকল গুণের উৎপত্তি স্থানরূপা মূর্ত্তিতে, দুইজন ঋষি উৎপাদন

করিলেন। ক্রমে ক্রমে ধর্ম্ম মূর্ত্তি গ্রহণ করিলেন। পূর্ব্বের বারটি গুণকে বিবেচনা করিলে ধর্ম্মের ক্রমিক স্থূলত্ব-প্রাপ্তি Gradual materialisation দেখিতে পাওয়া যাইবে। মূর্ত্তিতে আসিয়া এই স্থূলত্ব-প্রাপ্তি বা অবরোহণ Materialisation or descent পূর্ণতা প্রাপ্ত হইল। এই নর নারায়ণ ঋষি আবির্ভূত হইলেন। অন্যান্য গুণের অর্থাৎ সত্য, প্রসাদ, অভয়, শম, হর্ষ, গর্ব্ব, যোগ, দর্প, অর্থ, স্মৃতি, ক্ষেম ও বিনয়ের জন্মকথা বর্ণনা করিয়াছেন মাত্র, কিন্তু নর-নারায়ণের আবির্ভাব বর্ণনা করিয়া শ্রীমদ্ভাগবত বলিলেন তাহাদের জন্ম হইলে বিশ্ব সুমহৎ স্বাস্থ্য ও পরম আনন্দ লাভ করিল। বিশ্বপ্রবাহের একটি অধোমুখী ধারা তাহার পূর্ণতায় আসিল। (One line in the infinite process of downward creation reached culmination) এই জন্যই এত আনন্দ।

মনাংসি ককুভো বাতাঃ প্রসেদুঃ সরিতো দ্রয়ঃ।
দিব্যবাদ্যস্ত তুর্য্যাণি পেতুঃ কুসুমবৃষ্টয়ঃ॥
মুনয়স্তুষ্টু বুস্তুষ্টা জগুর্গন্ধর্ব্বকিন্নরাঃ॥
নৃত্যন্তি স্ম স্ত্রিয়ো দেব্যঃ আসীৎ পরমমঙ্গলং॥

স্বর্গে প্রাণির মনঃ, সকল দিক্, বায়ুমণ্ডল, নদী ও পর্ব্বত সমূহ প্রসন্ন হইল। সকল তুর্যধ্বনি ও আকাশ হইতে পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল। মুনিগণ সন্তুষ্টচিত্তে স্তব করিতেছেন, গন্ধর্ব্ব ও কিন্নরগণ প্রসন্নমনে গান করিতেছেন, দেবস্ত্রীগণ পরম কৌতুকে নৃত্য করিতেছেন।

ব্রহ্মা প্রভৃতি দেবগণ আসিয়া ঐ বালকদ্বয়ের স্তব করিতে লাগিলেন। ঐ দুই ঋষি অমরগণ কর্ত্তৃক স্তুত হইয়া গন্ধমাদন পর্ব্বতে প্রস্থান করিলেন।

তাবিমৌ বৈ ভগবতো হরেবংশাবিহাগতৌ।
ভা-ব্যয়ায় চ ভুবঃ কৃষ্ণৌ যদুকুরুদ্বহৌ।

ভগবান হরির এই দুই অংশ ভূভার হরণের জন্য দুই কৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন।

শ্রীধরস্বামী তন্ত্র হইতে এই স্থলে বচন উদ্ধার করিয়াছেন।

"অর্জ্জুনে তু নরাবেসাঃ কৃষ্ণো নারায়ণো স্বয়ম্"

শ্রীজীব গোস্বামী ও শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী এই শ্লোকের ব্যাখ্যা করিয়া দেখাইয়াছেন যে, তাঁহারা অর্থাৎ নারায়ণ ও নর, কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনে আসিলেন অর্থাৎ তাঁহারা কৃষ্ণার্জ্জুনের অংশ এখন আসিয়া অংশিতে মিলিত হইলেন। ভাগবতামৃতের কারিকা শ্রীবিশ্বনাথ উদ্ধার ক রয়াছেন।

কর্ত্তারৌ তৌ হরেরংশৌ নরনারায়ণাবৃষী
দ্বাপরান্তে কর্ম্মভূতাবায়াতৌ কৃষ্ণফাল্গুনৌ ॥

হরির এই দুই অংশ কৃষ্ণফাল্গুনীতে দ্বাপরের শেষে আসিলেন। শ্রীমদ্ভাগবতের শ্লোকে যে 'তৌ' আছে তাহা কর্ত্তৃ-কারক, আর 'কৃষ্ণৌ' এই পদে কর্ম্মণি দ্বিতীয় বিভক্তি হইয়াছে, এই ভাবে বুঝিতে হইবে।

র বংশ
ার।

ধর্ম্মের মূর্ত্তিগ্রহণের কথা বলা হইল, অধর্ম্মের বংশবৃদ্ধির কথাও এই সঙ্গে আলোচ্য। অধর্ম্মও ব্রহ্মার পুত্র, তাহার পত্নীর নাম মিথ্যা। উহাদের পুত্রের নাম দম্ভ, আর কন্যার নাম মায়া। উহারা সহোদর সহোদরা হইলেও মিথুন অর্থাৎ পতি-পত্নী হইয়াছিল। উহাদের পুত্র কন্যা লোভ ও শঠতা, আবার তাহাদের পুত্রকন্যা ক্রোধ ও হিংসা, তাহাদের পুত্রকন্যা কলি ও দুরুক্তি। দুরুক্তির গর্ভে কলির ভীতি নামে এক কন্যা ও মৃত্যু নামে এক পুত্র জন্মায়। ইহাদের পুত্র কন্যার নাম নিরয়

ও যাতনা। শ্রীমদ্ভাগবত বলিলেন ইহার নাম প্রতিসর্গ। শ্রীধর স্বামীর মতে 'প্রতিসর্গ' কথার অর্থ প্রলয়।

ত্রিঃ শ্রুত্বৈতৎ পুমান্ পুণ্যং বিধুনোত্যাত্মনোমলং।

যে ব্যক্তি এই বৃত্তান্ত তিনবার শ্রবণ করিবেন, তাঁহার সকল পাপ দূরীভূত হইবে।

স্বায়ম্ভুব মনুর তিন কন্যা ও দুই পুত্র। এক কন্যা আকূতি, তাঁহার বিবাহ হয় প্রজাপতি রুচির সহিত। বিষ্ণু যজ্ঞ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া রুচি ও আকূতির পুত্ররূপে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। দেবহূতির কথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, আর তৃতীয় কন্যা প্রসূতি। সৃষ্টির তিনটি ধারা কিয়ৎপরিমাণে এই তিন কন্যাতেই দেখিতে পাওয়া যায়। মন্বন্তরের সমগ্র বিবরণ পাওয়া যায় না এবং পাইলেও অন্তর্দৃষ্টিহীন জগতের খুব বেশী উপকারও হইবে না। বিবিধ পুরাণের মধ্যে যে সমুদয় বিবরণ রহিয়াছে তাহা একত্র করিয়া অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্ন হইয়া আলোচনা করিতে হইবে। বর্ত্তমান কালের বা প্রত্যক্ষ-বিজ্ঞানের আলোচনা পদ্ধতি এবং প্রাচীন কালের বা অধ্যাত্ম বিজ্ঞানের আলোচনা পদ্ধতির মধ্যে প্রভেদ কোথায়, তাহা উত্তমরূপে নির্দ্ধারণ করিয়া তাহার পর শ্রীমদ্ভাগবতে মন্বন্তরের যে সব ঘটনা রহিয়াছে, তাহা আলোচনা করিলেই আমরা সৃষ্টি রহস্য ও মানবের যথার্থ ইতিহাস, তাহার অতীত বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ বুঝিতে পারিব।

পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে যে, কল্পের অবসানে অর্থাৎ ব্রহ্মার একটি দিন শেষ হইলে শ্রীভগবানের শক্তিরূপ যে সঙ্কর্ষণদেব, তাঁহার মুখ হইতে অগ্নি নির্গত হয় এবং সেই আগুনে ত্রিলোক দগ্ধ হইয়া যায়। সঙ্কর্ষণ দেব সম্বন্ধে পরবর্ত্তী প্রবন্ধে অর্থাৎ পুরুষাবতার প্রসঙ্গে আলোচনা করা যাইবে, বর্ত্তমান প্রবন্ধে এই সঙ্কর্ষণাগ্নি সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাইতেছে।

শ্রীমদ্ভাগবতের পঞ্চম স্কন্ধের পঞ্চবিংশতি অধ্যায়ের প্রারম্ভে কথিত হইয়াছে পাতালের মূলদেশে ত্রিংশৎ সহস্র যোজন অন্তরে ভগবানের তামসী নামে বিখ্যাত এক অংশ আছে, তাহার নাম অনন্ত। সাত্বততন্ত্রনিষ্ঠ চতুর্ব্ব্যূহ উপাসকেরা তাঁহাকে সঙ্কর্ষণ বলেন। সঙ্কর্ষণ বলিবার হেতু এই যে 'আমি, আমার' এই প্রকারের অভিমান যে অহঙ্কার হইতে জন্মায়, সেই অহঙ্কার ও দ্রষ্টাদৃশ্য ভেদ তিনি আকর্ষণ করিয়া থাকেন। ইহার তাৎপর্য্য এই যে অহংকার হইতেই বিশ্বের প্রকাশ, আমি, তুমি, তিনি প্রভৃতি বহু কর্ত্তা ; ইহা, উহা, তাহা প্রভৃতি বহু কর্ম্ম, অহঙ্কার হইতেই জন্মায়, এই অহংকার সঙ্কর্ষণ কর্ত্তৃক সমাকৃষ্ট অর্থাৎ দূরীভূত বা বিলয়প্রাপ্ত হইয়া থাকে, এই কারণেই তাঁহার নাম সঙ্কর্ষণ। ভগবানের এই অনন্তমূর্ত্তির একটি মস্তকে ভূমণ্ডল বিরাজিত, তাঁহার মস্তকের তুলনায় ভূমণ্ডল এতই ক্ষুদ্র যে, অনন্তদেবের ফণা দেখিয়া ভূমণ্ডলের প্রতি চাহিলে এই ভূমণ্ডলকে একটি শ্বেত সর্ষপের ন্যায় দেখায়।

অনন্ত ও সঙ্কর্ষণ।

শ্রীবিষ্ণুপুরাণের দ্বিতীয়াংশ পঞ্চম অধ্যায়ে আছে—

"পাতালানামধশ্চাস্তে বিষ্ণোর্যা তামসী তনুঃ।
শেষাখ্যা যদ্‌গুণান্ বক্তুং ন শক্তা দৈত্যদানবাঃ॥"

পাতালে সকলের অধোভাগে বিষ্ণুর শেষ নামে যে তামসী তনু আছেন, দৈত্যদানবগণও তাঁহার গুণ বর্ণনা করিতে অক্ষম।

ফণামণিসহস্রেণ যঃ স বিদ্যোতয়ন্ দিশঃ।
সর্ব্বান্ করোতি নির্বীর্য্যান্ হিতায় জগতোঽসুরান্॥

তিনি সহস্র ফণার মণির দ্বারা দিক্‌সকল সমুজ্জ্বল করিতেছেন এবং সমস্ত অসুরকে নির্ব্বীর্য্য করিতেছেন।

লাঙ্গলাসক্তহস্তাগ্রো বিভ্রন্মুষলমুত্তমম্।
ইঁহার একহস্তে লাঙ্গল অপর হস্তে উত্তম মুষল।

সঙ্কর্ষণাগ্নির তত্ত্ব অধ্যাত্ম বিজ্ঞানের একটি অতি সাধারণ পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া বুঝিতে পারি। এই পদ্ধতিটিকে ইংরাজিতে বলে As above so below. অর্থাৎ সমুন্নত ও ইন্দ্রিয়ের অগোচর আধ্যাত্মিক জগতেও যেমন এই স্থূল ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য জগতেও তেমনি। এই স্থূল জগৎকে উত্তমরূপে বুঝিতে পারিলে, তাহার সাহায্যে উন্নততর ও অতীন্দ্রিয় জগতের রহস্যও অনুমান করা যায়। অবশ্য উত্তমরূপে বুঝা বড় কঠিন ব্যাপার, যাহা হউক আমরা এই সঙ্কর্ষণাগ্নির তত্ত্ব অনায়াসেই বুঝিতে পারি।

বিষ্ণুপুরাণ বলিয়াছেন—

যদা বিজৃম্ভতেঽনন্তো মদাঘূর্ণিতলোচনঃ।
তদা চলতি ভূরেষা সাদ্রিতোয়াব্ধিকাননা॥

মদঘূর্ণিত লোচন অনন্তদেব যখন জৃম্ভন করেন (হাই তোলেন)। তখন গিরি, সমুদ্র ও কানন সহ এই ভূমণ্ডল কম্পিত হইতে থাকে। অর্থাৎ ভূমিকম্প বা জলকম্প উপস্থিত হয়।

খৃষ্টীয়শাস্ত্রে সাধু পিতরের দ্বিতীয় গ্রন্থের তৃতীয় বচনে ঠিক্ এই প্রকারেরই প্রলয়ের কথা কথিত হইয়াছে।

পৃথিবীর অভ্যন্তরে অত্যন্ত উত্তপ্ত, চঞ্চল ও আবর্ত্তনশীল বিপুল তরল পদার্থ রহিয়াছে। শেষ অগ্নি অর্থাৎ যে অগ্নি সৃষ্টি-কালে উত্তাপ নিঃসৃত হওয়ার পরেও বীজরূপে অবশিষ্ট রহিয়াছে, সেই অগ্নিতে পৃথিবী ধ্বংস হইবে। সুতরাং ঐ সঙ্কর্ষণাগ্নির যাহা স্থূল অংশ (Gross material manifestation in the sensuous world) তাহা পৃথিবীর ভিতরে বিরাজমান, তাহার সমুজ্জ্বল শিখাসমূহ অসংখ্য ফণার মত যেন ভূগর্ভ হইতে বাহিরে আসিবার চেষ্টা করিতেছে। এই চেষ্টাই যে ভূমিকম্প ও জলকম্পের কারণ তাহা বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত।

পুরুষাবতার-প্রসঙ্গ

অবতার-কথা ও তাহার তত্ত্ব সম্যক্‌রূপে বুঝিতে হইলে প্রথমেই পুরুষাবতারের প্রসঙ্গ আসিয়া উপস্থিত হয়। এই পুরুষ ত্রিবিধ। শ্রীমদ্ভাগবত পাঁচটি শ্লোকে এই পুরুষ-ত্রয়ের উল্লেখ করিয়াছেন। শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে দুই স্থানে এই প্রসঙ্গ উত্থাপিত ও আলোচিত হইয়াছে। আদিলীলার পঞ্চম পরিচ্ছেদে শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ-তত্ত্ব বর্ণনা করিবার সময় শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী মহোদয় বলিয়াছেন, শ্রীচৈতন্যলীলায় যিনি শ্রীনিত্যানন্দ, ব্রজলীলায় তিনি শ্রীবলরাম। তিনি, স্বয়ং ভগবান্ ও সর্ব্ব-অবতারী শ্রীকৃষ্ণের দ্বিতীয় দেহ। তাঁহাদের স্বরূপ এক, দেহ বা প্রকাশ ভিন্ন, ইনি আদ্য কায়ব্যূহ ও শ্রীকৃষ্ণলীলার সহায়। যিনি বলরাম, তিনি মূল সঙ্কর্ষণ। তিনি পঞ্চরূপে অর্থাৎ পাঁচ প্রকারের মূর্ত্তি ধরিয়া শ্রীকৃষ্ণের সেবা করেন। স্বয়ং অর্থাৎ স্বরূপে শ্রীকৃষ্ণের লীলার সাহায্য করেন, আর চারি মূর্ত্তি ধরিয়া সৃষ্টি লীলার কার্য্য করিয়া থাকেন।

ত্রিবিধ পুরুষ।

বলরাম ও নিত্যানন্দ।

সেবা।

সৃষ্টি-লীলা-কার্য্যে যে চারিরূপ ধারণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের আজ্ঞা-পালন করেন তাহার নাম ১। কারণ-তোয়-শায়ী ২। গর্ভো-দকশায়ী ৩। পয়োব্ধিশায়ী বা ক্ষীরোদকশায়ী ৪। শেষ। এই চারিরূপের মধ্যে প্রথম তিনটিই তিন পুরুষাবতার।

যিনি মূল সঙ্কর্ষণ, তিনি ও স্বয়ং ভগবান্ একই স্বরূপ, কেবল মাত্র কায় ভিন্ন; সেই মূল সঙ্কর্ষণ সৃষ্টি লীলায় তিনরূপ ধারণ করিয়া অবতরণ করিয়াছেন, অথবা প্রপঞ্চে তাঁহার প্রথমতঃ ত্রিবিধ প্রকাশ। এই ত্রিবিধ প্রকাশের নাম ত্রিবিধ পুরুষাবতার। অতএব পুরুষাবতার তিন হইলেও প্রকৃত প্রস্তাবে এক। ইঁহারা সেই একই পুরুষের ত্রিবিধ প্রকাশ মাত্র। One manifesting as three. প্রকৃতি যেমন এক, কিন্তু ত্রিগুণময়ী অতএব ত্রিধা

তিনে এক।

প্রকাশিত, পুরুষও তেমনি এক, কিন্তু প্রকৃতির মধ্য দিয়া বা সৃষ্টিলীলার সাহায্যে তাঁহাকে দেখিতে গেলে তাঁহার তিন মূর্ত্তি।

সাংখ্যমতে বহুপুরুষ।

সাংখ্যদর্শন বহু-পুরুষবাদ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। কপিল সিদ্ধ পুরুষ। বেদে কথিত হইয়াছে, "ঋষিং প্রসূতং কপিলং যস্তমগ্রে জ্ঞানৈর্ব্বিভর্ত্তি জায়মানঞ্চ পশ্যেৎ" (শারীরক ভাষ্য ধৃত শ্রুতি) অর্থাৎ যে দেব প্রথম প্রসূত কপিলকে জন্মিবামাত্র ঋষি (মন্ত্রার্থ-দ্রষ্টা) ও জ্ঞানী করিয়াছেন সেই পরমদেব ঈশ্বরকে জ্ঞানগোচর করিবে। সুতরাং অনেকেই বলেন কপিলের মত মিথ্যা হইতে পারে না। তাহা হইলে এই যে ভাগবত-সিদ্ধান্ত অর্থাৎ এক পুরুষ প্রপঞ্চে ত্রিধা প্রকাশিত, ইহা কি প্রকারে হইতে পারে? আমরা শারীরক ভাষ্যে আচার্য্য শঙ্কর কর্ত্তৃক এই সংখ্যমতের যে সমালোচনা হইয়াছে তাহা অনায়াসেই গ্রহণ করিতে পারি। এই প্রসঙ্গে ভাগবত-সিদ্ধান্ত শ্রীশঙ্করাচার্য্য কর্ত্তৃক অতি সুন্দরভাবে সমর্থিত হইয়াছে। আচার্য্য শঙ্করের সহিত ভাগবত-সিদ্ধান্তের বিরোধ কোথায় সঙ্কীর্ণবুদ্ধি ও কলহপ্রিয় লোকেরা যেখানে সেখানে তাহাই নির্দ্দেশ করিয়া থাকে। ইহা বড়ই অহিতকর। শ্রীল শঙ্করাচার্য্য কর্ত্তৃক ভাগবত-সিদ্ধান্ত কিরূপে সমর্থিত ও দৃঢ়ীকৃত হইয়াছে তাহা এই উপলক্ষে শারীরক ভাষ্যের কপিলমত সমালোচনায় বেশ দেখিতে পাওয়া যায়।

কপিল সম্বন্ধে শঙ্কর মত।

সাংখ্য-দর্শন বহুপুরুষ-বাদ প্রচার করিয়াছেন। বেদে কপিলকে সিদ্ধ পুরুষ বলা হইয়াছে সুতরাং কপিলের এই মত বা সাংখ্য মত কিরূপে অস্বীকার করা যায়? আচার্য্য শঙ্কর বলিতেছেন শ্রুতি যখন কপিলের জ্ঞান অপ্রতিহত বলিয়াছেন, তখন কপিলের মত শ্রুতি-বিরুদ্ধ হইতেই পারে না, অর্থাৎ সিদ্ধি পুরুষের মত স্বভাবতঃই সকল সময়ে বেদানুগত হইবে। কারণ "ধর্ম্মানুষ্ঠানাপেক্ষা হি সিদ্ধিঃ, স চ ধর্ম্মশ্চোদনালক্ষণঃ" অর্থাৎ ধর্ম্মানুষ্ঠান ব্যতীত সিদ্ধি হয় না। ধর্ম্ম বেদমূলক। প্রথমে বেদ-জ্ঞান, পরে বেদার্থের বা বেদবিহিত ধর্ম্মের অনুষ্ঠান, তাহার

পর সিদ্ধি, সুতরাং "পূর্ব্বসিদ্ধায়াশ্চোদনায়া অর্থো ন পশ্চিমসিদ্ধ-পুরুষবচনবশেনাতিশঙ্কিতুং শক্যতে" অর্থাৎ পরবর্ত্তী সিদ্ধ পুরুষের বাক্যের দ্বারা পূর্ব্ববর্ত্তী বেদার্থ অন্যথা করা অন্যায্য।

আচার্য্য শঙ্করের দ্বিতীয় যুক্তি এই যে সিদ্ধ পুরুষ অনেক, তাঁহাদের স্মৃতিও অনেক। ভিন্ন ভিন্ন স্মৃতির মধ্যে মতভেদ হইলে শ্রুতির সাহায্যে তাহাদের বিরোধ-ভঞ্জন করিতে হইবে।

আচার্য্য শঙ্করের তৃতীয় যুক্তি এই যে কপিল একজন নহে কপিল অনেক। এই অনেক কপিলের মধ্যে বহু-পুরুষ-বাদ-সমর্থক সাংখ্য কোন্ কপিল বলিয়াছেন এবং কোন্ কপিল শ্রুতি-কর্তৃক প্রশংসিত হইয়াছেন, তাহাই বা নির্দ্ধারিত হইবে কিরূপে? তাহা হইলে আচার্য্য শঙ্কর বলিতেছেন যে নিরীশ্বর বা বহু-পুরুষ-বাদ-সমর্থক কপিল আর বেদ কর্তৃক অপ্রতিহত-জ্ঞান-সম্পন্ন বলিয়া বর্ণিত কপিল, ইঁহারা পৃথক। এই মত যে শ্রীমদ্ভাগবতের অতীব সুস্পষ্ট মত তাহা সকলেই জানেন।

তাহার পর আচার্য্য শঙ্কর মনু-সংহিতা ও মহাভারত হইতে প্রমাণ বচন উদ্ধার করিয়া দেখাইয়াছেন যে এই উভয় স্মৃতিতেই বহু-পুরুষ-বাদ খণ্ডিত ও এক-পুরুষ-বাদ সমর্থিত হইয়াছে।

এক পুরুষ বাদ।

"মহাভারতেঽপি চ, বহবঃ পুরুষা ব্রহ্মন্নুতাহো এক এব তু, ইতি বিচার্য্য বহবঃ পুরুষা-রাজন্! সাঙ্খ্যযোগবিচারিণাম্ ইতি পরপক্ষমুপন্যস্য তদ্ব্যুদাসেন—

বহূনাং পুরুষাণাং হি যথৈকা যোনিরুচ্যতে।
তথা তং পুরুষং বিশ্বমাখ্যাস্যামি গুণাধিকম্॥

ইত্যুপক্রম্য

মমান্তরাত্মা তব চ যে চান্যে দেহিসংজ্ঞিতাঃ॥
সর্ব্বেষাং সাক্ষিভূতোঽসৌ ন গ্রাহ্যঃ কেনচিৎ ক্বচিৎ॥
বিশ্বমূর্দ্ধা বিশ্বভুজো বিশ্বপাদাক্ষিনাসিকঃ।
একশ্চরতি ভূতেষু স্বৈরচারী যথাসুখম্॥

ইতি সর্ব্বাত্মৈব নির্দ্ধারিতা। শ্রুতিশ্চ সর্ব্বাত্মতায়ং ভবতি।"

(বেদান্ত দর্শনের ২ অধ্যায়, ১ পাদ, ১ সূত্রের শারীরক ভাষ্য)

একাত্মবাদ মহাভারতে নির্ণীত হইয়াছে। মহাভারতে প্রশ্ন করা হইল "হে ব্রাহ্মণ। পুরুষ এক, কি বহু?" সাংখ্যের ও যোগের মতে পুরুষ বহু, এইরূপে পরকীয় পক্ষের উল্লেখ করিয়া পশ্চাৎ তাহার খণ্ডনার্থ 'বহু পুরুষের অর্থাৎ পুরুষাকার শরীরের উৎপত্তিস্থান যদ্রূপ, তদ্রূপ, আমি সেই বিরাট্ পুরুষের কথা তোমাকে বলিতেছি।" এইরূপে প্রস্তাব আরম্ভ করিয়া বলিয়াছেন "ইনিই আমার আত্মা, তোমার আত্মা ও অন্যের আত্মা। ইনি সমস্ত আত্মার (সমস্ত দেহের অথবা সমস্ত জীবের) সাক্ষী অর্থাৎ সাক্ষাৎ দ্রষ্টা। ইনি কখনও কাহারও আপাতজ্ঞানের গোচর নহেন। ইনি বিশ্বমস্তক, বিশ্ববাহু, বিশ্বপাদ, বিশ্বনেত্র ও বিশ্বনাসিক। ইনি এক, স্বাধীন প্রকাশ, স্বেচ্ছাবিহারী ও সকল ভূতে বিরাজমান। মহাভারতের এই বাক্যে নানাত্মবাদ বা বহু-পুরুষবাদ খণ্ডিত ও একাত্মবাদ নির্ণীত বা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। শ্রুতিতেই স্পষ্ট একাত্মবাদ কথিত হইয়াছে।

আচার্য্য-শঙ্করের সাংখ্যমত খণ্ডন এই পুরুষ কথার আলোচনায় উত্থাপন করার একটি বিশেষ উদ্দেশ্য আছে, তাহাও এই স্থলে বলা উচিত। বাঙ্গালার বৈষ্ণব ধর্ম্ম বা রাধাকৃষ্ণ-লীলা প্রভৃতি সাংখ্য-দর্শনের মতের উপর প্রতিষ্ঠিত, বঙ্কিমচন্দ্র-প্রমুখ কোন কোন মনীষি এইরূপ মত প্রচার করিয়া গিয়াছেন। প্রকৃত প্রস্তাবে শ্রীমদ্ভাগবতই প্রকৃত বেদান্ত বা বেদান্তের অকৃত্রিম ভাষ্য এবং বাঙ্গালার বৈষ্ণবধর্ম্ম সেই শ্রীমদ্ভাগবতের প্রতিপাদিত ধর্ম্ম। আচার্য্য শঙ্করের সহিত এই মতের পার্থক্য থাকিলেও সামঞ্জস্যই অধিক। ভাগবতধর্ম্ম বেদান্ত ধর্ম্ম, এই কথা যদি আমরা ভুলিয়া যাই তাহা হইলে মূল হারাইয়া ফেলিব, এই কারণে পুরুষ-প্রসঙ্গে আচার্য্য শঙ্করের সাংখ্যমত-খণ্ডন আলোচিত হইল।

বেদান্ত ও ভাগবত।

শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে শ্রীনিত্যানন্দতত্ত্ব বর্ণনা-প্রসঙ্গে পুরুষাবতার কথা বলিবার পূর্ব্বে প্রকৃতির পরপারে পরব্যোমে শ্রীভগবানের স্বরূপ প্রকাশ বর্ণনা করিয়াছেন। এই স্বরূপ-প্রকাশ হইতে আলোচনা আরম্ভ করাই সুবিধাজনক ব্যবস্থা।

পরব্যোমের বাহিরে এক জ্যোতির্ম্ময় ধাম, তাহার বাহিরে কারণার্ণব। কারণার্ণবের জল চিন্ময়। সেই কারণার্ণবে সঙ্কর্ষণ আপনার এক অংশে শয়ন করেন। তিনি অর্থাৎ সঙ্কর্ষণের যে অংশ কারণার্ণবে শয়ন করেন, তিনি মহৎস্রষ্টা পুরুষ এবং তিনিই জগৎ-কারণ। ইনিই আদ্য-অবতার, ইনি কারণার্ণবে শয়ন করিয়া মায়াশক্তির উপর ঈক্ষণ করেন। মায়াশক্তি কারণার্ণবের বাহিরে, মায়া কারণার্ণবকে স্পর্শও করিতে পারেন না। এই মায়ার দুই প্রকার অবস্থিতি অর্থাৎ প্রকাশ। প্রধান ও প্রকৃতি। প্রধান জগতের উপাদান—প্রকৃতি জড়রূপা, সুতরাং তাহাকে জগৎকারণ বলা যায়না। শক্তিসঞ্চার করিয়া কৃষ্ণ তাহাকে কৃপা করেন। সুতরাং প্রকৃতি গৌণ কারণ. কৃষ্ণের শক্তিসাহায্যে তাহার কারণত্ব সিদ্ধ হয়। পুরুষাবতার জগতের নিমিত্ত কারণ, কুম্ভকার যেমন ঘটের কর্ত্তা সেইরূপ।

প্রথম পুরুষ।

আদ্য অবতার বা প্রথম পুরুষাবতারের কথা বলা হইয়াছে; তিনি কি করেন, এইবার, দেখা যাউক। তিনি দূর হইতে মায়াতে ঈক্ষণ বা অবধান করেন এবং এই ঈক্ষণের দ্বারা মায়াতে জীবরূপ বীর্য্য আধান করেন। তাহার ফলে অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ডের জন্ম হয়। এই অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ড জন্মিবামাত্র পুরুষ বহু মূর্ত্তি ধারণ করিয়া প্রত্যেক অণ্ডে প্রবেশ করেন। অনন্ত মূর্ত্তি ধারণ করিয়া অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে প্রবেশপূর্ব্বক তিনি দেখিলেন ভিতরে সমস্তই অন্ধকার, থাকিবার স্থান নাই। তখন আপনার অঙ্গের ঘর্ম্মজলে সেই ব্রহ্মাণ্ডের অর্দ্ধেক পূর্ণ করিলেন ও সেই অর্দ্ধাংশে নিজের বাসস্থান করিলেন এবং সেই জলে শেষশয্যায় শয়ন করিলেন। তাঁহার সহস্র মস্তক, সহস্র নয়ন,

সহস্র হস্ত, সহস্র চরণ। এই সহস্র অবশ্য দশশত নহে, অসংখ্য। তিনি সকল অবতারের বীজ ও জগৎকারণ। তাঁহার নাভি হইতে এক পদ্ম উঠিল, এই পদ্মের মৃণালে চৌদ্দ ভুবন, এই পদ্মে ব্রহ্মার জন্ম হইল। ইনি অর্থাৎ এই সহস্র-মস্তক পুরুষ দ্বিতীয় পুরুষ, ইনি গর্ভোশায়ী ও হিরণ্যগর্ভের অন্তর্যামী। এই নালের মধ্যে ধরণী, তাহাতে সাত সমুদ্র। ক্ষীরোদ সাগর তাহার অন্যতম, তথায় শ্বেতদ্বীপ। সকল জীবের অন্তর্যামী বিষ্ণু তথায় থাকেন, ইনি তৃতীয় পুরুষাবতার ক্ষীরোদকশায়ী।

দ্বিতীয় পুরুষ।

তৃতীয় পুরুষ।

শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে মধ্যলীলার সনাতন শিক্ষার মধ্যে অবতার কথা বলিবার সময় এই পুরুষাবতার কথা আর একবার বলা হইয়াছে। এই স্থানে যে যে নূতন কথা আছে, তাহা নিম্নে দেওয়া হইল। দুই স্থানেরই বর্ণনা প্রধানতঃ একরূপ। কৃষ্ণের অনন্ত শক্তির মধ্যে তিন শক্তি প্রধান। ইচ্ছাশক্তি, জ্ঞানশক্তি ও ক্রিয়াশক্তি। ইচ্ছাশক্তি-প্রধান কৃষ্ণ, জ্ঞান শক্তি-প্রধান বাসুদেব আর ক্রিয়াশক্তি-প্রধান সঙ্কর্ষণ। এই তিনের তিন-শক্তি মিলিত হইয়া প্রপঞ্চ রচিত হইয়াছে। সঙ্কর্ষণ বা বলরাম ক্রিয়াশক্তি-প্রধান। তিনি প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত সৃষ্টি নির্ম্মাণ করেন। এই সঙ্কর্ষণই মায়ার দ্বারা ব্রহ্মাণ্ড সমূহ সৃষ্টি করেন। সৃষ্টির জন্য যে মূর্ত্তি প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হয়, সেই ঈশ্বর মূর্ত্তির নাম অবতার। এই অবতারগণ মায়াতীত পরব্যোমে নিত্য অবস্থায় থাকেন। বিশ্বে অবতরণ করিয়া তাঁহারা অবতার নাম ধারণ করেন। শ্রীসঙ্কর্ষণ মায়াকে অবলোকন করিবার জন্য প্রথম পুরুষরূপে অবতীর্ণ হয়েন। সেই পুরুষ বিরজাতে শয়ন করিয়া কারণাব্ধিশায়ী নাম ধারণ করেন। মায়ার দুই বৃত্তি, মায়া ও প্রধান। মায়া নিমিত্তহেতু আর প্রধান বিশ্বের উপাদান। প্রথম সৃষ্টি মহত্তত্ত্ব। মহত্তত্ত্ব হইতে সাত্ত্বিক, রাজস ও তামস এই ত্রিবিধ অহঙ্কার। তাহা হইতে দেবতা, ইন্দ্রিয় ও ভূতগ্রামের

মায়া ও প্রধান।

জন্ম। এই সমুদয় তত্ত্ব মিলিত হইলে ব্রহ্মাণ্ডশ্রেণীর উদ্ভব। এই পর্য্যন্ত প্রথম পুরুষ। তাহার পর দ্বিতীয় পুরুষ, যিনি ব্রহ্মাণ্ডে প্রবেশ করিয়া শেষ-শয্যায় শয়ন করিলেন এবং যাঁহার নাভিপদ্মে ব্রহ্মার জন্ম হইল। ইনি ব্রহ্মা হইয়া সৃষ্টি করেন, বিষ্ণু হইয়া পালন করেন, রুদ্র হইয়া সংহার করেন। ইনি হিরণ্যগর্ভ-অন্তর্যামী, গর্ভোদকশায়ী, বেদ তাঁহাকে সহস্র-শীর্ষা পুরুষ বলিয়াছেন, ইনি দ্বিতীয় পুরুষ, ব্রহ্মাণ্ডের ঈশ্বর, ইনি মায়ার আশ্রয় হইয়াও মায়াপর। তৃতীয় পুরুষ বিষ্ণু গুণাবতার, বিরাট্ ব্যষ্টি জীবের তিনি অন্তর্যামী তিনি ক্ষীরোদক-শায়ী।

উপনিষদের মত।

প্রপঞ্চে বা সৃষ্টিলীলায় পুরুষের অবতরণের যে তিনটি স্তর বা তরঙ্গ (waves) বলা হইল, তাহা উপনিষদের সৃষ্টি-বর্ণনায় দেখিতে পাওয়া যায়।

প্রথম পুরুষ মহতত্ত্বের সৃষ্টিকর্ত্তা। ইনি সঙ্কর্ষণ, কারণার্ণব-শায়ী। কারণার্ণব কি তাহাই প্রথমে আলোচ্য। পরব্রহ্মের মনে সৃষ্টির ইচ্ছা (সিসৃক্ষা) জাগিয়া উঠিল, তিনি ভাবিলেন আমি এক আছি বহু হইব "স ঐক্ষত একোঽহং বহু স্যাং" ইহারই নাম প্রকৃতির প্রতি ঈক্ষণ। প্রলয়ে সমস্ত জীব সঙ্কর্ষণের দেহে লীন হইয়া থাকে, তাহাদের উপাধি-সৃষ্টির জন্যই এই ঈক্ষণ। এই ঈক্ষণের প্রভাবেই প্রকৃতির গুণক্ষোভ ও তাহা হইতে মহ-তত্ত্বের সৃষ্টি। মহতত্ত্বই প্রকৃতির প্রথম পরিণাম ও বিশ্বের অঙ্কুর। প্রকৃতির বীক্ষণ কর্ত্তা পুরুষই প্রথম পুরুষ, ইনি প্রকৃতির অন্তর্যামী। তৈত্তিরীয় উপনিষদে আছে যে যখন তিনি বহু হইতে ইচ্ছা করিলেন, তখন "তস্মাদ্ আত্মনঃ আকাশঃ সম্ভূতঃ আকাশাদ্ বায়ুঃ বায়োরগ্নিরগ্নেরাপঃ অদ্ভ্যঃ পৃথিবী।"

তাঁহা হইতে ক্রমশঃ আকাশ, আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে অগ্নি, অগ্নি হইতে জল ও জল হইতে পৃথিবীর উদ্ভব হইল।

তত্ত্ব-সৃষ্টি।

ইহারই নাম তত্ত্ব-সৃষ্টি বা কারণ-সৃষ্টি। পূর্ব্বে মহতের বা মহতত্ত্বের সৃষ্টির কথা বলা হইয়াছে। এই মহতত্ত্ব হইতে অহঙ্কার।

এই অহঙ্কার-সাত্ত্বিক, রাজস ও তামস ভেদে ত্রিবিধ, সাত্ত্বিক অহঙ্কার হইতে একাদশ ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাত্রী দেবতা ও মন, রাজস অহঙ্কার হইতে প্রবৃত্তিস্বভাব দশ ইন্দ্রিয়, তামস অহঙ্কার হইতে আবরণস্বভাব পঞ্চ তন্মাত্রা ও তাহা হইতে পঞ্চ মহাভূতের সৃষ্টি। এই সমস্তের যে একীভূত অব্যাকৃত (Undifferentiated) অবস্থা তাহারই নাম কারণার্ণব। ইহাকে উপনিষদে অপ্ বলে। ঋগ্বেদে ইহাকে তমঃ বলা হইয়াছে। "তম আসীৎ তমসা গূঢ় মগ্রে অপ্রকেতং সলিলং সর্ব্বমা ইদং" আদিতে তমঃ তমসের দ্বারা আবৃত ছিল। এ সমস্তই অপ্রকেত সলিল ছিল। মহেশ্বরের ঈক্ষণের দ্বারা অব্যাকৃত ও নির্ব্বিশেষ কারণার্ণব ব্যাকৃত ও ও ক্ষুভিত হইল।

কারণ সৃষ্টি।

তত্ত্ব-সৃষ্টির পর লোকসৃষ্টি। "স ঐক্ষত লোকান্ নু সৃজা ইতি" তিনি সঙ্কল্প করিলেন আমি লোকসৃষ্টি করিব। "স ইমান্ লোকান্ অসৃজত অম্ভো দ্যোঃমরীচির্মরমাপঃ। অদোহম্ভ পরেন দিবং। দ্যোঃ প্রতিষ্ঠা মরীচয়ঃ। পৃথিবী মরো যা অধস্তাৎ তা আপঃ॥" অম্ভঃ দ্যোঃ, মরীচি, মর ও অপ্, এই সমুদয় লোক তিনি সৃষ্টি করিলেন। অপ্ কারণার্ণব। তাহার পর মরলোক, মরীচি অন্তরীক্ষ লোক, দ্যোঃ বা স্বর্গ। তাহার পর অম্ভ। এক কথায় ভূঃ ভুবঃ, স্বঃ, মহঃ, জনঃ, তপঃ, সত্য, এই সপ্তলোক ও সপ্ত পাতাল সৃষ্টি করিলেন।

প্রকৃত ব্যাপার এই তত্ত্ব-সৃষ্টির পর উপাধি সৃষ্টি, মহৎ হইতে মহাভূত পর্য্যন্ত প্রকৃতির পরিণাম সৃষ্টি হইয়াছে, কিন্তু তাহারা অসংহত অবস্থায় রহিয়াছে অর্থাৎ পরস্পর মিলিত হইতেছে না। তাহাদের সম্মিলিত করা আবশ্যক। এই জন্য প্রথম পুরুষ স্বীয় অংশের দ্বারা দ্বিতীয় পুরুষরূপে প্রকৃতির সহিত মহদাদি তত্ত্ব সমূহের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। জ্ঞানশক্তি-সমন্বিত দ্বিতীয় পুরুষের আকর্ষণে সাবরণ চতুর্দ্দশ ভুবনাত্মক ব্যষ্টি ব্রহ্মাণ্ড-সমূহ উৎপন্ন হইল। এক এক ব্রহ্মাণ্ড এক এক বিরাট্ দেহ।

এক এক বিরাট দেহ এক এক দ্বিতীয় পুরুষের বাসস্থান। ইনি জীবসমষ্টি অর্থাৎ হিরণ্যগর্ভের অন্তর্যামী। ইনি গর্ভোদশায়ী প্রত্যুম্ন নামে পরিচিত। গর্ভোদশায়ী পুরুষের নাভিপদ্মই লোক-পদ্ম বা চতুর্দ্দশ ভুবন। এই লোকপদ্মের কর্ণিকার সত্যলোক, ইহাই চতুরানন ব্রহ্মার উৎপত্তি স্থান।

শ্রীশ্রীলঘুভাগবতামৃত গ্রন্থে পুরুষাবতারের লক্ষণ, ভেদ প্রভৃতি বর্ণিত হইয়াছে। প্রথমেই পুরুষের লক্ষণ। শ্রীবিষ্ণুপুরাণে এইরূপ লক্ষণ পাওয়া যায়।

> তস্যৈব যোঽনুগুণভুগ্ বহুধৈক এব
> শুদ্ধোঽপ্য শুদ্ধ ইব মূর্ত্তি বিভাগভেদৈঃ॥
> জ্ঞানান্বিতঃ সকলসত্ত্ববিভূতিকর্ত্তা
> তস্মৈ নতোঽস্মি পুরুষায় সদাব্যয়ায়॥

এই শ্লোকটির অর্থনিরূপণ করিতে হইলে ইহার পূর্ব্বের শ্লোকটিও আবশ্যক। ইহার পূর্ব্বের শ্লোক—

> নান্তোঽস্তি যস্য ন চ যস্য সমুদ্ভবোঽস্তি
> বৃদ্ধির্ন যস্য পরিণামবিবর্জ্জিতস্য
> নাপক্ষয়ঞ্চ সমুপৈত্যবিকল্পবস্তু
> যস্তং নতোঽস্মি পুরুষোত্তমমাদ্যমীড্যম্।

যাঁহার অন্ত নাই, যাঁহার সমুদ্ভব নাই, যাঁহার বৃদ্ধি নাই, যিনি পরিণাম বিহীন, যাঁহার অপক্ষয় নাই এবং বিকল্প নাই, এই প্রকারের বস্তু যে পূজনীয় আদ্য পুরুষোত্তম তাঁহাকে প্রণাম করি।

এই যে আদ্য পুরুষোত্তম, ইহার পরে যিনি 'প্রধান গুণভাক্' অর্থাৎ প্রকৃতি ও প্রাকৃতের বীক্ষণ, নিয়মন ও প্রবর্ত্তনাদির অনুভব-কর্ত্তা এবং এক হইয়াও মূর্ত্তি-বিভাগ-ভেদের দ্বারা

নানারূপ এবং নিখিল প্রাণি-বিস্তারের কর্ত্তা অথচ শুদ্ধ অর্থাৎ প্রকৃতি ও প্রাকৃত লেপশূন্য এবং জ্ঞানান্বিত, তিনিই পুরুষ।

শ্রীরূপগোস্বামী মহোদয় এই শ্লোকের নিম্নরূপ কারিকা করিয়াছেন :—

পরমেশাংশরূপো যঃ প্রধানগুণভাগিব।
তদীক্ষাদিকৃতির্নানাবতার পুরুষঃ স্মৃতঃ॥

যিনি পরমেশের অংশরূপ এবং প্রধানের গুণভাক্‌রূপে প্রতিভাত, (প্রকৃত প্রস্তাবে গুণভাক্ নহেন) প্রকৃতি ও প্রাকৃতের ঈক্ষণকর্ত্তা এবং যাঁহা হইতে নানা অবতারের আবিষ্কার হয়, তিনিই পুরুষ।

পূর্ব্বের দুইটী শ্লোকে ষড়্‌ভাববিকারবিবর্জ্জিত আদ্য পুরুষোত্তম ও তাহার পর প্রাকৃত গুণ-সম্বন্ধ যুক্তের ন্যায় প্রতিভাত অথচ শুদ্ধ, পুরুষের কথা বলা হইল, তত্ত্বালোচনায় এই দুইটী তত্ত্ব বিশেষরূপে ধ্যান করিয়া দেখা উচিত। কিন্তু প্রথম তত্ত্ব আলোচনা করিতে গেলেই সাম্প্রদায়িক বিরোধের অবতারণা সম্ভব, কিন্তু তাহার অবতারণা করিবার কোনই আবশ্যক নাই। অদ্বৈতবাদের ভাষায় বলিব প্রথমেই অদ্বয় নির্ব্বিকল্প জ্ঞানরূপ পরব্রহ্ম। "নির্ব্বিকল্প" এই কথাটি শুনিয়াই কেহ কেহ বিরক্ত হইবেন, কিন্তু বিরক্তির কোনই কারণ নাই। বিকল্প বলিতে বিশেষণের যোগ বুঝায়। একটী বস্তুকে চিনিতে ও জানিতে হইলে যখন তাহার বিশেষণরূপী অপর বস্তুর সম্বন্ধের উল্লেখ বা চিন্তা আবশ্যক হয়, তখন তাহাকে সবিকল্প বলে, আর তখন ঐরূপ বিশেষণের আবশ্যক হয় না, তখন তাহাকে নির্ব্বিকল্প বলে। 'নির্ব্বিকল্প' বলিতে ভক্তেরা বুঝিবেন কোনরূপ প্রাকৃত বিশেষণ নাই। অপ্রাকৃত বিশেষণ, কি আছে, তাহা এখন বলিবার আবশ্যক কি? শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত বৈকুণ্ঠের বহিঃস্থিত এক নির্ব্বিশেষ জ্যোতির্ম্মণ্ডলের উল্লেখ করিয়াছেন। আমরা যখন

প্রাকৃত জগৎ হইতে তত্ত্বালোচনায় প্রবৃত্ত তখন প্রারম্ভে এই নির্ব্বিশেষ জ্যোতির্ম্মণ্ডলের পারে আর দৃষ্টি করার প্রয়োজন নাই, তাহা হইলে আমরা ভিন্ন ভিন্ন মতের সামঞ্জস্য দেখিতে পাইব। নিরাপদে তত্ত্বালোচনা করিতে গেলে এবং বিবিধ প্রকারের প্রচলিত মতের মধ্যে সামঞ্জস্য কোথায় তাহা নির্দ্ধারণ করিতে হইলে চিন্তা পদ্ধতি এই প্রকারে সুসংযত (Philosophically controlled and well regulated) করা আবশ্যক। শ্রীমদ্ভাগবতের মূল শ্লোকে এই সামঞ্জস্য অতীব স্পষ্ট ভাবে দেখিতে পাওয়া যায়।

পরবর্ত্তীকালে সম্প্রদায়ের বিশেষ মত সুদৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠার জন্য কোন কোন টীকায় কিছু কিছু অসহিষ্ণুতা Intolerance পরিদৃষ্ট হয়। কিন্তু জানিয়া রাখিতে হইবে এখন আবার আর একটি বৃহত্তর সমন্বয়ের (More comprehensive Synthesis and harmony) যুগ আসিয়াছে সুতরাং যুগধর্ম্মের শ্রীগ্রন্থ শ্রীমদ্ভাগবতকে তাহার মৌলিক সামঞ্জস্যের ভূমি হইতে (From the standpoint of its oiginal comprehensiveness and harmony) আলোচনা করিতে হইবে।

শক্তিমান ও শক্তি।

পূর্ব্বে যে নির্ব্বিকল্প অদ্বয় জ্ঞানতত্ত্বের কথা বলা হইল তাহা অনুমানের বিষয়মাত্র ; (Is a metaphysical abstraction) আমরা উহা ধারণা করিতে পারি না। শক্তির জ্ঞান ব্যতীত আমাদের পক্ষে শক্তিমানের ধারণা অসম্ভব। এই শক্তিই বিশেষণ (Attribute) শক্তিমান্ বিশেষ্য (Substance) শ্রীমদ্ভাগবতের মতে এই যে নির্ব্বিকল্প বস্তু ইহাই পরতত্ত্বসীমা নহে। সৎ, চিৎ, আনন্দই পরব্রহ্মের স্বরূপ স্বরূপ শক্তিই পরব্রহ্মের বিশেষণ, জীবশক্তি ঐ স্বরূপ শক্তির অনু বা বিভিন্নাংশ আর মায়াশক্তি উহার ছায়া। কথাটি বড়ই মূল্যবান্ বিশেষতঃ বৈজ্ঞানিক উদাহরণ প্রয়োগে এই কথাটি বড়ই আবশ্যক তাহা আমরা পরে দেখিব।

ত্রিবিধ পুরুষ।

পুরুষের যে লক্ষণ দেওয়া হইল, তাহা ত্রিবিধ পুরুষেরই লক্ষণ। শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ তাঁহার লঘুভাগবতামৃতের টীকায় বলিয়াছেন "ইত্থং ত্রয়াণাং পুরুষাণাং লক্ষণমিদং সিদ্ধম্।" পুরুষ এই কথাটি একটি সাপেক্ষ শব্দ (Relative term), প্রকৃতির সহিত সম্বন্ধযুক্ত হইলেই, তিনি 'পুরুষ' এই আখ্যা প্রাপ্ত হয়েন। বিশ্ব বিকশিত হইতেছে—সেই বিকাশশীল বিশ্বের নিকট শ্রীভগবানের স্বরূপ যে ভাবে প্রতিভাত হয়, তাহাই পুরুষ নামে পরিচিত। The Divine Life as it appears in relation to the universe unfolded into being.

আমাদের এই পুরুষাবতারত্রয়ের সহিত খ্রীষ্টানদিগের Three persons of the holy Trinityর কিছু কিছু সামঞ্জস্য আছে। ইরাংজিতে Person এই কথাটি লইয়া যেমন গোলমাল, আমাদের পুরুষ, এ কথাটিতেও তদ্রূপ। Persona কথার অর্থ মুখোস্ (Mask) সুতরাং ইংরাজী Person কথার অর্থ A phenomenal appearance with something real behind. একটি প্রতিভাসিক মূর্ত্তি বা প্রকাশ, যাহার পশ্চাতে সেই নিত্য বস্তু আছে। শ্রীরূপ গোস্বামী মহোদয় তাঁহার কারিকায় যাহা বলিয়াছেন তাহাতে এই তত্ত্ব সুন্দররূপে পরিস্ফুট হইয়াছে। তিনি প্রথমতঃ বলিলেন পরমেশ্বরের অংশরূপ অর্থাৎ একেবারে ঠিক অংশ নহে, অংশের মত। The Divine life as it appears relatively to the manifested universe.

শ্রীলঘুভাগবতামৃত পুরুষত্রয়ের পূর্ব্বোক্ত সাধারণ লক্ষণ দেওয়ার পর সাত্বত তন্ত্রের বচন উদ্ধার করিয়া পুরুষের ত্রিবিধ ভেদ বর্ণনা করিয়াছেন।

> বিষ্ণোস্তু ত্রীণি রূপাণি পুরুষাখ্যান্যথো বিদুঃ।
> একন্তু মহতঃ স্রষ্টৃ দ্বিতীয়ং ত্বণ্ডসংস্থিতং।
> তৃতীয়ং সর্ব্বভূতস্থং তানি জ্ঞাত্বা বিমুচ্যতে॥

বিষ্ণুর পুরুষ নামক ত্রিবিধরূপ শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে। প্রথম মহত্ত্বের সৃষ্টিকর্ত্তা, দ্বিতীয় অণ্ডসংস্থিত, তৃতীয় সর্ব্বভূতস্থ ; তাঁহাদিগকে জানলে সংসার নিবৃত্তি হয়।

শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের টীকায় বলিতেছেন, এই যে বিষ্ণু যাঁহার ত্রিবিধ রূপের কথা বলা হইতেছে, তিনি কে ? বিষ্ণোরিতি স্বয়ংরূপস্য অর্থাৎ স্বয়ংরূপের। শ্রীলঘুভাগবতামৃতে বলা হইয়াছে।

অনন্যাপেক্ষি যদ্রূপং স্বয়ংরূপ স উচ্যতে

অর্থাৎ অন্যকে অপেক্ষা না করিয়াই যে রূপ প্রকট হয় তাহার নাম স্বয়ংরূপ।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে পূর্ব্বে যে বচন উদ্ধার করা হইয়াছে তাহার সাহায্যে বুঝিতে হইলে এখানে বিষ্ণু বলিতে মূল সঙ্কর্ষণ বুঝিতে হইবে। সুতরাং মূল সংকর্ষণ ও স্বয়ংরূপ কি প্রকারে এক, তাহা বিবেচ্য।

শ্রীবলদেবের টীকাতেই পাওয়া যায় যিনি মহতের স্রষ্টা তিনিই প্রকৃতির অন্তর্যামী সঙ্কর্ষণরূপ, ইনি প্রথমপুরুষ। দ্বিতীয়, চতুর্ম্মুখের অন্তর্যামী প্রদ্যুম্নরূপ আর তৃতীয় সর্ব্বজীবের অন্তর্যামী অনিরুদ্ধরূপ।

এইবার প্রথম পুরুষ। শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশ স্কন্ধের চতুর্থ অধ্যায়ে তৃতীয় শ্লোক শ্রীলঘুভাগবতামৃতে উদ্ধৃত হইয়াছে।

ভূতৈর্যদা পঞ্চভিরাত্মসৃষ্টৈঃ পুরং বিরাজং বিরচয্য তস্মিন্।
স্বাংশেন বিষ্টঃ পুরুষাবিধানমবাপ নারায়ণ আদিদেবঃ॥

বলদেব বিদ্যাভূষণের টীকানুযায়ী ইহার অর্থ—আদিদেব নারায়ণ স্বয়ংপ্রভু যৎকালে, স্ব-স্বরূপ সঙ্কর্ষণ কর্ত্তৃক পঞ্চভূত

দ্বারা নির্ম্মিত ব্রহ্মাণ্ডরূপ পুরীতে স্বাংশ প্রদ্যুম্নরূপে প্রবেশ করেন তৎকালে তিনি "পুরুষ" এই অভিধান বা নাম প্রাপ্ত হইয়াছেন।

ব্রহ্ম-সংহিতায় আছে :—

তস্মিন্নাবিবরভূল্লিঙ্গে মহাবিষ্ণুর্জগৎপতিঃ
সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ ইত্যাদি—
নারায়ণঃ স ভগবান্ আপস্তস্মাৎ সনাতনাৎ
আবিরাসন্ কারণার্ণোনিধিঃ সঙ্কর্ষণাত্মকঃ।
যোগনিদ্রাং গতস্তস্মিন্ সহস্রাংশঃ স্বয়ং মহান্।
তদ্রোমবিলজালেষু বীজং সঙ্কর্ষণস্য চ।
হৈমান্যণ্ডানি জাতানি মহাভূতবৃতানি তু॥

সেই লিঙ্গে জগৎপতি মহাবিষ্ণু আবির্ভূত হইয়াছিলেন। যে পুরুষ সহস্রশীর্ষা।

লিঙ্গমত্র স্বয়ংরূপস্যাঙ্গভেদ উদীরিতঃ।

লিঙ্গ বলিতে স্বয়ং রূপের অঙ্গভেদ বুঝায়।

সেই ভগবান্ আদিপুরুষ নারায়ণ। তাঁহা হইতে পথমতঃ জলের উৎপত্তি হয়, সেই জলকে কারণার্ণোনিধি এবং সঙ্কর্ষণ হইতে উৎপন্ন বলিয়া সঙ্কার্ষণাত্মক বলে। যাঁহারা প্রদ্যুম্নরূপ হইতে অসংখ্য অংশ বাহির হয়। মহাবিষ্ণু কারণার্ণবে যোগনিদ্রায় মগ্ন হইয়া থাকেন। কারণার্ণবে শায়িত সঙ্কর্ষণ নামক আদি পুরুষের প্রত্যেক লোমকূপে জীব নামক চিৎপরমাণুসমূহ নিহিত থাকে তিনি সেই চিৎপরমাণুসমূহ প্রকৃতিতে আধান করেন। তাহার পর অপঞ্চীকৃত মহাভূত দ্বারা আবৃত হিরণ্যবর্ণ ব্রহ্মাণ্ড-সমূহের উৎপত্তি হয়।

এইবার দ্বিতীয় পুরুষ। ব্রহ্ম-সংহিতায় আছে:—

প্রত্যেকমেবমেকাংশাদেকাংশাদ্‌বিশতি স্বয়ম্‌।

এইরূপে স্বয়ংপ্রভু, প্রদ্যুম্নরূপ এক এক অংশ আবির্ভাবিত করিয়া পৃথক্‌ পৃথক্‌ প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ডে প্রবেশ করিলেন।

দ্বিতীয় পুরুষের বর্ণনায় শ্রীরূপ গোস্বামী মহোদয় সংক্ষেপে মহাভারতের নারায়ণোপাখ্যানের উল্লেখ করিয়াছেন। শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ মহাশয় তাঁহার টীকায় মহাভারতের কয়েকটী শ্লোকও উদ্ধার করিয়াছেন। মহাভারতের এই নারায়ণোপাখ্যান এবং নারদের শ্বেতদ্বীপযাত্রা বিবিধ কারণে অনেকেরই পরিচিত। সেই স্থানে চতুর্ব্যূহ-উপাসনার প্রসঙ্গ আছে। আমরা নিম্নে সেই স্থানের কয়েকটী কথা লিপিবদ্ধ করিলাম।

দেবর্ষি নারদ শ্বেত-মহাদ্বীপে গমন করিয়া শ্বেতবর্ণ চন্দ্র-প্রতিম মানবগণকে দর্শন করিলেন। এই সমুদয় ভাগ্যবান্‌ মানবগণকে পূজা করিয়া নারদ জপপরায়ণ হইলেন এবং ভগবানের স্তুতি করিতে লাগিলেন। বিশ্বরূপধারী ভগবান্‌ নারদকে দর্শন দিলেন। নারদ দেখিলেন ভগবান্‌ বিচিত্র-বর্ণযুক্ত, সহস্র নয়ন, শতশীর্ষ, সহস্রপাৎ, সহস্রোদর এবং সহস্রবাহু। ভগবান্‌ নারদকে বলিলেন "ঐকান্তিক ব্যতিরেকে কেহই আমাকে দেখিতে পায় না, তুমি ঐকান্তিকের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, এই জন্য আমার দর্শন লাভ করিলে। * * * একমাত্র শাশ্বত পুরুষ বাসুদেব-ব্যতিরেকে এই জগতে স্থাবর জঙ্গম কোন পদার্থই নিত্য নহে। মহাবল বাসুদেবে সর্ব্বভূতের আত্মভূত। * * ভগবানের ব্যূহবিশেষ বিশ্ববিধারক সঙ্কর্ষণ ও শেষ নামে সেই প্রভু সংখ্যাত। যিনি স্বকীয় কর্ম্মদ্বারা তাঁহা হইতে জীবন্মুক্তত্ব লাভ করেন এবং প্রলয়কালে সমস্ত ভূত যাঁহাতে বিলীন হয়, তিনি সমস্ত ভূতের মন, প্রদ্যুম্ন নামে পরিচিত। সঙ্কর্ষণ হইতে যিনি প্রসূত হন, তিনিই

কর্ত্তা, কারণ ও কার্য্য-স্বরূপ, আর প্রদ্যুম্ন হইতে এই স্থাবরজঙ্গমাত্মক সমস্ত জগৎ সম্ভূত হয়, ইহারই নাম অনিরুদ্ধ ইনিই ঈশ্বর এবং সর্ব্বকার্য্যে ব্যক্ত হইয়া আছেন ভগবান বাসুদেব যিনি ক্ষেত্রজ্ঞ ও নির্গুণ স্বরূপে উক্ত হইয়াছেন, তাঁহাকে সঙ্কর্ষণ অর্থাৎ জীব জানিবে। সঙ্কর্ষণ হইতে প্রদ্যুম্ন উৎপন্ন হন, ইঁহাকেই মন বলা যায়। প্রদ্যুম্ন হইতে যে অনিরুদ্ধ সম্ভূত হন, তিনিই অহঙ্কার এবং তিনিই ঈশ্বর।

চতুর্ব্ব্যূহ।

ভগবান্ তাঁহার বাসুদেব সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ এই মূর্ত্তিচতুষ্টয়ের রহস্য বর্ণনা করিয়া পরিশেষে বলিলেন "আমি সহস্র যুগের পর জগৎ সংহার করিব। চরাচর ভূতসমুদয়কে আমাতে অবস্থাপিত করিয়া একাকী মহাবিদ্যার সহিত বিহার করিব। পরিশেষে মহাবিদ্যাদ্বারা সমস্ত জগৎ সৃজন করিব।"

"অস্মন্মূর্ত্তিশ্চতুর্থী যা সাসৃজচ্ছেষমব্যয়ম্।
সহি সঙ্কর্ষণঃ প্রোক্তঃ প্রদ্যুম্নং সোঽপ্যজীজনৎ।
প্রদ্যুম্নাচ্চানিরুদ্ধোঽহং সর্গো মম পুনঃ পুনঃ
অনিরুদ্ধাত্তথা ব্রহ্মা তন্নাভিকমলোদ্ভবঃ॥"

যিনি আমার চতুর্থী মূর্ত্তি, তিনিই অব্যয় শেষকে সৃজন করিয়াছেন, সেই শেষকেই সঙ্কর্ষণ কহে. সঙ্কর্ষণই প্রদ্যুম্নের উৎপাদন করেন, প্রদ্যুম্ন হইতে অনিরুদ্ধের উৎপত্তি হয়। এইরূপে পুনঃ পুনঃ আমি সৃষ্টি করিতেছি। অনিরুদ্ধের নাভি কমল হইতে ব্রহ্মার উৎপত্তি।

শ্রীরূপ গোস্বামী শ্রীলঘু ভাগবতামৃতে বলিয়াছেন :—

গর্ভোদকশয়ং পদ্মনাভোঽসাবনিরুদ্ধকঃ।
ইতি নারায়ণোপাখ্যামনুক্তং মোক্ষধর্ম্মকে।
সোঽয়ং হিরণ্য-গর্ভস্য প্রদ্যুম্নত্বে নিয়ামকঃ॥

যিনি গর্ভোদকশায়ী পদ্মনাভ তিনিই অনিরুদ্ধ, মোক্ষধর্ম্মে নারায়ণোপাখ্যানে এইরূপ কথিত হইয়াছে। সে স্থানে এইরূপ বুঝিতে হইবে যে স্বয়ং প্রভু প্রদ্যুম্নরূপে হিরণ্যগর্ভের (ব্রহ্মার) নিয়ামক অর্থাৎ জনক বা অন্তর্যামী।

মহাভারতে নারায়ণোপাখ্যানে অনিরুদ্ধকেই ব্রহ্মার জনক বলা হইয়াছে।

অনিরুদ্ধো হি লোকানাং মহানাত্মেতি কথ্যতে।
যোঽসৌ ব্যক্তত্বমাপন্নো নির্ম্মমেচ পিতামহম্॥

অনিরুদ্ধই লোক-সকলের মহান্ আত্মা, তিনিই ব্যক্ত হইয়া লোকপিতামহ ব্রহ্মাকে সৃষ্টি করেন।

কাজেই অনিরুদ্ধ হইতে ব্রহ্মার জন্ম কিম্বা প্রদ্যুম্ন হইতে ব্রহ্মার জন্ম সে সম্বন্ধে সন্দেহের উদয় হইতেছে। শ্রীরূপ গোস্বামী মহাশয় তাহার মীমাংসা করিয়া দিলেন। প্রদ্যুম্ন হইতেই ব্রহ্মার জন্ম।

এইবার তৃতীয় পুরুষের কথা, শ্রীলঘুভাগবতামৃত বর্ণনা করিতেছেন :—

অথ যত্তু তৃতীয়ং স্যাদ্‌রূপং তচ্চাপ্যদৃশ্যত।
'কেচিৎ স্বদেহান্তর' ইতি দ্বিতীয় স্কন্ধপদ্যতঃ॥

যিনি তৃতীয় পুরুষ, তাঁহার রূপ শ্রীমভগবতের দ্বিতীয় স্কন্ধের 'কেচিৎ স্বদেহান্তর' এই পদ্যে দেখা যাইবে। আমরা শ্রীমদ্ভাগবতের এই অংশ পরে আলোচনা করিব।

আমরা পূর্ব্বে দেখিয়াছি যিনি তৃতীয় পুরুষ, তিনি ক্ষীরোদকশায়ী অনিরুদ্ধ এবং তিনিই সর্ব্বভূতস্থ। আবার যিনি তৃতীয় পুরুষ, তিনিই গুণাবতার শ্রীবিষ্ণু সুতরাং গুণাবতারের তত্ত্ব আলোচনা করা প্রয়োজন। প্রথম ত্রিগুণের কথা আলোচিত হইতেছে।

ত্রিগুণের কথা।

আর্য্য ঋষিগণের মতে এই পরিদৃশ্যমান জগৎ সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ, এই ত্রিগুণের ক্রিয়া মাত্র। "সত্ত্বং রজস্তম্ ইতি এবৈব প্রকৃতিঃ সদা।" (সাংখ্যদর্শন) সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ, সম্মিলিত এই তিন পদার্থই প্রকৃতি। প্রাচীন ভারতের সমাজ-বিজ্ঞান, জীবন-বিজ্ঞান, নীতিশাস্ত্র, ব্যবহার-শাস্ত্র এমন কি মুক্তি, জন্মান্তর, কর্ম্মফল-ভোগ প্রভৃতি যাবতীয় আলোচনা এ ত্রিগুণ-তত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত। বিজ্ঞানভিক্ষু সাংখ্যসারে বলিয়াছেন "সত্ত্বাদিত্রয়ঞ্চ পুরুষোপকরণত্বাৎ পুরুষ বন্ধকত্বাচ্চ গুণশব্দেনোচ্যতে" এই উক্তি হইতে আমরা গুণের দুই প্রকার অর্থ পাই। প্রথমতঃ কোন পদার্থের লক্ষণ বা তাহার অন্তর্গত শক্তি গুণ শব্দ বাচ্য, ইংরাজীতে যাহাকে attribute বা quality বলে। যেমন অগ্নির দাহিকা শক্তি, অগ্নির গুণ, জলের শৈত্য জলের গুণ। ইহাতে পদার্থের ধর্ম্মও বলিতে পারা যায়। ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শনে গুণ বলিলে এইরূপই বুঝায়। কিন্তু সাংখ্য দর্শনে গুণ বলিতে পদার্থ বা দ্রব্য হইতে পৃথক বা তদতিরিক্ত কিছুই বুঝায় না। সংসারে আমরা ভৌতিক শক্তির স্বতন্ত্র সত্ত্বা দেখিতে পাই না, পদার্থই আমাদের জ্ঞানের বিষয়, পদার্থের গতি বা পরিবর্ত্তন দেখিয়া আমরা শক্তির অস্তিত্ব ও ক্রিয়া অনুমান করিয়া থাকি। পদার্থের অতিরিক্ত শক্তি গুণ নহে। ত্রিগুণের সমবায়েই প্রকৃতি, ত্রিগুণ ব্যতীত প্রকৃতির আর কিছুই নাই। বিজ্ঞানভিক্ষু বলিলেন পুরুষের উপকরণও গুণ, পুরুষের বন্ধন-রজ্জুও গুণ। এই ত্রিগুণই পুরুষকে বা আত্মাকে অভিভূত বা রজ্জুর ন্যায় আবদ্ধ করে, এবং তাহাতেই সৃষ্টি বা সংসার সম্ভব হয়।

শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম স্কন্ধের দ্বিতীয় অধ্যায়ের ত্রয়োবিংশতি শ্লোক এই :—

সত্ত্বং রজস্তম ইতি প্রকৃতের্গুণাস্তৈ
যুক্তঃ পরঃ পুরুষ এক ইহাস্য ধত্তে ॥

স্থিত্যাদয়ে হরি-বিরিঞ্চি-হরেতি সংজ্ঞাঃ
শ্রেয়াংসি তত্র খলু সত্ত্বতনোর্নৃণাংস্যুঃ ॥

গুণাবতার। এই শ্লোকের "পরঃ পুরুষঃ" কথার অর্থ গর্ভোদকশয়ঃ, টিকাকার এইরূপ বলিয়াছেন। তাহা হইলে এই শ্লোকের অর্থ এইরূপ। গর্ভোদক-শায়ী দ্বিতীয় পুরুষ বা প্রদ্যুম্ন, পালন, সৃষ্টি ও সংহারের জন্য সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ, প্রকৃতির এই তিনগুণে যুক্ত হইয়া অর্থাৎ পৃথক পৃথক রূপে এই ত্রিগুণের অধিষ্ঠাতা হইয়া হরি, ব্রহ্মা ও হর এই পৃথক পৃথক নাম গ্রহণ করেন। ইহার মধ্যে জীবের যাহা শুভফল বা শ্রেয়ঃ, তাহা সত্ত্বতনু বা সত্ত্বগুণের অধিষ্ঠাতা যে বিষ্ণু তাঁহার দ্বারাই হইয়া থাকে।

শ্রীরূপ গোস্বামী গুণাবতার বুঝাইবার জন্য শ্রীমদ্ভাগবতের এই শ্লোক উদ্ধার করিয়া তাহার নিম্নরূপ কারিকা করিলেন :—

যোগো নিয়ামকতয়া গুণৈঃ সম্বন্ধ উচ্যতে।
অতঃ স তৈর্ন যুজ্যেত তত্র স্বাংশ পরস্য যঃ॥

ইহার অর্থ এই। স্বয়ং প্রভুর স্বাংশ গর্ভোদকশায়ী প্রদ্যুম্ন হইতে বিষ্ণু, ব্রহ্মা ও রুদ্র, স্থিতি, সৃষ্টি ও প্রলয়ের জন্য গুণে অন্বিত হইয়া গুণাবতার হইলেন। কিন্তু গুণে অন্বিত হইলেন বলিয়া গুণের সহিত তাঁহার সম্বন্ধ হইল না। শ্রীমদ্ভাগবতের দ্বিতীয় স্কন্ধের সপ্তম অধ্যায়ের ষট্‌চত্বারিংশৎ (৪৬) শ্লোকে কথিত হইয়াছে যে মায়া তাঁহার অভিমুখে অবস্থিতি করিতে লজ্জিত হইয়া দূরে প্রস্থান করে—

মায়া পরৈত্যভিমুখে চ বিলজ্জমানা।

সুতরাং গুণাবতার মায়ায় লিপ্ত বা বাধ্য নহেন। এই জন্যই কারিকায় বলা হইল, নিয়ামক অর্থাৎ প্রবর্ত্তক বা পরিচালক (Regulator) রূপে গুণের সহিত যে সম্বন্ধ তাহারই নাম যোগ,

সুতরাং সেই পুরুষ কখনই গুণের সহিত লিপ্ত হন না। তাঁহারা স্বেচ্ছায় গুণকে গ্রহণ করেন। বলদেব বিদ্যাভূষণ টিকায় বলিতেছেন—স্বেচ্ছাগৃহীতেন রজসা তমসা চ যুক্তঃ পরেশো বিরিঞ্চো হরশ্চ ভবতি. পাষণ্ড ধর্ম্মৈনৈব বুদ্ধঃ, কদাচারেণৈব ঋষভশ্চ। বস্তুতস্তু তত্তল্লেপো নাস্তি, পরেশত্বাৎ। অর্থাৎ স্বেচ্ছায় গৃহীত রজঃ বা তমঃ গুণের দ্বারা পরেশ ব্রহ্মা ও শিব হইলেন, স্বেচ্ছা-গৃহীত কদাচারের দ্বারা ঋষভদেব হইলেন; কিন্তু বস্তুতঃ তাঁহাদের ঐ ঐ গুণের লেপ নাই কারণ তাঁহারা পরেশ। এই ত্রিগুণের অধিষ্ঠাতার মধ্যে "মুক্তি প্রদাতা সর্ব্বেষাং বিষ্ণুরেব সংশয়" বিষ্ণুই সকলের মুক্তিদাতা, ইহাতে সন্দেহ নাই, হরি বংশে শ্রীশিব এই কথা বলিয়াছেন। এখানে অবশ্য নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মে সাযুজ্য মুক্তি নহে। এখানে মুক্তির অর্থ করিবেন স্বরূপে অবস্থান। বিষ্ণু সত্ত্ব গুণের অধিষ্ঠাতা ও নিয়ামক, কিন্তু তাঁহাতে সত্ত্ব গুণের লেপ নাই—

সঙ্কল্পেনৈব তন্নিয়মনমাত্রকৃৎ (বলদেব) সঙ্কল্পের দ্বারা তাহার নিয়মন মাত্র করিয়া থাকেন, এই কারণেই বিষ্ণু হইতেই জীবের পরম শ্রেয়ঃ সাধিত হইয়া থাকে।

এই কারণেই বামন-পুরাণে কথিত হইয়াছে :—

ব্রহ্মা বিষ্ণ্বীশরূপাণি ত্রীণি বিষ্ণোর্মহাত্মনঃ
ব্রহ্মণি ব্রহ্মরূপঃ স শিবরূপঃ শিবে স্থিতঃ।
পৃথগেব স্থিতো দেবো বিষ্ণুরূপী জনার্দ্দনঃ ॥

মহাত্মা বিষ্ণুর ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও ঈশ এই ত্রিরূপ। ব্রহ্মায় ব্রহ্ম-রূপ, শিবে শিবরূপ আর বিষ্ণুরূপী দেব জনার্দ্দন পৃথক হইয়াই অবস্থিত।

এই বচন উদ্ধার করিয়া শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ মহাশয় এইরূপ মীমাংসা করিয়াছেন "যদ্যপি গুণাধিষ্ঠাতা পর এক এব,

তথাপি অধিষ্ঠেয়গুণসম্বন্ধকৃতেন আবরণাবরণরূপেণ তারতম্যে-নাধিষ্ঠাতরি তস্মিংস্তদস্তীতি 'সত্ত্বম্' ইত্যাদি পদ্যান্তরমুক্তম্—"

* যদিও গুণের অধিষ্ঠাতা যে পরমেশ্বর তিনি এক অর্থাৎ তিন গুণের অধিষ্ঠান হেতু ত্রিধা প্রকাশিত হইলেও স্বরূপে এক, কিন্তু যে গুণে অধিষ্ঠিত হইতেছেন সেই গুণত্রয়ের মধ্যে প্রভেদ রহিয়াছে। সেই প্রভেদ কি ? কোন গুণে আবরণ অধিক অনাবরণ অর্থাৎ প্রকাশ অল্প, আর কোন গুণে প্রকাশ অধিক আবরণ অল্প, এই তারতম্যের জন্য অধিষ্ঠাতাতেই তারতম্য হইতেছে। এই কথাই শ্রীমদ্ভাগবতের নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকে ব্যক্ত হইয়াছে—

পার্থিবাদ্ দারুণো ধূমস্তস্মাদগ্নিস্ত্রয়ীময়ঃ।
তমসস্তু রজস্তস্মাৎ সত্ত্বং যদ্ ব্রহ্মদর্শনম্॥ ভা ১।২।২৪

পার্থিব অর্থাৎ প্রবৃত্তি ও প্রকাশরহিত জড়ভাবাপন্ন কাষ্ঠ অপেক্ষা ধূম শ্রেষ্ঠ, ধূম অপেক্ষা ত্রয়ীময়ী অর্থাৎ বেদোক্ত যজ্ঞ-সাধক অগ্নি শ্রেষ্ঠ। এই উদাহরণে দেখা যাইতেছে কাষ্ঠে অপ্রবৃত্তি, ধূমে কিঞ্চিৎ প্রবৃত্তি, আর অগ্নিতে পূর্ণ প্রবৃত্তি রহিয়াছে, ফলে কাষ্ঠে যজ্ঞের আশা নাই, ধূমে কিঞ্চিৎ আশা আছে আর অগ্নিতে যজ্ঞের পরিপূর্ণ আশা বিদ্যমান। সেইরূপ তমোগুণের স্বভাব মূঢ়, রজোগুণের স্বভাব চল, আর স্বত্বগুণের স্বভাব প্রকাশ, তাহার ফলে তমঃ ও রজঃ গুণের সাহায্যে ব্রহ্ম দর্শন হয় না, তমঃগুণে আদৌ আশা নাই, রজঃগুণে কিঞ্চিৎ আশা আছে, সত্ত্বগুণে ঐ আশার পূর্ণতা।

এই বিচারণা ও সিদ্ধান্ত ভাল করিয়া না বুঝিলে গুণাবতার বিষ্ণু সর্ব্বভূতস্থ ও তৃতীয় পুরুষাবতার কেন, এবং ভাগবতধর্ম্মই বা যুগধর্ম্ম কেন, তাহা বুঝিতে পারা যাইবে না কাজেই এই প্রসঙ্গ একটু ভাবিয়া দেখা যাউক। পূর্ব্বে যাহা বলা হইল তাহাতে জ্ঞানহীন ও সাম্প্রদায়িক ভাবে মূঢ়তা-প্রাপ্ত কেহ বলিতে

পারেন যে শিবকে ছোট করিলেন, এবং বিষ্ণুর উপাসনার মাহাত্ম্য ব্যাখ্যা করিয়া বৈষ্ণবের দলপুষ্টির চেষ্টা করা হইল। কোন কোন ব্যাখ্যাতা এই তত্ত্বাংশগুলি এমন ভাবে বুঝেন ও লোককে বুঝাইয়া থাকেন যে পূর্ব্বোক্ত অভিযোগ অসঙ্গত নহে। কিন্তু প্রকৃত তাৎপর্য্য, এখানে প্রকৃতির গুণের কথা লইয়া আলোচনা হইতেছে। আমাদের প্রত্যেকের মধ্যে এবং বিশ্ব-ব্যবস্থার সর্ব্বত্রই ত্রিগুণের খেলা হইতেছে। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা চতুর্দ্দশ অধ্যায়ে এই ত্রিগুণের খেলা বর্ণনা করিয়াছেন—সত্ত্বগুণ নির্ম্মল, প্রকাশক ও অনাময়, ইহা জীবকে সুখ ও জ্ঞানের সঙ্গে বন্ধন করে। রজঃগুণ আসক্তি, তৃষ্ণা ও ভোগ বাসনা জাগাইয়া দেয় ও কর্ম্মের সহিত বন্ধন করে। আর তমগুণ জ্ঞানশূন্য ও জড়স্বভাব করিয়া প্রমাদ, আলস্য ও নিদ্রার সহিত বন্ধন করে। সুখ, কর্ম্মচাঞ্চল্য, ও প্রমাদ ইহাই যথাক্রমে সত্ব, রজঃ ও তমোগুণের ফল। আমাদের সাধনার যাহা আদর্শ তাহা গীতার নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকে বিবৃত হইয়াছে।

গুণানেতানতীত্য ত্রীন্ দেহী দেহ-সমুদ্ভবান্।
জন্মমৃত্যুজরাদুঃখৈর্বিমুক্তোঽমৃত মশ্নুতে॥

দেহীকে দেহ-সমুদ্ভূত এই ত্রিবিধ গুণই অতিক্রম করিতে হইবে, তাহা হইলেই তিনি জন্ম জরা ও মৃত্যুকে অতিক্রম করিয়া অমৃত লাভ করিবেন।

সত্বগুণ ও তমোগুণ।

ত্রিগুণকে অতিক্রম করা অনেক পরের কথা, এখন কোন্ গুণকে অবলম্বন করিয়া অগ্রসর হইব, ইহাই প্রশ্ন এবং তাহার উত্তর সত্বগুণকে অবলম্বন করিয়া আমাদের অগ্রসর হইতে হইবে। সত্বগুণকে লক্ষরূপে সম্মুখে রাখিয়া তাহার বৃদ্ধি ও বিকাশের জন্য যদি চেষ্টা করা না যায় তাহা হইলে

একথা অতি সুনিশ্চিত যে আমাদিগকে তমোগুণে ডুবিয়া যাইতে হইবে।

বর্ত্তমান সময়ে আমাদের প্রকৃত অবস্থা কি? আমরা তমোগুণে ডুবিয়া যাওয়াকেই যেন ধর্ম্ম সাধনা বলিয়া বিবেচনা করি। একটি ব্যাপার এই যে দুই দিকের চরমসীমা দেখিতে প্রায় একরূপ। The two extremes are alike ; the extreme positive and the extreme negative are always similar. বিজ্ঞানের আলোচনায় ইহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়, আলোকের স্পন্দন যখন অত্যন্ত মৃদু, তখন আমরা দেখিতে পাই না, আবার এই স্পন্দন যখন অতিমাত্রায় ক্ষিপ্র তখনও দেখিতে পাওয়া যায় না। শব্দ-সম্বন্ধেও ঠিক তাই, যদিও ইহাদের প্রভেদ পাতাল আর আকাশ।

> ঊর্দ্ধং গচ্ছন্তি সত্বস্থা মধ্যে তিষ্ঠন্তি রাজসাঃ।
> জঘন্যগুণবৃত্তিস্থা অধোগচ্ছন্তি তামসাঃ॥

সত্বগুণান্বিত মানব উন্নতির পথে অগ্রসর, রাজস লোক মধ্যে অবস্থিত, আর জঘন্যগুণবৃত্তিস্থ তামস ব্যক্তি অধঃপতন লাভ করে। সুতরাং সত্বগুণ ও তমোগুণের মধ্যে প্রভেদ স্বর্গ ও নরক, আকাশ আর পাতাল! কিন্তু ইহারা দুই চরম সীমা বলিয়াই উভয়ের মধ্যে একটা বাহ্য সাদৃশ্য রহিয়াছে। অতি সহজ উদাহরণেই বুঝিতে পারা যাইবে। একজন লোক অন্যায় পূর্ব্বক আমার উপর অত্যাচার করিতেছে, আমি নীরবে সহ্য করিতেছি। আমি ভাল করিতেছি, না মন্দ করিতেছি? বাহির হইতে কিছুই বলা যায় না, আমার ভিতরে প্রবেশ করিয়া আমার হৃদয়বৃত্তি ও মনোবৃত্তির প্রকৃত অবস্থা পর্য্যালোচনা না করিলে কিছুই বলা যায় না। মনে করুন আমি দুর্ব্বল, অকর্ম্মণ্য ও অলস, মনে হইতেছে একে অত্যাচার করিতেছে, আবার যদি প্রতিবাদ করি তাহা

হইলে আরও অত্যাচার করিবে, এ অবস্থায় নিরুপায় হইয়া নিশ্চেষ্ট ভাবে সহ্য করিতে লাগিলাম, আর মুখে বলিতে লাগিলাম, ক্ষমা করিলাম, ক্ষমা করাই সাধুর স্বভাব। এই যে ক্ষমা, ইহা কি সত্ত্বগুণের ক্ষমা? না, ইহা তমোগুণের দুর্ব্বলতা ও মূঢ়তা, ইহা উন্নতির পথ নহে, অধঃপতনের পথ। যে ব্যক্তি শক্তিশালী, ইচ্ছা করিলেই অন্যায় অত্যাচারীকে অনায়াসে বিধ্বস্ত করিতে পারে, কিন্তু তাহা করিল না, সে ব্যক্তির ক্ষমা অবশ্য সাত্ত্বিক।

মানুষকে সত্ত্বগুণে আরোহণ করিতে হইবে, ইহা প্রাচীন আর্য্য ঋষিগণের উপদেশ, কিন্তু আমরা মূঢ়তাকে ধার্ম্মিকতা মনে করি, উন্মাদরোগকে ভাবুকতা মনে করি। এই সত্ত্বগুণের উপাসনাই বিষ্ণুর উপাসনা। যিনি মাতৃরূপে আদ্যাশক্তির উপাসনা করেন, তিনি যদি সত্ত্বগুণের উপাসনা করেন তাহা হইলে বৈষ্ণবী শক্তির উপাসনা করিলেন। নামে কিছু আসে যায় না, বৈষ্ণবী শক্তির উপাসনাই বিষ্ণু উপাসনা। বিষ্ণু উপাসনা করি বলিলেই বিষ্ণু উপাসনা হয় না। একদিকে রজঃগুণে সমুদয় গড়িয়া উঠিতেছে আর একদিকে তমোগুণে ভাঙ্গিয়া যাইতেছে, আর এই উভয়ের মধ্যে সামঞ্জস্যরূপে সত্ত্বগুণ বা তাহার অধিষ্ঠাতা বিষ্ণু তিনি বিরাজ করিতেছেন। সুতরাং প্রকৃত প্রস্তাবে বিষ্ণুর উপাসনা কোন বিশেষ রকমের বেশভূষা ধারণেই হইবে না, কোন গুরুর নিকট একটা মন্ত্র লইলেও হইবে না, কোন নির্দ্দিষ্ট দিনে উপবাস করিলেও হইবে না, কোন নির্দ্দিষ্ট তীর্থে বাস করিলেও হইবে না। কাহারও কাহারও পক্ষে এই বেশভূষা-ধারণ বা মন্ত্রগ্রহণ বা উপবাস বা তীর্থযাত্রা উপায় হইতে পারে, কিন্তু প্রকৃত বৈষ্ণব হইতে হইলে জীবনকে সামঞ্জস্যে আনিয়া নিজের ইচ্ছাশক্তি, ক্রিয়াশক্তি ও জ্ঞান-শক্তিকে বিশ্বস্থিতির ও বিশ্বের অভ্যুদয়ে প্রতিষ্ঠিত করিতে

বিষ্ণুউপাসনা।

হইবে। যতদিন গুণের রাজ্যে অর্থাৎ প্রাকৃত জগতে থাকিব ততদিন এই গুণাবতার বিষ্ণুর দ্বারা বিশ্বে যে কার্য্য হইতেছ সর্ব্বতোভাবে অর্থাৎ দেহ মন ও প্রাণ দিয়া তাহাই সাধন করিব। ইহাই বৈষ্ণব ধর্ম্ম। আমি 'আমি' হইয়াছি, এই বিষ্ণুশক্তির বা সর্ব্বভূতস্থ তৃতীয় পুরুষাবতার অনিরুদ্ধের জাগরণের দ্বারা। প্রস্তর পড়িয়া রহিয়াছে, সে বোঝেনা ও জানে না 'আমি, আমি' অর্থাৎ আমি একজন। আমি ছিলাম, আমি আছি ও আমি থাকিব। সে জানেনা যে সে নৈতিক জ্ঞান সম্পন্ন, বুদ্ধি বিবেচনা সম্পন্ন ও দায়িত্ব-বোধ সম্পন্ন একজন স্বতন্ত্র কর্ত্তা ও জ্ঞাতা। 'স্বধর্ম্ম' বলিয়া একটা দায়িত্ব আছে সেই দায়িত্ব পালন করাই তাহার মঙ্গল আর অপালন করা অমঙ্গল। সে স্বকর্ম্ম-ফলভুক্। সে দৈহিক, মানসিক বা আধ্যাত্মিক যে সমুদয় শক্তি পাইয়াছে সে সমুদয় শক্তি তাহাকে বিবেচনা পূর্ব্বক দেবতার উদ্দেশে ত্যাগ করিতে হইবে। এই বোধ প্রস্তবের নাই, উদ্ভিদের নাই, পশুর নাই, মানুষে আসিয়াই ইহার প্রথম উন্মেষ, এই উন্মেষিত জ্ঞান বা আত্মবোধ ক্রমে ক্রমে বিকশিত করিতে হইবে। এই আত্মবোধের উন্মেষের নামই তৃতীয় পুরুষাবতার বা অনিরুদ্ধের আবির্ভাব। এই অনিরুদ্ধই আবার সত্বগুণের অবতার বিষ্ণু।

রায় রামানন্দের সঙ্গে যখন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কথোপকথন হয় তখন প্রথমেই রায় রামানন্দ বর্ণাশ্রমের কথা বলিলেন আর বলিলেন যে বর্ণাশ্রমাচারের যে অনুবর্ত্তন তাহারই নাম বিষ্ণুর আরাধনা, বিষ্ণুর আরাধনার পর কৃষ্ণে কর্ম্মার্পণ, তাহার পর স্বধর্ম্মত্যাগ।

বিষ্ণুর আরাধনা করিতে গেলে প্রত্যেক ব্যক্তিকে সমাজে বা গর্ভোদকশায়ীর বিরাট্ ও স্থূল দেহে নিজের স্থান কোথায় তাহা নির্দ্ধারণ করিতে হইবে। প্রাচীন কালে আমাদের আর্য্য-সমাজ

যখন সুব্যবস্থায় ছিল, তখন আমার স্থান কোথায়, তাহা নির্দ্ধারণ করিবার জন্য আমাকে চিন্তা করিতে হইত না। আমার জন্মের দ্বারা আমার কর্ম্ম, অধিকার ও সামাজিক স্থান নির্দ্ধারিত হইত। এখন আর তাহা হইবার উপায় নাই। এখন কলিযুগ চলিতেছে, কলির অর্থ কলহ অর্থাৎ এখন পৃথিবীর সর্ব্বত্রই কলহ (Conflict) চলিতেছে। আমি আমার জায়গায় থাকিতে অনিচ্ছুক আমার প্রকৃত কর্ত্তব্য ও অধিকার কি, তাহা নির্দ্ধারণ করিবার মত অন্তর্দৃষ্টি আমার নাই, ফলে কৃত্রিম উপায়ে গায়ের জোরে অর্থাৎ আসুরিক বিপ্লবের মধ্য দিয়া আমি ঠেলিয়া উঠিতে চাই। ইহা বিষ্ণু আরাধনা বা বর্ণাশ্রম-ব্যবস্থার বিরোধী।

ব্রহ্মবিদ্যা ও যোগ।

আমরা যাহা বলিলাম তাহা তত্ত্ব এবং এই তত্ত্বের সাহায্যে প্রদর্শিত হইল যে সত্ত্ব গুণের বা তাহার অধিষ্ঠাতা ও নিয়ামক শ্রীবিষ্ণুর আরাধনা করিতে হইবে। তত্ত্বের নাম ব্রহ্ম বিদ্যা, ইহাকে ইংরাজিতে বলুন The science of Religion. কিন্তু সেই তত্ত্বানুসারে জীবনের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নির্ণয় করিতে হইবে, শিক্ষার দ্বারা, চরিত্র ও অভ্যাসের দ্বারা সেই তত্ত্বানুযায়ী জীবন গঠন করিতে হইবে, ইহার নাম যোগ। এই যোগকে বলুন The Art side of Religion, আমরা যে তত্ত্বের বা ব্রহ্মবিদ্যার কথা বলিলাম সে সম্বন্ধে বিশেষ মতভেদ নাই, কিন্তু সাধন বা যোগ-সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ মতভেদ ছিল এবং এখনও আছে। শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথমেই একটি শ্লোক আছে, তাহার অর্থ এই যে যাঁহারা মুমুক্ষু, তাঁহারা ঘোররূপ ভূতপতিগণের উপাসনা পরিত্যাগ করিয়া অসূয়াহীন চিত্তে শান্ত যে নারায়ণের মূর্ত্তিসমূহ, তাহারই ভজনা করেন। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে একজন সাধু অসূয়াহীন হৃদয়ে শান্তভাবের উপাসনা করেন, আর একদল ভীষণের উপাসক। প্রথম পথটি ধীর ক্রমোন্নতির পথ (The path of evolution) আর পরবর্ত্তী পথটি বিপ্লবের পথ (The path of revolution) এই নামকরণ

প্রকৃতি জয়ের উপায়।

সমাজের ভূমি হইতে (from the social standpoint) করা হইল। ব্যক্তির জীবনেও সাধন-পদ্ধতির দুইটী পথ দেখিতে পাওয়া যায়। অজ্ঞানতা, মত্ততা, কদর্য্যতা প্রভৃতির মধ্য দিয়া আমাদের দেশের একদল লোক ধর্ম্মলাভের আশায় অগ্রসর হইতেন, তাঁহাদের মতাবলম্বী লোক এখনও দেখিতে পাওয়া যায়। ইহারা সামাজিক সদাচারের পক্ষপাতী নহে, সংযম ব্রহ্মচর্য্য বা অপরের প্রতি কর্ত্তব্যপালন এ সকলের অনুশীলন করার দিকেও তাঁহাদের দৃষ্টি নাই, কেহ কেহ অতি উৎকট মাদক সেবন করেন, আবার তাঁহাদের মধ্যে কখন কখন অলৌকিক বা কিঞ্চিৎ অসাধারণ শক্তিও দেখিতে পাওয়া যায়। ইহারা ভূত, প্রেত ও পিশাচাদির উপাসনা করে এবং ঐ ভূতাদির সাহায্যে কিছু কিছু শক্তি লাভ করে। ইহারা সত্ত্বগুণের উপাসক নহে, ইহারা অনেকে এইরূপ মনে করে যে আমরা পিছাইয়া গিয়া প্রকৃতির কবল হইতে উদ্ধার পাইব। আমরা বলি তাহার উপায় নাই, প্রকৃতির হস্তে পরিত্রাণ পাইতে হইলে প্রকৃতিকে স্বীকার করিতে হইবে, প্রকৃতির সত্ত্বগুণের শরণাগত হইয়া তমঃ ও রজঃগুণের শৃঙ্খল খুলিতে হইবে, নিস্ত্রৈগুণ্য অবস্থায় যাইবার পথ শুদ্ধসত্ত্বের মধ্য দিয়া তমোগুণ মধ্য দিয়া নহে। প্রকৃতির বাধ্য হইয়া প্রকৃতিকে জয় করিতে হইবে। Conquer Nature by obedience ইহাই ভাগবতধর্ম্মের পথ, এই পথে চলিয়া অপরকে, এই পথে আনয়ন করা এ যুগে যে কত প্রয়োজন, তাহা যাঁহারা জ্ঞানবান্ লোক এবং বর্ত্তমান পৃথিবীর সামাজিক ও রাজনৈতিক আন্দোলনসমূহ যাঁহারা জানেন তাঁহারাই বুঝিতে পারিবেন। জ্ঞানশূন্যা ভক্তির নামে, জ্ঞান ও কর্ম্মাদির দ্বারা অনাবৃত উত্তমা ভক্তির নামে আমাদের দেশের অনেক মূর্খ লোকেও সত্ত্বগুণের দিকে অগ্রসর না হইয়া তমোগুণের অভিমুখী হইতেছেন। ইহাই বর্ত্তমান বৈষ্ণব সমাজে ধর্ম্ম-বিপ্লব। আমরা ইহার একটী অতি সাধারণ উদাহরণ দিয়া মূল বিষয়ের অনুসরণ করিব।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু মানুষকে 'তৃণাদপি সুনীচ' হইতে বলেন নাই, অর্থাৎ জড়স্বভাব, অকর্ম্মণ্য, চাটুকার হইয়া ধনীর পদলেহন করিয়া উদরান্ন সংগ্রহ করিয়া সাজ পোষাকে বৈষ্ণব হইতে বলেন নাই, মানসিক শক্তিতে জড়ভাবাপন্ন হইয়া সেকালের কয়েকটি কথা আওড়াইয়া লোককে তুষ্ট করিয়া জীবনের পথে চলিতেও উপদেশ দেন নাই। তাঁহার প্রকৃত উপদেশ আমরা শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে দেখিতে পাই।

"উত্তম হইয়া আপনাকে মানে তৃণসম"

'উত্তম' কে?

ইহার অর্থ কি? আমাকে 'উত্তম' হইতে হইবে। 'উত্তম' কথার অর্থ কি? উদ্গত হইয়াছে তমঃ, যাহা হইতে আমাদের প্রকৃতিতে তমঃ রহিয়াছে, আলস্য, জড়তা, অজ্ঞানতা প্রভৃতি আমরা বিশ্বযাত্রায় অর্থাৎ জাগ্রত ও সাধনশীল মানব সকলের উন্নতিমুখী চিন্তা ও সাধনার সহিত চলিতে পারি না, পশ্চাতেই পড়িয়া থাকি, এবং পড়িয়া পড়িয়া সেকালের দুঃস্বপ্ন দেখি, ইহার কারণ তমঃ। প্রথমে এই তমঃকে পরাজয় করিতে হইবে। তখন আসিবেন, রজঃ। রজগুণের দোষ অহঙ্কার, আমরা "মন্বন্তর কথার" আলোচনায় ধ্রুব ও পৃথুরাজার চরিত্রে এই দোষ দেখিয়াছি। এই রজঃকে জয় করিবার জন্য আপনাকে 'তৃণসম' মনে করিতে হইবে। কিন্তু যদি আমি সত্য সত্যই 'তৃণসম' হইয়া পড়ি, তাহা হইলে কি হইবে? তাহা হইলে প্রকৃতি-কর্ত্তৃক কবলিত হইয়া ক্রমশঃ জড়ত্বের পথে বা অধঃপতনের পথে হারাইয়া যাইব। উত্তম হইয়া আপনাকে 'তৃণসম' বিবেচনা করিবে। Steadfastness যদি থাকে তবেই gentleness এর মূল্য আছে। কিন্তু কেবল 'তৃণসম' মনে করিলেই হইবে না। কঠোর জীবনসংগ্রামে পরীক্ষা দিয়া উত্তীর্ণ হইতে হইবে। কাজেই সহিষ্ণুতার প্রয়োজন। সহিষ্ণুতাই প্রকৃত বীরত্ব। রিপুর উত্তেজনায় এক জনকে আঘাত করা কঠিন কাজ

নহে, কিন্তু শক্তি ও সামর্থ্য সত্ত্বেও সহিষ্ণু হওয়াই প্রকৃত বীরত্ব। এই প্রকারের বীরত্বই মানুষকে রজঃ গুণ হইতে সত্ত্বগুণে লইয়া যায়। এইজন্য উপদেশ দিলেন।

দুই প্রকারে সহিষ্ণুতা করে বৃক্ষ সম।
কাটিলেহ তরু যথা কিছু না বোলয়।
শুকাইয়া মৈলে কারে পাণি না মাগয়॥
যে যাহা মাগয়ে তারে দেয় আপন ধন।
ধর্ম্ম বৃষ্টি সহে আনের করয়ে রক্ষণ॥

ইহাই প্রেমধর্ম্ম, ইহাই ভাগবত-ধর্ম্ম, ইহাই কলির পবিত্র ও উন্নততম যুগধর্ম্ম। মানুষ ধার্ম্মিক সাজিয়া আরাম চায়, সুবিধা চায়। ইহা ধর্ম্ম নহে, ধর্ম্মাভাস বা ছলধর্ম্ম। প্রকৃতধর্ম্ম মানুষকে পরের জন্য সহ্য করিতে এবং সকল বিষয়েই অপরকে সাহায্য করিতে নিযুক্ত করে। তাহার পর শেষ কথা—

উত্তম হইয়া বৈষ্ণব হবে নিরভিমান।
জীবে সম্মান দিবে জানি কৃষ্ণ অধিষ্ঠান॥

গুণাবতার।

এইবার আমরা মূলবিষয়ের অনুসরণ করিতেছি। যিনি তৃতীয় পুরুষাবতার, তিনিই গুণাবতার বিষ্ণু। সুতরাং সংক্ষেপে শ্রীলঘু-ভাগবতামৃত অবলম্বনে গুণাবতারের কথা আলোচনা করিতেছি।

ব্রহ্মা।

পদ্মযোনি ব্রহ্মা স্থূল ও সূক্ষ্ম ভেদে দ্বিবিধ। স্থূল মূর্ত্তিতে তাঁহার নাম বৈরাজ, তিনি সৃষ্টিকার্য্য লইয়া রহিয়াছেন। সূক্ষ্মরূপে ব্রহ্মার নাম হিরণ্যগর্ভ, তিনি ব্রহ্মলোকের ঐশ্বর্য্য ভোগ করিতেছেন। বৈরাজরূপ বা স্থূল মূর্ত্তি ব্রহ্মা সৃষ্টি করেন ও বেদ প্রচার করেন। তিনি চতুর্ম্মুখ, অষ্টবাহু ও অষ্টনয়ন।

পদ্মপুরাণে কথিত হইয়াছে :—

ভবেৎ ক্বচিন্মহাকল্পে ব্রহ্মা জীবোঽপ্যুপাসনৈঃ।
ক্বচিদত্র মহাবিষ্ণুর্ব্রহ্মত্বং প্রতিপদ্যতে॥

কোন কোন মহাকল্পে সাধনা-প্রভাবে কোন জীব ব্রহ্মার পদ পাইয়া থাকেন, আর কোন কোন মহাকল্পে গর্ভোদকশায়ী মহাবিষ্ণুই ব্রহ্মা হইয়া থাকেন। সুতরাং কালভেদে ব্রহ্মাতে ঈশ্বরত্ব এবং জীবত্ব দুইই দেখা যায়। ব্রহ্মাকে আবেশ অবতারও বলা যায়, ভগবান তাঁহার সৃষ্টিশক্তির দ্বারা ব্রহ্মাতে আবিষ্ট হইয়া ব্রহ্মাণ্ড রচনা করেন, এই প্রকারে তত্ত্ব বুঝিলে ব্রহ্মা আবেশাবতার। ব্রহ্মসংহিতার একটী শ্লোকে এই প্রকারের কথাই বলা হইয়াছে।

ভাস্বান্ যথাশ্মশকলেষু নিজেষু তেজঃ
স্বীয়ং কিয়ৎ প্রকটয়ত্যপি তদ্বদত্র
ব্রহ্মা য এব জগদণ্ডবিধানকর্ত্তা
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥

সূর্য্যদেব যেমন সূর্য্যকান্তমণিখণ্ডসমূহে কিয়ৎপরিমাণে স্বকীয় তেজঃ প্রকটিত করিয়া থাকেন, সেইরূপ যিনি ব্রহ্মাতে স্বকীয় সৃষ্টিশক্তি দ্বারা আবিষ্ট হইয়া ব্রহ্মাণ্ডে ব্যষ্টি রচনা করেন, আমি সেই আদিপুরুষ গোবিন্দের ভজনা করি।

গর্ভোদশায়ীর নাভিপদ্ম হইতে জীব-কোটি ব্রহ্মার জন্ম হইয়া থাকে। আবার কখনও গর্ভোদক, আবার কখনো বা তেজঃ বায়ু প্রভৃতি হইতে ব্রহ্মার জন্ম হয়। পরমেশ্বরের যখন যেমন ইচ্ছা সেইরূপ হইয়া থাকে।

রুদ্র।

এইবার রুদ্রের কথা। রুদ্রদেব একাদশ ব্যূহ, অষ্টতনু, পঞ্চানন, ত্রিনয়ন, ও দশ বাহু।

রুদ্র একাদশব্যূহস্তথাষ্ট তনুরপ্যসৌ।
প্রায়ঃ পঞ্চাননস্ত্র্যক্ষো দশবাহুরুদীর্য্যতে॥

একাদশ ব্যূহের নাম মহাভারতে পাওয়া যায়।

অজৈকপাদহির্ব্রধ্নো বিরূপাক্ষোঽথ রৈবতঃ।
হরশ্চ বহুরূপশ্চ ত্র্যম্বকশ্চ সুরেশ্বরঃ॥
সাবিত্রশ্চ জয়ন্তশ্চ পিনাকী চাপরাজিতঃ॥

অজৈকপাৎ, অহির্ব্রধ্ন, বিরূপাক্ষ, রৈবত, হর, বহুরূপ, ত্র্যম্বক, সাবিত্র, জয়ন্ত, পিনাকী এবং অপরাজিত, এই একাদশ ব্যূহ।

রুদ্রের অষ্টমূর্ত্তি—পৃথিবী, জল, তেজঃ, বায়ু, আকাশ, সূর্য্য চন্দ্র ও যজমান।

ব্রহ্মা সম্বন্ধে বলা হইয়াছে, তিনি কখনও ঈশ্বরকোটী আবার কখনও জীবকোটি। রুদ্র-সম্বন্ধেও ঠিক্ তাহাই। রুদ্রদেব তত্ত্বতঃ নির্গুণ, তমোগুণের যোগে বিকারবান্ বলিয়া প্রতীত হয়েন মাত্র।

ব্রহ্মসংহিতায় আছে—

ক্ষীরং যথা দধি বিকারবিশেষযোগাৎ
সঞ্জায়তে ন তু ততঃ পৃথগস্তি হেতোঃ।
যঃ শম্ভুতামপি তথা সমুপৈতি কার্য্যাৎ
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥

বিকার-বিশেষের যোগে দুগ্ধ যেমন দধি হয়, কিন্তু দুগ্ধ হইতে পৃথক্ বস্তু নহে, সেইরূপ যিনি সংহার-কার্য্যের জন্য রুদ্র-রূপে অবতীর্ণ হয়েন, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে ভজনা করি।

কখনও ব্রহ্মার ললাট হইতে রুদ্রের জন্ম হয়। সকল কল্পে একরূপ নহে, ভিন্ন ভিন্ন পুরাণের মধ্যে এ বিষয়ে যে মতভেদ তাহা কল্পভেদনিবন্ধন হইয়াছে বুঝিতে হইবে। কল্পের অবসানে সঙ্কর্ষণ হইতেও কালাগ্নি রুদ্রের জন্ম হয়, বায়ুপুরাণ প্রভৃতিতে

কথিত হইয়াছে যে বৈকুণ্ঠের ভিতরেই শিবলোক আছে, সেখানে সদাশিব বিরাজিত, তিনি প্রাকৃত তমোগুণের সম্বন্ধলেশ-পরিশূন্য। তিনি স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের বিলাস-মূর্ত্তি। ব্রহ্ম-সংহিতাতেও তাঁহার প্রসঙ্গ আছে।

বিষ্ণু।

এইবার শ্রীবিষ্ণুর কথা। শ্রীমদ্ভাগবতের তৃতীয় স্কন্ধ অষ্টম অধ্যায়ের ষোড়শ শ্লোকে শ্রীবিষ্ণুর কথা দেখিতে পাওয়া যায়।

তল্লোকপদ্মং স উ এব বিষ্ণুঃ
প্রাবীবিশৎ সর্ব্বগুণাবভাসম্।
তস্মিন্ স্বয়ং বেদময়ো বিধাতা
স্বয়ং ভুবং যং স্ম বদন্তি সোঽভূৎ ॥

শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ মহোদয়ের টীকানুযায়ী অর্থ এইরূপ। ব্রহ্মা ও রুদ্রের ন্যায় বিষ্ণুর দ্বৈরূপ্য অর্থাৎ দ্বিবিধ রূপ নাই। সর্ব্বগুণাবভাস সেই লোকপদ্মে অর্থাৎ যে লোকাত্মক পদ্মে নিখিল ভোগ্য বস্তু রহিয়াছে, সেই পদ্মে গর্ভোদশায়ী সহস্রশীর্ষা প্রদ্যুম্ন চতুর্ভুজ অনিরুদ্ধ হইয়া প্রবেশ করিলেন ; শ্রীধরস্বামী বলিয়াছেন 'অলুপ্ত শক্তি হইয়া অন্তর্য্যামি-স্বরূপে তাহার মধ্যে প্রবেশ করিলেন। বিষ্ণুর অধিষ্ঠান হইলে ঐ পদ্ম হইতে বেদময় ব্রহ্ম উৎপন্ন হইলেন। ব্রহ্ম বেদময় কারণ তিনি বেদ অধ্যয়ন করিয়া প্রাপ্ত হন নাই, স্বতঃই পাইয়াছিলেন। অদৃষ্ট-পিতৃক বলিয়া অর্থাৎ তাঁহার পিতা অদৃষ্ট বলিয়া এই ব্রহ্মা স্বয়ম্ভু। কল্পান্তে ব্রহ্মা নারায়ণের সহিত নিদ্রায় একীভূত হইয়াছিলেন' নারায়ণ প্রবুদ্ধ হইলে পাদ্মকল্পে ব্রহ্মাও পদ্ম দ্বারা অভিব্যক্ত হইলেন।

শ্রীমদ্ভাগবতের এই শ্লোকে 'বিষ্ণু' বলিয়া যাঁহার উল্লেখ করা হইল তিনি ক্ষীরাব্ধি-শায়ী। ইনি গর্ভোদশায়ী দ্বিতীয় পুরুষের বিলাস। মুনিগণ ইহাকে নারায়ণ ও বিরাটের অন্তর্য্যামী বলিয়াও নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। সত্ত্বরূপ তনু বিষ্ণুর বহিরঙ্গ অধিষ্ঠান, এইজন্য বিষ্ণুকে সত্ত্বতনু বলে।

এইবার শ্রীমদ্ভাগবতের সাহায্যে এই পুরুষাবতারগণের কিরূপ পরিচয় পাওয়া যায় তাহাই আলোচনা করা যাইতেছে।

অষ্টাঙ্গযোগ।

মহারাজ পরীক্ষিতকে শ্রীশুকদেব প্রারম্ভে অষ্টাঙ্গযোগের উপদেশ দিলেন। প্রথমেই বলিলেন ধীর হও অর্থাৎ ব্রহ্মচর্য্যাদি পরায়ণ হও। ইহার দ্বারা অষ্টাঙ্গ যোগের প্রথম অঙ্গ অর্থাৎ 'যম' উপদিষ্ট হইল। তাহার পর 'নিয়ম' পুণ্যতীর্থে স্নানাদি করিতে বলিলেন। তাহার পর আসন—পবিত্র অথচ নির্জ্জন স্থানে যথাবিধি আসন রচনা করিয়া উপবেশন করিবে। এই তিনটি অঙ্গ শ্রীমদ্ভাগবতের একটি শ্লোকে উপদিষ্ট হইয়াছে।

গৃহাৎ প্রব্রজিতো ধীরঃ পুণ্যতীর্থজলপ্লুতঃ।
শুচৌ বিবিক্ত আসীনো বিধিবৎ কল্পিতাসনে॥

তাহার পর প্রাণায়াম ও প্রত্যাহার—

অভ্যসেন্মনসা শুদ্ধং ত্রিবৃৎ'ব্রহ্মাক্ষরং পরং।
মনো যচ্ছেজ্জিতশ্বাসো ব্রহ্মবীজমবিস্মরন্॥

অকার, উকার ও মকার এই তিন অক্ষরে গ্রথিত শুদ্ধ ব্রহ্মাক্ষর অর্থাৎ প্রণব মনে মনে আবৃত্তি করিবে অর্থাৎ জপগর্ভ প্রাণায়াম করিবে। অতঃপর ঐ প্রণব বিস্মৃত না হইয়াই ইন্দ্রিয়গণকে নিজ নিজ বিষয় হইতে আকর্ষণ করিয়া নিশ্বাস জয় করিবে এবং মনকে সংযম করিবে।

মন যখন সংযত ও অচঞ্চল হইল, তখন নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি সারথি হইলেন। তাহার পর মন পুনর্ব্বার কর্ম্মবাসনায় আকৃষ্ট হইতে পারে, এই কারণে বুদ্ধির সাহায্যে ভগবানের রূপে মনের ধারণা করিতে হইবে। ধারণার পর ধ্যান, তাহার পর সমাধি। সমগ্র বিষয়ে সামান্যভাবে যে চিত্তের স্থিরীকরণ তাহার নাম

ধারণা ও ধ্যান।

ধারণা, আর অবয়ব-বিশেষে যে সুদৃঢ় ভাবন তাহার নাম ধ্যান। ধারণাব্যতীত ধ্যান হয় না। সমগ্র মূর্ত্তি সামান্যভাবে মনে

রাখিয়াই অবয়ব বিশেষের চিন্তা করিতে হইবে। অবয়ব-বিশেষের চিন্তা করিতে গিয়া যদি সমগ্র বিষয় একেবারে ছাড়িয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলে ধ্যান সিদ্ধ হইবে না। যদি শ্রীকৃষ্ণের শ্রীচরণ ধ্যান করিতে হয়. তাহা হইলে প্রথমে সমগ্র মূর্ত্তি ধারণা করিতে হইবে। সমগ্র মূর্ত্তি সাধারণভাবে চিত্তপটে রাখিয়া তাহার পর শ্রীচরণ ও ক্রমশঃ শ্রীচরণের একটি একটি চিহ্ন দৃঢ়রূপে ভাবনা করিতে গিয়া যদি সমগ্র মূর্ত্তি ভুলিয়া যাই তাহা হইলে আর ধ্যান সুসিদ্ধ হইবে না। ধ্যানের পরেই সমাধি। সমাধিতে অবশ্য জ্ঞান থাকে, সম্ভোগ থাকে কিন্তু সেই জ্ঞান ও সম্ভোগ প্রাকৃত নহে, অপ্রাকৃত।

ধারণার দ্বারা কি হয়, কি কারণে ধারণা আবশ্যক তাহা শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন। প্রথমে বলিয়াছেন ধারণা-ব্যতীত মনকে কর্ম্ম-বাসনার আকর্ষণ হইতে রক্ষা করা যায় না। তাহার পর এই কথাই আরও স্পষ্ট করিয়া নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকে নির্দ্দেশ করিতেছেন।

রজস্তমোভ্যামাক্ষিপ্তং বিমূঢ়ং মন আত্মনঃ।
যচ্ছেদ্ধারণয়া ধীরোহন্তি যা তৎকৃতং মলং॥
যতঃ সন্ধার্য্যমানায়াং যোগিনো ভক্তিলক্ষণঃ।
আশু সংপদ্যতে যোগ আশ্রয়ং ভদ্রমীক্ষতঃ॥

গুণের ক্ষোভ নিবন্ধন রজঃগুণের দ্বারা মন আক্ষিপ্ত হইতে পারে, তমোগুণের দ্বারা বিমূঢ় হইতেও পারে এই কারণে ধারণা দ্বারা তাহাকে শোধিত করা আবশ্যক। রজঃ ও তমোগুণের দ্বারা যে মালিন্য উৎপাদিত হয় ধারণার দ্বারা তাহা দূরীভূত হইয়া থাকে।

যোগী সুখস্বরূপ বিষয় দর্শনমাত্র করেন, কিন্তু ধারণার পথ আশ্রয় করিলে তাঁহার ভক্তিযোগ তৎক্ষণাৎ সম্পাদিত হয়।

ধারণার মাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়া মহারাজা পরীক্ষিত শ্রীশুক-দেবকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, কি প্রকারে ধারণা করিব, এবং কোন রূপেই বা এই ধারণা প্রতিষ্ঠিত। মহারাজের এই প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশুকদেব বলিলেন—

জিতাসনো জিতশ্বাসো জিতসঙ্গো জিতেন্দ্রিয়ঃ
স্থূলে ভগবতো রূপে মনঃ সন্ধারয়েদ্ধিয়া ॥
বিশেষস্তস্য দেহোঽয়ং স্থবিষ্ঠশ্চ স্থবীয়সাং।
যত্রেদং ব্যজ্যতে বিশ্বং ভূতং ভব্যং ভবচ্চ যৎ ॥
অণ্ডকোষে শরীরেঽস্মিন্ সপ্তাবরণসংযুতে।
বিরাজঃ পুরুষো যোঽসৌ ভগবান্ ধারণাশ্রয়ঃ ॥

আসন ও নিয়ম দ্বারা জিতাসন, এবং প্রাণায়াম দ্বারা জিতশ্বাস হইয়া ইন্দ্রিয়গণকে দমন করিবে, তাহার পর সঙ্গশূন্য হইয়া ভগবানের স্থূলরূপে মনকে ধারণা করিতে হইবে।

শ্রীভগবানের এই যে স্থূলরূপ যাহাতে চিত্তের ধারণা করিতে হইবে, তাহা শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী মহোদয়ের মতে, হিরণ্য-গর্ভের অন্তর্যামী যে গর্ভোদশায়ী দ্বিতীয় পুরুষ, তাহার প্রতিমা বা স্থূলমূর্ত্তি।

বিরাট রূপ

শ্রীভগবানের এই যে বিরাট দেহ, ইহা স্থূল হইতেও স্থূলতর ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান যাহা কিছু সমস্তই ইহার অন্তর্গত অথবা ইহা হইতেই প্রকাশ পায়। (আমরা পূর্ব্বে অর্থাৎ শ্রীমদ্ভাগবতে মন্বন্তর-কথা প্রবন্ধে প্রিয়ব্রতের রথ-চক্রের দ্বারা সপ্তসমুদ্র ও সপ্ত দ্বীপের সৃষ্টি-কথা আলোচনায় বলিয়াছি, পৌরাণিক ঋষি, দেশ ও কাল, এই উভয়কে একত্র করিয়া অনেক কথা বলিয়াছেন। এই বিরাট্ রূপের বর্ণনায় ঋষি যে তাহা করিয়াছেন, ইহা শ্রীমদ্ভাগবতের এই শ্লোক হইতে অতি স্পষ্টরূপেই বুঝিতে পারা যাইতেছে।

দেশে ও কালের উর্দ্ধে গিয়া চিন্তা করা আমাদের পক্ষে অসম্ভব। সমাধির অবস্থাতেই ইহা সম্ভব। শ্রীব্যাসদেব শ্রীনারদের উপদেশে সমাধিস্থ হইয়া শ্রীমদ্ভাগবত শাস্ত্র প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। আমরা সমাধিস্থ হইতে আপাততঃ অক্ষম, সুতরাং সম্পূর্ণরূপে এই তত্ত্ব উপলব্ধি করিতে পারিব না। কিন্তু যম নিয়ম আসন প্রাণায়াম ও প্রত্যাহারের দ্বারা চিত্ত শুদ্ধ করিয়া যে সময়ে ধারণা অভ্যাস করিব, সে সময় দেশ ও কালকে এক জায়গায় আনিয়া অর্থাৎ ভিতর বাহিরের দ্বন্দ্ব মিটাইয়া চিন্তা করিতে অভ্যাস করিব। We shall try to transcend time and comprehend all space at once

পঞ্চাশৎ কোটীযোজন পরিমিত এই ব্রহ্মাণ্ডরূপ বিরাট দেহ ক্ষিতি, জল, তেজ, বায়ু, আকাশ, অহঙ্কারতত্ত্ব এবং মহত্তত্ত্ব এই সমস্ত আবরণে আবৃত, উহা ধারণার বিষয় হয় না, উহার মধ্যে বিরাড্ জীবের নিয়ন্তা আছেন, তিনিই ধারণার বিষয়।

তাহার পর শ্রীমদ্ভাগবত এই স্থূলরূপ বর্ণনা করিয়াছেন :—

পাতালমেতস্য হি পাদমূলং পঠন্তি পার্ষ্ণি প্রপদে
রসাতলং।
মহাতলং বিশ্বসৃজোঽথ গুল্ফৌ তলাতলং
বৈ পুরুষস্য জঙ্ঘে॥
দ্বে জানুনী সুতলং বিশ্বমূর্ত্তেরূরুদ্বয়ং
বিতলঞ্চাতলঞ্চ।
মহীতলং তজ্জঘনং মহীপতে নভস্তলং
নাভিসরো গৃণন্তি॥
উরঃস্থলং জ্যোতিরনীকমস্য
গ্রীবামহর্বদনং বৈজনোঽস্য।
তপো বরাটীং বিদুরাদি পুংসঃ সত্যন্তু
শীর্ষাণি সহস্রশীর্ষ্ণঃ॥

ইন্দ্রাদয়ো বাহব আহুরুস্রাঃ কর্ণৌ দিশঃ
শ্রোত্র মমুষ্য শব্দঃ।
মাসত্যদস্রৌ পরমস্যনাসে ঘ্রাণোঽস্যগন্ধো
মুখমগ্নিরিদ্ধঃ ॥
দ্যৌরক্ষিণী চক্ষুরভূৎ পতঙ্গঃ পক্ষাণি
বিষ্ণোরহনী উভেচ।
তদ্ভ্রুবিজৃম্ভঃ পরমেষ্ঠিধিষ্ণ্যমাপোঽস্য
তালুরস এব জিহ্বা ॥
ছন্দাংস্যনন্তস্য শিরো গৃণন্তি দংষ্ট্রাযমঃ
স্নেহকলা দ্বিজানি।
হাসো জনোন্মাদকরীচ চ মায়া দুরন্তসর্গো
যদপাঙ্গমোক্ষঃ ॥
ব্রীড়োত্তরৌষ্ঠোঽধর এব লোভো
ধর্ম্মস্তনোঽধর্ম্মপথোঽস্য পৃষ্ঠং।
কস্তস্য মেঢ্রং বৃষণৌচ মিত্রৌ কুক্ষিঃ সমুদ্রা
গিরয়োঽস্থিসঙ্ঘাঃ ॥
নদ্যোঽস্য নাড্যোথ তনুরুহানি মহীরুহা
বিশ্বতনোনৃপেন্দ্র।
অনন্তবীর্য্যঃ শ্বসিতং মাতরিশ্বা গতির্বয়ঃ
কর্ম্মগুণপ্রবাহঃ ॥
ঈশস্য কেশান্ বিদুরম্বুবাহান্ বাসস্তু
সন্ধ্যাং কুরুবর্য্য ভূম্নঃ।
অব্যক্তমাহুর্হৃদয়ং মনশ্চ স চন্দ্রমাঃ
সর্ব্ববিকার কোষঃ ॥
বিজ্ঞানশক্তিং মহিমামনন্তি সর্ব্বাত্মনোঽন্তঃকরণং
গিরিত্রং।

আশ্বাশ্বতর্য্যুষ্ট্রগজানখানি সর্ব্বে মৃগাঃ
পশবঃ শ্রোণিদেশে ॥
বয়াংসি তদ্ব্যাকরণং বিচিত্রং মনুর্ম্মণীষা
মনুজোনিবাসঃ।
গন্ধর্ব্ববিদ্যাধরচারণাপ্সরঃস্বরস্মৃতীরস্থরানীকবীর্য্যঃ ॥
ব্রহ্মাননং ক্ষত্রভুজো মহাত্মা বিড়ুরুরঙ্ঘ্রিশ্রিত
কৃষ্ণবর্ণঃ।
নানাভিধাভীজ্যগণোপপন্নো দ্রব্যাত্মকঃ
কর্ম্মবিতানযোগঃ ॥
ইয়ানসাবীশ্বর বিগ্রহস্য যঃ সন্নিবেশঃ
কথিতোময়াতে।
সন্ধার্য্যতেঽস্মিন্ বপুষি স্থবিষ্ঠেমনঃ স্ববুদ্ধ্যা
ন যতোঽস্তি কিঞ্চিৎ ॥

এই বিরাটমূর্ত্তির চরণের নিম্নস্থল পাতাল, চরণের অগ্র ও পশ্চাদ্ভাগ রসাতল, গুলফ্দেশ মহাতল, আর জঙ্ঘা দুইটি তলাতল। স্থতল সেই বিশ্বমূর্ত্তির দুইটী জানু, বিতল ও অতল তাঁহার উরুদ্বয়, মহীতল তাঁহার জঘন, নভোমণ্ডল তাঁহার নাভিসরোবর। এই নভোমণ্ডলই ভুবর্লোক আর মহীতল ভূলোক। স্বর্লোক তাঁহার বক্ষঃস্থল, মহর্লোক তাঁহার গ্রীবাদেশ, জনলোক তাঁহার বদন, তপোলোক তাঁহার ললাট, সত্যলোক সেই সহস্রশীর্ষা পুরুষের শিরোদেশ।

ইন্দ্রাদি দেবগণ ঐ বিরাট্ পুরুষের বাহু, দিক্ সকল তাঁহার কর্ণকুহর, শব্দ সকল তাঁহার শ্রবণেন্দ্রিয়, অশ্বিনীকুমারদ্বয় তাঁহার দুই নাসিকা, গন্ধ তাঁহার ঘ্রাণেন্দ্রিয় এবং প্রদীপ্ত অনল তাঁহার মুখ। অন্তরীক্ষ তাঁহার চক্ষুর্গোলক, সূর্য্য তাঁহার চক্ষুরিন্দ্রিয়, রাত্রি এবং দিবস তাঁহার চক্ষুর পক্ষ সকল, ব্রহ্মপদ তাঁহার ভ্রূবিভঙ্গ, জল তাঁহার তালু, রস তাঁহার রসনেন্দ্রিয়। বেদ সকল

তাঁহার ব্রহ্মরন্ধ্র, যম তাঁহার দন্ত, উন্মাদকারিণী মায়া তাঁহার হাস্য, অপার সংসার তাঁহার কটাক্ষ ব্রীড়া তাঁহার উত্তরোষ্ঠ, লোভ তাঁহার অধর, ধর্ম্ম তাঁহার স্তন, অধর্ম্মবর্গ তাঁহার পূর্ব্বভাগ, প্রজাপতি তাঁহার মেঢ্র, মিত্রাবরুণ তাঁহার দুই বৃষণ, সমুদ্রসমূহ তাঁহার কুক্ষিদেশ, পর্ব্বত সমুদয় তাঁহার অস্থি, নদী সকল তাঁহার নাড়ী, বৃক্ষ সকল তাঁহার লোম, অনন্তবীর্য্য বায়ু তাঁহার নিশ্বাস, কাল তাঁহার গমন, প্রাণীদিগের সংসার তাহার ক্রীড়া। মেঘ সকল তাঁহার কেশ, সন্ধ্যা তাঁহার বসন, অব্যক্ত অর্থাৎ প্রধান-প্রকৃতি তাহার হৃদয়, চন্দ্রমা তাঁহার মন, মনই যাবতীয় বিকারের হেতু, বিজ্ঞান-শক্তি বা চিত্ত তাঁহার মহত্তত্ত্ব, শ্রীরুদ্র তাঁহার অহঙ্কারতত্ত্ব ; অশ্ব, অশ্বতরী, উষ্ট্র, হস্তী প্রভৃতি তাঁহার নখ, সমুদয় মৃগপশু তাঁহার কটিদেশ। পক্ষিগণ তাঁহার বিচিত্রশিল্প-নিপুণতা, স্বায়ম্ভুব মনু তাহার মণীষা, পুরুষ তাহার আশ্রয়স্থান, গন্ধর্ব্ব-বিদ্যাধর চারণ ও অপ্সরাগণ তাহারই স্বরস্মৃতি, অসুর বীরগণ তাঁহার বীর্য্য। ব্রাহ্মণগণ তাঁহার মুখ, ক্ষত্রিয় বাহু, বৈশ্য উরু, শূদ্র চরণ, তিনি বিবিধ নামধারী বসুরুদ্র প্রভৃতি দেবগণে পরিবৃত, এবং হবিঃ-সাধ্য যজ্ঞাদি-প্রয়োগ তাঁহারই কার্য্য।

ইহাই বিরাট্ মূর্ত্তির অবয়বসংস্থান, যাহারা মুক্তি চাহেন তাঁহারা নিজ নিজ বুদ্ধিদ্বারা ঈশ্বরের এই স্থূলশরীরে মনোধারণ করিয়া থাকেন।

এই যে বিরাট্ রূপের ধারণা এতৎ সম্বন্ধে শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী মহোদয় বলিয়াছেন—

দৃশ্য শ্রব্যাদি বস্তুমাত্রাণাং ভগবদ্বিভূতিত্বাদ্ভগবদ্রূপত্বেন ধ্যেয়ত্বে সতি স্পর্দ্ধাসূয়াদয়ো ন কাপি ভবেয়ুরিত্যত স্পর্দ্ধাদ্যভাবে চিত্ত-শুদ্ধৌচ চিদ্ঘনাত্মক শ্রীনারায়ণমূর্ত্তৌ ধারণা অতিসুকরা স্যাৎ॥

বিরাটের ধারণায় ফল—বৈরাগ্য।

অর্থাৎ আমরা যাহা কিছু দেখি ও যাহা কিছু শুনি সেই সমুদয় বস্তুই শ্রীভগবানের বিভূতি বলিয়া শ্রীভগবানের রূপ। এই প্রকারে যাবতীয় বস্তু ধ্যান করিতে পারিলে স্পর্দ্ধা, অসূয়া

প্রভৃতি আমাদের চিত্ত হইতে দূরীভূত হইবে এবং এই প্রকারে চিত্ত শুদ্ধ হইলে সেই শুদ্ধচিত্তে বিজ্ঞানাত্মক যে শ্রীনারায়ণ মূর্ত্তি তাহার ধারণা সহজেই হইবে। এই বিরাট্ ও স্থূলমূর্ত্তির ধারণার দ্বারা বৈরাগ্য ও ভক্তি সাধিত হয়। এই রূপ গর্ভোদক-শায়ীয় সমষ্টিরূপ, এই রূপের আবার অন্তর্যামীরূপ আছে। সেই অন্তর্যামী রূপের ধারণা কিরূপে করিতে হয় শ্রীমদ্ভাগবতের তৃতীয় স্কন্ধের অষ্টম অধ্যায়ে সেই তত্ত্ব পাওয়া যায়। ইহা প্রাচীন ব্রহ্ম-বিদ্যা সঙ্কর্ষণ দেব সর্ব্বপ্রথমে এই তত্ত্ব সনৎকুমার প্রভৃতিকে বলেন, সনৎকুমার ইহা ব্রতধারী সাংখ্যায়ন নামা ঋষিকে বলেন। সাংখ্যায়ন ঋষি পরাশর মুনিকে এই পুরাণ অর্থাৎ প্রাচীন ব্রহ্ম-বিদ্যা উপদেশ করিয়াছিলেন, পরাশরের নিকট মৈত্রেয়, মৈত্রে-য়ের নিকট বিদুর এই বিদ্যা প্রাপ্ত হন, তাহার পর শ্রীমদ্ভাগবতের সাহায্যে এই বিদ্যা বা তত্ত্ব জগতীতলে প্রচারিত হইয়াছে।

ব্রহ্মার পুরুষ দর্শন।

বিশ্ব-প্রলয় পয়োধিজলে নিমগ্ন, গর্ভোদকশায়ী শ্রীনারায়ণ মহাসর্প অনন্তকে শয্যা করিয়া তাহার উপর শায়িত। তাঁহার জ্ঞানশক্তি অক্ষুণ্ণ অথচ নয়নযুগল মুদ্রিত করিয়া শায়িত, তিনি স্বরূপানন্দে নিষ্ক্রিয় অবস্থায় বিদ্যমান। ত্রিলোকীর অন্তর্গত দেবমনুষ্যাদির সূক্ষ্ম শরীর সমূহ তাঁহার শরীরাভ্যন্তরে নিলীন, পুনর্ব্বার সৃষ্টিকালে তাহাদিগকে প্রবুদ্ধ করিবার জন্য কালরূপা শক্তিকে তিনি প্রথম প্রেরণ করিলেন। অগ্নি যেমন কাষ্ঠের মধ্যে রুদ্ধবীর্য্য হইয়া অবস্থান করে তিনিও সেইরূপ বাহ্যবৃত্তি পরিশূন্য হইয়া স্বকীয় অধিষ্ঠানরূপ পাতালস্থ জলের মধ্যে বাস করিয়াছেন। এই প্রকারে সহস্র মহাযুগ নিজের জ্ঞানশক্তিসহ শয়ন করিয়া নিজের ভিতরেই সমস্ত লোককে নীলবর্ণ অর্থাৎ অব্যক্ত- রূপে অবস্থিত অবলোকন করেন। তিনি যাবতীয় ক্রিয়া স্মৃতিপটে জাগাইবার জন্য আপনার কালশক্তিকে নিযুক্ত করিয়া-ছিলেন, সমুদয় ক্রিয়া স্মৃতিপটে জাগরূক হইলে প্রলয়াবসানে পুনর্ব্বার সৃষ্টি হইবে। লোকসৃষ্টির জন্য যে সূক্ষ্ম অর্থে (Latent

Idea) তাহার দৃষ্টি (attention) অভিনিবিষ্ট ছিল, সেই সূক্ষ্ম অর্থ কালানুসারে রজোগুণ দ্বারা ক্ষোভিত বা ক্রিয়ান্বিত (manifest) হইয়া জগৎকে প্রসব করিবার জন্য তাঁহার নাভিদেশ হইতে বাহির হইল। এই সূক্ষ্ম অর্থ বাহির হওয়ার পর জীবগণের অদৃষ্ট প্রতি-বোধক কালবশতঃ পদ্মকোষাকারে তাহা পরিণাম প্রাপ্ত হইল। ভগবান্ বিষ্ণুই ঐ পদ্মকোষের উৎপত্তির নিদান, তাহার ইচ্ছায় উহা পরিণতি প্রাপ্ত হইয়া সূর্য্যের ন্যায় আত্মজ্যোতিঃ দ্বারা প্রলয়কালীন মহাসাগরের জলকে সমুদ্ভাসিত করিল। ঐ পথে ব্রহ্মার জন্ম হইল। তিনি কাহাকেও দেখিতে না পাইয়া চারিদিকে দৃষ্টি সঞ্চালন করিলেন, এই কারণেই পাদ্মকল্পে ব্রহ্মা চতুর্মুখ। সেই সময়ে প্রলয় কালীন অতি প্রবল বায়ুবেগে মহাসমুদ্র প্রচণ্ডবেগে কম্পিত ও তরঙ্গায়িত হইতেছিল, ব্রহ্ম তখন স্মৃতিহীন। ব্রহ্মা ভাবিতে লাগিলেন আমি পদ্মপৃষ্ঠে উপবিষ্ট রহিয়াছি. এই আমি কে? জলের উপরে এই পদ্ম ব্যতীত আর কিছুই নাই, এই পদ্ম কোথা হইতে উৎপন্ন হইল; এই পদ্মের নিশ্চয়ই আরও কিছু আছে। এইরূপ চিন্তা করিয়া ব্রহ্মা নালের অভ্যন্তরস্থ ছিদ্র-দ্বারা জলের মধ্যে প্রবেশ করিলেন ও পদ্মের আশ্রয় অন্বেষণ করিতে লাগিলেন, কিন্তু কিছুই পাইলেন না। এই অন্বেষণে ব্রহ্মার পরমায়ুর একশত বৎসর চলিয়া গেল, কিন্তু বহির্ম্মুখী চিত্তবৃত্তি লইয়া অন্বেষণ করিতেছিলেন বলিয়াকারণ বা আধার নির্দ্ধারণ করিতে পারিলেন না। তখন ব্রহ্মা অধিষ্ঠান পদ্মে ফিরিয়া আসিলেন এবং অভিমান পরিত্যাগ করিয়া অন্তর্মুখ বৃত্তি দ্বারা নিশ্বাস জয় করতঃ সমাধিস্থ হইলেন। শত সংবৎসর এই প্রকারে অতিক্রান্ত হইলে ব্রহ্মার যোগ সুসম্পন্ন হইল, তিনি যে বস্তু বাহিরে খুঁজিয়া পান নাই, হৃদয় মধ্যে তাঁহাকে দেখিলেন। পরবর্ত্তী নয়টি শ্লোকে শ্রীমদ্ভাগবত ব্রহ্মার এই দর্শন বর্ণনা করিতেছেন।

মৃণালগৌরায়তশেষভোগপর্য্যঙ্ক একং পুরুষং শয়ানং
ফণাতপত্রাযুতমূর্দ্ধরত্নদ্যুভির্হতধ্বান্তযুগান্ততোয়ে ॥
প্রলয়-সলিল মধ্যে, পদ্মের মৃণাল সম, গৌরবরণ
বিশাল সে শেষ নাগ, শরীর উপরে তার,
করিয়া শয়ন, আছেন পুরুষ একজন;
আতপত্র সম ফণা, অসংখ্য মস্তক তাহে,
রত্ন সমুজ্জ্বল, জল রাশি করে ঝল ঝল।
প্রেক্ষাং ক্ষিপন্তং হরিতোপলাদ্রেঃ
সন্ধ্যাবরুভ্রনীবেরু মূর্দ্ধঃ।
রত্নোদধারৌষধিসৌমনস্য বনস্রজো
বেণু-ভুজাঙ্ঘ্রিপাজ্ঘৈঃ ॥
মরকত শিলাময়, পর্ব্বতের কটিদেশে,
সন্ধ্যামেঘ বিচিত্র বরণ,
কোথা লাগে রূপ তার, মরি মরি কি সুন্দর,
পরিধান সুপীতবসন।
মরকত পর্ব্বতের শিখরে শিখরে শোভে সুপ্রচুর
সুবর্ণের ছটা
কোথা লাগে সে সৌন্দর্য্য, এমন উজ্জ্বল তাঁর,
কিরীটের রতনের ঘটা।
পুরুষের গলদেশে, মনোহর বনমালা,
যেন গিরিগাত্রে পায় শোভা
বিচিত্র রতনরাশি, স্বচ্ছ সলিলের ধারা,
ওষধি কুসুম মনোলোভা।
পুরুষের পদ যেন, রত্ন মুক্তা তুলসী ও
ফুল্লফুলে অতি শোভাময়।
মরকত শিলাময়, পর্ব্বতের শোভারাশি,
পুরুষের রূপে পরাজয়।

ব্রহ্মা ঐ পুরুষকে দর্শন করিয়া স্থির করিলেন ইনিই ভগবান্ হরি, তাঁহার গলদেশে কীর্ত্তিময়ী বনমালা, বেদরূপ মধুব্রতসমুহ ঐ মনোহর বনমালার অনুব্রত। ব্রহ্মা সেই সময়ে লোক সৃজনার্থ চিন্তা করিতেই পাঁচটি পদার্থ দর্শন করিলেন। পুরুষের নাভি সরোবরের পদ্ম, তাহাতে ব্রহ্মা অর্থাৎ তিনি স্বয়ং, জল, প্রলয়কালীন বায়ূ এবং আকাশ। এই পদ্ম লোক-সৃষ্টির কারণ বা কর্ম্মবীজ। তাহার পর ব্রহ্মার স্তব। এই স্তব ব্যাখ্যার প্রারম্ভে শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী মহোদয় লিখিয়াছেন

গর্ভোদশায়িনং স্বান্তর্যামিনং নবমে বিধিঃ
স্তুত্বা তস্য কৃপাবৃষ্ট্যা সামর্থ্যং প্রাপ সৃষ্টয়ে ॥

তৃতীয় স্কন্ধের নবম অধ্যায়ে বিধি অর্থাৎ ব্রহ্মা আপনার অন্তর্যামী গর্ভোদশায়ীকে স্তুতি করিলেন, এবং সেই গর্ভোদশায়ীর কৃপাবৃষ্টির দ্বারা সৃষ্টি করিবার সামর্থ্য পাইলেন।

ব্রহ্মা তাঁহার স্তবের মধ্যে-বলিলেন, হে প্রভো, উপাসকদিগের প্রতি অনুগ্রহ বিস্তার করিয়া এই যে মূর্ত্তি আপনি প্রারম্ভে প্রকটিত করিলেন, এই মূর্ত্তিই শত শত অবতারের এক-মাত্র বীজ।

"আদৌ গৃহীতমবতারশতৈকবীজং।"

তোমার এই মূর্ত্তি ভূতসকল ও ইন্দ্রিয়গণের উদ্ভবের কারণ। যাহারা কুতর্কনিষ্ঠ ও মূর্খ তাহারাই বিবেচনা করে যে এই মূর্ত্তি মায়াময়, কিন্তু তাহা নহে, তুমি চিন্ময় গুণসমুদ্র, তোমার এই মূর্ত্তি চিন্ময়। তোমার চরণপঙ্কজের সৌরভ বেদরূপ বায়ূযোগে যাঁহারা কর্ণ বিবরের দ্বারা আঘ্রাণ করেন এবং তোমার চরণপদ্ম সর্ব্ব-পুরুষার্থ-সার বলিয়া গ্রহণ করেন তাঁহারা আপনার নিজের পুরুষ, আপনি তাঁহাদের হৃদয় পদ্মে সর্ব্বদাই প্রকাশিত। এই স্থানেই ব্রহ্মা সেই অনন্ত শক্তি-সম্পন্ন পুরুষের বিজ্ঞান শক্তি বলিয়া আপনার পরিচয় দিয়াছেন। শ্রীধরস্বামী ইহার অর্থ

করিয়াছেন "বিজ্ঞানে শক্তির্যস্য মহতত্ত্বাত্মকস্য চিত্তস্য তদভিমানী।" অর্থাৎ যিনি মহতত্ত্বের বা চিত্তের অভিমানী তিনি ব্রহ্মা। শ্রীল বিশ্বনাথ বলেন "বিজ্ঞানশক্তিঃ বিজ্ঞানময় পুরুষঃ সমষ্টিজীবরূপঃ বুদ্ধিতত্ত্বাধিষ্ঠাতা" সমষ্টিজীবরূপ, বুদ্ধিতত্ত্বের অধিষ্ঠাতা।

শ্রীমদ্ভাগবতের দ্বিতীয় স্কন্ধে আমরা দ্বিতীয় পুরুষের স্থূলরূপের বর্ণনা পাইয়াছি সেই স্থানেই তৃতীয় পুরুষের কথাও আছে। আমরা এইবার শ্রীমদ্ভাগবতের দ্বিতীয় স্কন্ধের তৃতীয় অধ্যায় হইতে এই তৃতীয় পুরুষের বিষয় বর্ণনা করিতেছি। শ্রীল শুকদেব, মহারাজ পরীক্ষিতকে দ্বিতীয় পুরুষের স্থূলরূপে চিত্ত ধারণা করিতে বলিলেন। পূর্ব্বকালে ব্রহ্মা এই প্রকার ধারণা প্রভাবেই সৃষ্টি করিবার সামর্থ্য পাইয়াছিলেন। এইরূপের ধারণার দ্বারা বৈরাগ্য সিদ্ধ হয়, চিত্ত শুদ্ধি ঘটিয়া থাকে এবং মানুষ আত্মশক্তির প্রকৃত ভূমিতে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া অপরিসীম বলে বলীয়ান্ হয়। তখন মানুষ বেশ বুঝিতে পারে—

সত্যাং ক্ষিতৌ কিং কশিপোঃ প্রয়াসৈর্বাহৌ স্ব-
সিদ্ধে হ্যুপবর্হণৈঃ কিং।
সত্যঞ্জলৌ কিং পুরুধান্নপাত্র্যা দিগ্বল্কলাদৌ সতি
কিং দুকূলৈঃ॥

পৃথিবী সর্ব্বত্রই রহিয়াছে, তাহার পৃষ্ঠদেশে অনায়াসে শয়ন করা যাইতে পারে তাহা হইলে শয্যার প্রয়াসেই আবশ্যক কি? স্বতঃসিদ্ধ দুইটি বাহু রহিয়াছে, তাহার উপরে মাথা রাখিয়া অনায়াসেই নিদ্রা যাইতে পারা যায়, তবে আর বালিশের প্রয়োজন কি? হাতের অঞ্জলি রহিয়াছে, তবে আর নানা প্রকারের ভোজন-পাত্রের প্রয়োজন কি? দিক্ ও বৃক্ষত্বক্ থাকিতে পট্টবস্ত্রের জন্য চেষ্টা কেন?

চিরাণি কিং পথি ন সন্তি দিশন্তি ভিক্ষাং
নৈবাঙ্ঘ্রিপাঃ পরভৃতঃ সরিতোপ্যশুষ্যন্।
রুদ্ধা গুহাঃ কিমজিতোঽবতিনোপসন্নান্
কস্মাদ্ভজন্তি কবয়ো ধনদুর্ম্মদান্ধান্॥

পথে কি জীর্ণ বস্ত্রখণ্ড পাওয়া যায় না? বৃক্ষগণ কি ফলাদি দ্বারা পরকে পোষণ করে না? তাহাদের নিকট চাহিলে কি তাহারা ভিক্ষা দেয় না? সকল নদীই কি শুষ্ক হইয়া গিয়াছে? সমুদয় পর্ব্বতের গুহা কি রুদ্ধ হইয়াছে? ভগবান্ হরি কি শরণাগত ব্যক্তিগণকে রক্ষা করেন না? তাহা হইলে ধনদুর্ম্মদান্ধ ব্যক্তিদিগের সেবায় প্রয়োজন কি?

তৃতীয় পুরুষ অন্তর্যামী।

এইরূপ চিন্তা করিয়া বিষয় মাত্রে বিরক্তি লাভ হইবে এবং আপনার চিত্তে যে স্বতঃসিদ্ধ আত্মা তাঁহারই সেবা করিতে হইবে। তাহার পর—

কেচিৎ স্বদেহান্তহৃদয়াবকাশে প্রাদেশমাত্রং
পুরুষং বসন্তং।
চতুর্ভুজং কঞ্জরথাঙ্গশঙ্খগদাধরং ধারণয়া স্মরন্তি॥
প্রসন্নবক্ত্রং নলিনায়তেক্ষণং কদম্বকিঞ্জল্ক পিশঙ্গবাসসং।
লসন্মহারত্নহিরন্ময়াঙ্গদং স্ফুরন্মহারত্ন কিরীটকুণ্ডলং।
উন্নিদ্রহৃৎ পঙ্কজকর্ণিকালয়ে যোগেশ্বরাস্থাপিত
পাদপল্লবং।
শ্রীলক্ষণং কৌস্তুভরত্নকন্ধরমম্লানলক্ষ্ম্যা বনমালয়াচিতং॥
বিভূষিতং মেখলয়াঙ্গুরীয়কৈর্মহাধনৈর্নূপুরকঙ্কণা-
দিভিঃ।
স্নিগ্ধামলাকুঞ্চিতনীলকুন্তলৈর্বিরোচমানাননহাস-
পেশলং॥

অদীনলীলাহসিতে ক্ষণোল্লাসদ্ভ্রূভঙ্গ সংসূচিত
ভূর্য্যনুগ্রহং।
ঈক্ষেত চিন্তাময়দেতমীশ্বরং যাবন্মনো
ধারণয়াবতিষ্ঠতে॥

দেহের অভ্যন্তরে যে হৃদয়রূপ অবকাশ আছে, তাহাতে বাসকারি প্রাদেশমাত্র পরিমাণ পুরুষ। তিনি চতুর্ভুজ এবং তাঁহার ভুজ-চতুষ্টয়ে শঙ্খ চক্র গদা ও পদ্ম বিরাজমান। তাঁহার বদন অতিশয় প্রসন্ন, নয়নদ্বয় নলিনতুল্য প্রফুল্ল এবং আয়ত, বসন কদম্বকুসুমের কেশরের ন্যায় পীতবর্ণ এবং রত্নখচিত, স্বর্ণময় অঙ্গদ, কিরীট ও কুণ্ডল অমূল্য রত্নে দেদীপ্যমান। তাহার দুইটি পদ-পল্লব যোগেশ্বরগণ নিজ নিজ বিকসিত হৃৎপদ্মের কর্ণিকারূপ আলয়ে সংস্থাপিত করিয়া সর্ব্বদা চিন্তা করেন। শ্রীবৎসরূপ চিহ্নিত কৌস্তুভমণি ও অন্যান্য রত্ন তাঁহার গ্রীবাদেশে শোভমান, গলদেশ অম্লান শোভাশালিনী বনমালায় বেষ্টিত। তাঁহার সকল অবয়ব মেখলা অঙ্গুরী এবং নুপুর কঙ্কণাদি মহামূল্য অলঙ্কারে অলঙ্কৃত, আর তাঁহার বদন ঈষৎ কুঞ্চিত, স্নিগ্ধ নির্ম্মল নীলবর্ণ কুন্তলে অতিশয় শোভমান এবং হাস্যদ্বারা পরম রমণীয়। হাস্যই তাঁহার উদার লীলা, তাঁহার কটাক্ষদৃষ্টিতে মনোহর ভ্রূভঙ্গি, করুণা যেন তাহাতে মূর্ত্তিমতী। এইরূপ চিন্তা করিবে।

এইরূপ চিন্তা করিবার উপদেশ দেওয়ার পর শ্রীমদ্ভাগবত বলিলেন, প্রেমলক্ষণ ভক্তিযোগ যে পর্য্যন্ত না জন্মায় সে পর্য্যন্ত এইরূপ ধ্যান করিবে, কিন্তু পূর্ব্বে যে স্থূল গর্ভোদশায়ীর রূপ বলা হইল তাহা ভুলিবে না, অর্থাৎ আবশ্যক ক্রিয়ানুষ্ঠানের পর (যম, নিয়ম প্রাণায়াম ও প্রত্যাহারের) সেই স্থূলরূপ স্মরণ করিবে।

স্থূলরূপের স্মরণ ও ধারণা দ্বারা মন জিত হইলে অর্থাৎ মনের চাঞ্চল্য ও বিক্ষেপ সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত হইলে এই যে

সর্ব্বসাক্ষি, ও সর্ব্বেশ রূপ বা অন্তর্য্যামী রূপ তাহা ধারণা করিবে। ইহাই শ্রীধরস্বামিপাদের মত।

এই তৃতীয়াধ্যায়ের টীকার প্রারম্ভে শ্রীধর স্বামী বলিয়াছেন—

দ্বিতীয়েতু ততঃস্থূলধারণাতো জিতং মনং।
সর্ব্বসাক্ষিণি সর্ব্বেশে বিষ্ণৌ ধার্য্যমিতীর্য্যতে॥
দৃশ্যালম্বনরূপৈবমুক্তা বৈরাজধারণা।
ইহোচ্যতে তু তৎসাধ্যা সর্ব্বান্তর্যামিধারণা॥

দ্বিতীয় অধ্যায়ে স্থূলধারণার দ্বারা মন জিত হইলে সেই মন সর্ব্বসাক্ষী ও সর্ব্বেশ বিষ্ণুতে ধারণ করিতে হইবে, ইহাই তৃতীয় অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয়। বৈরাজ ধারণা দৃশ্যের অবলম্বনরূপা অর্থাৎ যাহা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য তাহাই অবলম্বন করিয়া সাধিত হয়, তাহা কথিত হইয়াছে; এখন সেই বৈরাজ ধারণার সাধ্য বিষয় যে সর্ব্বান্তর্যামি ধারণা তাহাই বক্ষ্যমাণ-অধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে।

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী মহোদয় স্বামীপাদের এই কথা আরও বিশদ করিয়া বলিয়াছেন যে স্থূল ধারণার দৃশ্য প্রাকৃত বস্তু সমূহে ভগবত্তা আরোপ করিতে হয়।

শ্রীমদ্ভাগবতের দ্বিতীয় স্কন্ধের প্রারম্ভেই ধারণাশ্রয় গর্ভোদক-শায়ীর বা দ্বিতীয় পুরুষাবতারের যে স্থূলরূপ আমরা তাহা বর্ণনা করিয়াছি এবং সেই প্রসঙ্গে তৃতীয় স্কন্ধের অষ্টম অধ্যায় হইতে ব্রহ্মা-কর্ত্তৃক প্রলয় সলিল মধ্যে পরিদৃষ্ট শেষ—শয্যাশায়ী অন্তর্যামী মূর্ত্তি বর্ণনা করিয়াছি। শ্রীমদ্ভাগবতের তৃতীয় স্কন্ধে মৈত্রেয় বিদুর-সম্বাদে যে সৃষ্টি কথা আলোচিত হইয়াছে তাহা হইতে আমরা এই পুরুষাবতার-তত্ত্ব আরও ভাল করিয়া বুঝিতে পারিব।

ভগবানেক আসেদমগ্র আত্মাত্মনাং বিভুঃ।
আত্মেচ্ছানুগতাবাত্মা নানামত্যুপলক্ষণঃ॥

সবা এষ তদা দ্রষ্টা নাপশ্যদ্দৃশ্যমেকরাট্।
মেনেঽসন্তমিবাত্মানং সুপ্তশক্তিরসুপ্তদৃক ॥
স বা এতস্য সংদ্রষ্টুঃ শক্তিঃ সদসদাত্মিকা।
মায়া নাম মহাভাগ যয়েদং নির্ম্মমে বিভুঃ ॥
৩।৫-২৩-২৫ ॥

এই সমুদয় শ্লোকে সৃষ্টি লীলা বর্ণিত হইতেছে। সৃষ্টি লীলা বর্ণনা করিবার পূর্ব্বে তাহার পূর্ব্বাবস্থা বর্ণনা করা আবশ্যক। জীবগণের আত্মাস্বরূপ (আত্মানাং আত্মা), সকলের স্বামী বিভু একমাত্র পরমাত্মা ভগবান্ সৃষ্টির পূর্ব্বে ছিলেন। তিনি কেমন? শ্রীমদ্ভাগবতের শ্লোক অবলম্বন করিয়া বলা যায়।

"আনানামত্যুপলক্ষণঃ" অথবা "নানামত্যুপলক্ষণঃ"

শ্রীধর স্বামী এই দুই প্রকারের অর্থ করিয়াছেন। শ্রীজীবগোস্বামী বা শ্রীল বিশ্বনাথ, ইহার দ্বিতীয় প্রকারের অর্থই গ্রহণ করিয়াছেন এবং দ্বিতীয় প্রকারের অর্থই স্বাভাবিক। কারণাত্মনাং সত্ত্বেঽপি পৃথক্ প্রতীত্যভাবাদিত্যাহ অনানামত্যু-পলক্ষণঃ নানা দ্রষ্টৃদৃশ্যাদিমতিভির্নোপলক্ষ্যতে কারণাত্মা অর্থাৎ এক বিভু পরমাত্মা ভগবান্ আছেন, কিন্তু তাঁহার পৃথক্ প্রতীতি নাই, অর্থাৎ আমরা যে এই 'আছেন' বলিতেছি, ইহাও বলা যায় না। কাজেই এই যে জ্ঞান যাহা অনেক দ্রষ্টা ও অনেক দৃশ্য আশ্রয় করিয়া ক্রিয়ান্বিত, এই জ্ঞানের দ্বারা তিনি উপলক্ষিত নহেন। দ্বিতীয় অর্থ এইরূপ। সৃষ্টি-কালে যিনি নানামতির দ্বারা উপলক্ষিত হয়েন অর্থাৎ যোগীরা যাঁহাকে আত্মার অন্তর্যামীরূপে, জ্ঞানীরা যাঁহাকে সর্ব্বব্যাপক ব্রহ্মরূপে দেখিয়া থাকেন, সেই পরমাত্মা ও বিভু ভগবান্ই একমাত্র ছিলেন। 'আত্মেচ্ছানুগতৌ চ আত্মেচ্ছা যা তস্যা

অনুগতৌ সতি অর্থাৎ তাঁহার আত্মমায়া তাঁহাতেই লীন হইয়াছিল। আত্মমায়া বা আত্মেচ্ছা বলিতে সৃষ্ট্যাদি ইচ্ছা বুঝায়।

সে সময় একমাত্র তিনি প্রকাশ পাইয়াছিলেন, দৃশ্য বিশ্ব দেখিতে পান নাই। যখন তাহা দেখিতে পান নাই তখন বিশ্ব লীন হইয়াছিল ইহাই বুঝিতে হইবে। শ্রীজীব গোস্বামী এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। দৃশ্যং বিশ্যং নাপশ্যৎ। তদ্দর্শ-নাভাবাদেব তল্লীনমাসীদিত্যর্থঃ। তখন তিনি নিজেই নিজেকে "অসন্ত" আমি যেন থাকিয়াও নাই, এইরূপ অনুভব করিলেন। এইস্থানে একটু টীকা প্রয়োজন। শ্রীজীব গোস্বামী বলিয়াছেন

"আত্মানং আত্মাংশং পুরুষমপি অসন্তমিব মেনে ভেদেন নাপশ্যদিতি"

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী এই অর্থই আরও বিশদ করিয়া বলিয়াছেন। "সবৈ নিশ্চিতং দ্রষ্টা প্রকৃতীক্ষণকর্ত্তা পুরুষঃ তদা সৃষ্ট্যারম্ভ কালে দৃশ্যং সৃষ্ট্যার্থং দ্রষ্টব্যং প্রধানং নাপশ্যৎ। ততা সচাত্মানং স্বং বিরাজস্তমপি অসন্তমিব মেনে গৃহিণীং বিনা গৃহস্থ ইবেতি কাব্যরীত্যোক্তিঃ। যদ্ব উৎপৎস্যমনং আত্মানং সমষ্টি বিরাজং স্বস্মিন্ সূক্ষ্মরূপেণ সন্তমপ্যসন্তমেব মেনে প্রকৃতীক্ষণং বিনা তস্য প্রাকট্যাসম্ভবাদিতি ভাবঃ।" যিনি আপনাকে সম্পূর্ণ বলিয়া বিবেচনা করিলেন না তিনি কে? তিনি স্বয়ং ভগবান্ নহেন। তিনি প্রকৃতির ঈক্ষণ কর্ত্তা। (যাঁহাকে আমরা পুরুষ আখ্যা দিয়াছি। তিনি পুরুষোত্তম হইতে পারেন। প্রকৃতির সহিত সম্বন্ধ হইলেই তিনি পুরুষ এই আখ্যা লাভ করেন।) প্রকৃতির ঈক্ষণকর্ত্তা পুরুষ সৃষ্টির জন্য দ্রষ্টব্য যে প্রধান তাহাকে দেখিতে পান নাই। তাহার ফলে নিজে যেন থাকিয়াও নাই, এই প্রকারে নিজেকে অনুভব করিলেন। কাব্যের ভাষায় গৃহস্থ যেমন গৃহিণী ব্যতীত আপনাকে

অপূর্ণ বলিয়া বিবেচনা করেন আপনাকেও ঠিক সেইরূপ অনুভব করিলেন। অথবা আপনার যে রূপ অর্থাৎ সমষ্টি বিরাজ, রূপ যাহা উৎপাদিত হইবে তাহা নিজের মধ্যেই সূক্ষ্মরূপে রহিয়াছে, কিন্তু প্রকৃতি-ঈক্ষণব্যতীত তাহার প্রাকট্য হইতেছে না, এই অবস্থায় আপনাকে যেন থাকিয়াও নাই এইরূপ অনুভব করিলেন।

তখন তাঁহার ইচ্ছায় নিদ্রিতা মায়াশক্তি জাগরিতা হইলেন। এই মায়াশক্তি দ্রষ্টার দৃশ্যানুসন্ধানরূপা এবং কার্য্যকারণরূপা। এই মায়ার দ্বারাই বিভু এই বিশ্ব নির্ম্মাণ করিয়াছেন। "শক্তিত্বেন নিমিত্তরূপত্বং সদসদাত্মকত্বেনোপাদানরূপত্বঞ্চাংশতো ব্যঞ্জিতং। শক্তি বলিয়া বিশ্ব-সৃষ্টির নিমিত্ত কারণ আর সদসদাত্মক বলিয়া উপাদানরূপ।

এইবার সৃষ্টির কথা বর্ণিত হইতেছে :—

কালবৃত্ত্যাতু মায়ায়াঃ গুণময্যামধোক্ষজঃ।
পুরুষেণাত্মভূতেন বীর্য্যমাধত্ত বীর্য্যবান্॥

শ্রীজীব গোস্বামী এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। প্রথম শ্লোকে বলা হইয়াছে একমাত্র ভগবানই ছিলেন, ইনি অধোক্ষজ ভগবান। এই অধোক্ষজ ভগবান্ প্রকৃতিদ্রষ্টা পুরুষের কর্ত্তৃত্বে, 'আত্মভূতেন' নিজের অংশের দ্বারায় "স্বাংশেন দ্বারভূতেন" কাল যাহার বৃত্তি, সেই যে মায়া, সেই গুণময়ী অব্যক্ত মায়ায় জীব নামক বীর্য্য অর্থাৎ চিদাভাস আধান করেন।

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর ব্যাখ্যা মায়াভর্ত্তা যে আদি পুরুষ তাঁহারও যিনি অংশী সেই মহাবৈকুণ্ঠনাথ ভগবান্ই সর্ব্বকারণ এবং আশ্রয়তত্ত্ব। ইহা দেখাইয়া সৃষ্টির আরম্ভ বর্ণনা করিতেছেন! কালের প্রাথমিক বৃত্তি দ্বারা, মহাপুরুষের নিশ্বাসত্যাগের প্রথমক্ষণের দ্বারা অধোক্ষজ মহা বৈকুণ্ঠনাথ ভগবান্ তাঁহার স্বাংশরূপ মায়ার অধিষ্ঠাতা যে আদি পুরুষ তাঁহার দ্বারা দূর হইতে দর্শনের দ্বারা মায়াকে ভোগ করিয়া সেই মায়ায় চিদাভাসাখ্যা যে জীব-

শক্তি তাহাই আধান করিলেন। ভগবদ্গীতাতেও কথিত হইয়াছে

মম যোনির্মহদ্ব্রহ্ম তস্মিন গর্ভং দদাম্যহং।

অর্থাৎ প্রলয়ে কাম-কর্ম্মানুশয়বস্ত ক্ষেত্রজ্ঞ যাহা তাঁহাতে লীন হইয়া থাকে তাহাকে সৃষ্টি-সময়ে ক্ষেত্রের সহিত সংযোজিত করেন। গীতার টীকায় শ্রীশ্রীধর স্বামী ও শ্রীল মধুসূদন সরস্বতী পাদ এই রূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। মায়া শক্তি ও জীব শক্তির মেলনের দ্বারাই জগতের উৎপত্তি সম্ভব। এই মায়া শক্তির দ্বারাই ক্ষেত্রজ্ঞশক্তি তারতম্যে বিরাজিত। জীবশক্তি মায়াশক্তির অধীন হইল। কিন্তু শক্তি অনন্ত বলিয়া মায়া শক্তিতে প্রবেশ করিলেন না, এ প্রকারেরও অনন্ত জীব থাকিয়া গেলেন। তাঁহারা বিষ্বকসেন প্রভৃতি নামে পরিচিত, তাঁহারা ব্যক্ত ও অব্যক্ত, তাঁহারাই নিত্য-সিদ্ধ।

শ্রীজীব গোস্বামী মহোদয় ও শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী মহোদয় সৃষ্টিতত্ত্বের ব্যাখ্যায় শ্রীমদ্ভাগবতের যে গূঢ় রহস্য ব্যক্ত করিয়াছেন, তাঁহাদের টীকার সাহায্যে তাহা পরিদৃষ্ট হইল। শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতেও এই সিদ্ধান্তই পরিদৃষ্ট হইবে। আমরা এই প্রবন্ধের প্রারম্ভে পরব্যোমের বাহির হইতে যে অংশ শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে বর্ণনা করিয়াছেন তাহার উল্লেখ করিয়াছি, এই স্থানে তাহার পূর্ব্বাংশ ব্যাখ্যা করিতে পারি। এই যে পূর্ব্বাংশ যাহা আমরা বর্ণনা করিতেছি, তাহাই বাঙ্গালা দেশের বৈষ্ণব-গণের বিশেষ সিদ্ধান্ত। (Special revealation) ইহা অবশ্য নূতন কথা নহে প্রাচীন শাস্ত্রে ইঙ্গিতে আভাসে এবং অল্প কথায় ইহা প্রচারিত হইয়াছে। শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর কৃপায় তাঁহার অনুবর্ত্তী গোস্বামী মহোদয়গণ ইহা বিশদরূপে প্রচার করিয়া গিয়াছেন।

প্রকৃতির পারে, পরব্যোমনামে ধাম আছে। সেই স্থানে কৃষ্ণবিগ্রহ বিভুত্বাদি গুণবান্। সর্ব্বগ, অনন্ত ও বিভু, বৈকুণ্ঠ

প্রভৃতি ধাম ও কৃষ্ণ এবং তাঁহার অবতারবৃন্দ, নিত্যকাল তথায় বিরাজিত। এই পরব্যোমের উপরিভাগের নাম কৃষ্ণলোক। এই কৃষ্ণলোক দ্বারকা, মথুরা ও গোকুল এই তিনরূপে প্রকাশিত। সকলের উপরে শ্রীগোকুল ও ব্রজলোক। শ্রীগোলোকই শ্বেত দ্বীপ, তাহারই নাম বৃন্দাবন। শ্রীকৃষ্ণের শ্রীবিগ্রহের ন্যায় শ্রীগোলক ও সর্ব্বগ, অনন্ত ও বিভু। সেখানে ভূমি চিন্তামণি, বন কল্পবৃক্ষময়। চর্ম্মচক্ষুতে তাহা দেখা যায় না, প্রপঞ্চের মতই মনে হয়। প্রেমনেত্রে তাহার স্বরূপ প্রকাশিত হয়, সেখানে গোপগোপীসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের নিত্য বিলাস হইতেছে। ব্রহ্মসংহিতায় কথিত হইয়াছে :—

চিন্তামণিপ্রকরসদ্মসু কল্পবৃক্ষ
লক্ষাবৃতেষু সুরভীরভিপালয়ন্তম্।
লক্ষ্মীসহস্রশতসম্ভ্রমসেব্যমানং
গোবিন্দমাদি পুরুষং তমহং ভজামি॥

মথুরা ও দ্বারকায় নিজরূপ প্রকাশ করিয়া, চতুর্ব্যূহ হইয়া নানারূপে তিনি বিলাস করেন। বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ, ইহাই চতুর্ব্যূহ। দ্বারকা, মথুরা ও গোকুল এই তিন লোকে কৃষ্ণ কেবল লীলাময়, স্বগণসহ অনন্ত কাল ক্রীড়া করেন। পরব্যোমমধ্যে স্বরূপ প্রকাশ করিয়া নারায়ণরূপে বিবিধপ্রকারে বিলাস করেন। কৃষ্ণের স্বরূপ বিগ্রহ কেবল দ্বিভূজ, নারায়ণরূপে যখন বিলাস করেন তখন তাহা চতুর্ভুক্ত।

স্বরূপ প্রকাশ ও বিকাশ।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের এই বর্ণনায় স্বরূপ প্রকাশ ও বিলাস, এই দুইটি কথা ব্যবহৃত হইয়াছে, এই দুইটি কথার অর্থ নিরূপণ করা আবশ্যক। শ্রীলঘু-ভাগবতামৃত বলিয়াছেন পরাখ্য-শক্তি-বিজৃম্ভিত প্রপঞ্চাতীত শ্রীগোকুল পরব্যোমাদি ধামে শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ংরূপ, তদেকাত্মরূপ ও আবেশ এই তিনরূপে বিলাস করিতেছেন।

স্বয়ং-রূপস্তদেকাত্মরূপ আবেশনামকঃ।
ইত্যসৌ ত্রিবিধং ভাতি প্রপঞ্চাতীত ধামসু॥

স্বয়ংরূপ। এই তিনের মধ্যে যেরূপ অন্যকে অপেক্ষা না করিয়া প্রকট হয় তাহারই নাম স্বয়ংরূপ।

তদেকাত্মরূপ। যেরূপ স্বরূপতঃ (In essence) স্বয়ংরূপের সহিত একতা-বিশিষ্ট হইলেও আকারাদির দ্বারা অন্যরূপ তাহাকে তদেকাত্ম-রূপ বলে। বিলাস ও স্বাংশ ভেদে এই তদেকাত্মরূপ দ্বিবিধ।

অনন্যাপেক্ষি যদ্রূপং স্বয়ংরূপঃ স উচ্যতে।
যদ্রূপং তদভেদেন স্বরূপেন বিরাজতে।
আকৃত্যাদিভিরন্যাদৃক্ স তদেকাত্মরূপকঃ।
স বিলাসঃ স্বাংশ ইতি ধত্তে ভেদদ্বয়ং পুনঃ॥

স্বরূপ হইতে অন্যাকার অর্থাৎ কিঞ্চিৎ অঙ্গ-সন্নিবেশের বৈলক্ষণ্য-যুক্ত যেরূপ লীলা-বিশেষের জন্য প্রতিভাত হয় এবং প্রায়ই স্বমূলতুল্য, তাঁহাকে বিলাস বলে। গোবিন্দের বিলাস পরব্যোমনাথ আর পরব্যোমনাথের বিলাস বাসুদেব।

স্বরূপমন্যাকারং যৎ তস্য ভাতি বিলাসতঃ।
প্রায়েনাত্মসমং শক্ত্যা স বিলাসো নিগদ্যতে॥
পরব্যোমনাথস্তু গোবিন্দস্য যথা স্মৃতঃ।
পরব্যোমনাথস্য বাসুদেবস্তু যাদৃশঃ॥

বিলাস অপেক্ষা ন্যূন শক্তি যিনি প্রকাশ করেন, তাঁহাকে স্বাংশ বলে, যেমন সঙ্কর্ষণাদি পুরুষাবতার ও মৎস্যাদি লীলা-বতার। জ্ঞান ও শক্তি প্রভৃতির অংশের দ্বারা জনার্দ্দন মহত্তম জীবে আবিষ্ট হইয়া থাকেন, তাহাকে আবেশ বলে, যেমন বৈকুণ্ঠধামে নারদ, শেষ ও সনক প্রভৃতি।

শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত হইতে পূর্ব্বে যে নারায়ণরূপের কথা বলা হইল, তাহা শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্মশোভিত এবং মহা ঐশ্বর্য্যময়। শ্রী, ভূ, ও লীলা, এই তিন শক্তি সর্ব্বদা তাঁহার চরণ-সেবা করে। একমাত্র ক্রীড়াই তাঁহার ধর্ম্ম, জীবকুলকে কৃপা করিয়া তিনি নানারূপ কর্ম্ম করিয়া থাকেন। সালোক্য, সামীপ্য, সার্ষ্টি ও সারূপ্য এই চতুর্ব্বিধ মুক্তিদান করিয়া তিনি জীবকে নিস্তার দিয়া থাকেন। যাঁহারা সাযুজ্য মুক্তি লাভ করেন তাঁহারা এই ধামে প্রবেশ করিতে পারেন না। তাঁহারা বৈকুণ্ঠের বাহিরে সিদ্ধলোক নামে পরিচিত যে জ্যোতির্ম্ময় মণ্ডল আছে, প্রকৃতির পার সেই মণ্ডলে তাঁহারা বিশ্রাম করেন। সেই স্থান নির্ব্বিশেষ জ্যোতির্ম্মণ্ডল। প্রথম চতুর্ব্বূহের পর দ্বিতীয় চতুর্ব্বূহ। দ্বিতীয় চতুর্ব্বূহে রামের যে রূপ তাহার নাম মহাসঙ্কর্ষণ। জীব ভগবানের তটস্থাশক্তি, আর এই মহাসঙ্কর্ষণ সকল জীবের আশ্রয়। জীব ও কর্ম্ম অনাদি, আচার্য্য শঙ্কর শারীরক ভাষ্যে তাহার সুন্দর মীমাংসা করিয়াছেন। কিন্তু সেখানে একটি কথা মনে হয় যে মহাপ্রলয়ে জীব ও তাহার কর্ম্ম কোথায় ও কি ভাবে থাকে, আমরা এই সঙ্কর্ষণ-তত্ত্বের সাহায্যে তাহা বুঝিতে পারিতেছি।

তিন শক্তি।

পূর্ব্বে আমরা শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী মহোদয়ের টীকা হইতে পুরুষের নিশ্বাসের কথা উল্লেখ করিয়াছি, শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে তাহা নিম্নরূপ বর্ণিত হইয়াছে :—

দূর হৈতে পুরুষ করে মায়াতে অবধান।
জীবরূপ বীর্য্য তাতে করেন আধান॥
এক অঙ্গাভাসে করে মায়াতে মিলন।
মায়া হৈতে জন্মে তবে ব্রহ্মাণ্ডের গণ॥
অগণ্য অনন্ত যত অণ্ড সন্নিবেশ।
ততরূপে পুরুষ করে সভাতে প্রবেশ॥

পুরুষ নাসাতে যবে বাহিরায় শ্বাস।
নিশ্বাস সহিতে হয় ব্রহ্মাণ্ড প্রকাশ॥
পুনরপি শ্বাস যবে প্রবেশে অন্তরে।
শ্বাস-সহ ব্রহ্মাণ্ড পৈশে পুরুষ শরীরে॥
গবাক্ষের রন্ধ্রে যেন ত্রসরেণু চলে।
পুরুষের লোমকূপে ব্রহ্মাণ্ডের জালে॥

শ্রীমদ্ভাগবতে তৃতীয় স্কন্ধের পঞ্চম অধ্যায়ে কথিত হইয়াছে যে মহতত্ত্ব, অহঙ্কারত্ত্ব, মন জ্ঞানেন্দ্রিয়, কর্ম্মেন্দ্রিয়, শব্দ ও আকাশ, স্পর্শ ও বায়ু, রূপ ও তেজ, রস ও জল, এবং গন্ধ ও পৃথিবী অর্থাৎ পঞ্চ তন্মাত্রা ও পঞ্চ মহাভূত সৃষ্টি হওয়ার পর উহাদের অভিমানী দেবতাগণ পরস্পর মিলিত হইতে পারিলেন না। তখন তাঁহারা কৃতাঞ্জলিপুটে পরমেশ্বরের স্তব করিতে লাগিলেন। তখন ভগবান্ প্রথমে সংহননকারিণী শক্তির দ্বারা তাহার পর সহস্র বৎসর পরে অন্তর্যামীরূপে মহাতত্ত্বা দর ভিতর অনুপ্রবিষ্ট হইলেন। ইহাই পুরুষাবতার।

ভারতবর্ষের সাধনা .

বা

রাজর্ষি ভরতের উপাখ্যান।

প্রথম মনুর নাম স্বায়ম্ভুব, তাঁহার পুত্র প্রিয়ব্রত পরম ভাগবত ছিলেন এবং দেবর্ষি নারদের কৃপায় পরমার্থতত্ত্ব অবগত হইয়াছিলেন। এই কারণে তিনি স্বভাবত° নিবৃত্তি-মার্গের পথিক, পিতার আদেশেও রাজ্যভার গ্রহণ করিতে অসম্মত হইলেন। ব্রহ্মা প্রিয়ব্রতের অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া তাঁহার নিকট আসিলেন। গন্ধমাদন পর্ব্বতের গহ্বর; প্রিয়ব্রত, নারদের নিকট তত্ত্ববিদ্যা শিক্ষা করিতেছেন, আর স্বায়ম্ভুব মনু পুত্রকে বৈরাগ্য পথ হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিয়া রাজ-সিংহাসনে অভিষিক্ত করিবার জন্য সেখানে আসিয়া গুহার বাহিরে নিরাশ-হৃদয়ে অপেক্ষা করিতেছেন। অকস্মাৎ সেইস্থানে ব্রহ্মা আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ব্রহ্মা আসিয়া প্রিয়ব্রতকে বুঝাইলেন, ভগবান্ কেন এই প্রপঞ্চ রচনা করিয়াছেন; আরও বুঝাইলেন, যাহা শ্রীভগানের ইচ্ছা তাহারই অনুবর্ত্তন করিতে হইবে, কারণ তাহার প্রতিকূলে যাইবার কোনই উপায় নাই।

নিবৃত্তি ও প্রবৃত্তি।

ন তস্য কশ্চিত্তপসা বিদ্যয়া বা ন যোগবীর্য্যেণ মনীষয়া বা।
নৈবার্থধর্ম্মৈঃ পরতঃ স্বতো বা কৃতং বিহন্তুং
।৫

কোন জীব তপস্যা অথবা বিদ্যা কিম্বা সামাদি বুদ্ধিবল দ্বারা স্বতঃ বা পরতঃ শ্রীভগবানের নির্ম্মিত বিষয় অন্যথা

করিতে সমর্থ নহে। ভগবান্ যাহা করেন, অর্থের দ্বারা বা ধর্ম্মের দ্বারা কেহই তাহার বিনষ্ট করিতে পারে না।

নয়টি শ্লোকে ব্রহ্মা প্রবৃত্তিমার্গ ও নিবৃত্তিমার্গের রহস্য বুঝাইলেন। তাহাতে জীবমাত্রেরই বিবশত্ব, কর্ম্মকরণ-পারতন্ত্র্য ব্যাখ্যাত হইয়াছে। যাঁহারা মুক্ত তাঁহাদিগকেও প্রারব্ধ কর্ম্ম ভোগ করিতে হয়। সর্ব্বশেষে ব্রহ্মা গৃহস্থাশ্রমের প্রয়োজন ও সুবিধা বুঝাইলেন। ব্রহ্মার উপদেশের ফলে প্রিয়ব্রত গৃহী হইয়া রাজ্যভার গ্রহণ করিলেন। প্রিয়ব্রতের দশ পুত্রের মধ্যে জ্যেষ্ঠ আগ্নীধ্র, জম্বুদ্বীপের রাজ্যভার গ্রহণ করিলেন। আগ্নীধ্রের নয় পুত্র, এক এক পুত্র আগ্নীধ্রের পর জম্বুদ্বীপের এক এক বর্ষের অধিপতি হইয়াছিলেন। আগ্নীধ্রের পুত্র নাভি, নাভির পুত্র ঋষভদেব, ঋষভদেবের জ্যেষ্ঠ পুত্র রাজর্ষি ভরত। পূর্ব্বে জম্বুদ্বীপের যে বর্ষের নাম অজনাভ ছিল, রাজর্ষি ভরতের নামানুসারে তাহারই নাম ভারতবর্ষ হইয়াছে। ঋষভদেব শ্রীভগবানের অবতার, তাঁহার চরিত অতীব মঙ্গলাবহ, বর্ত্তমান প্রসঙ্গে আমরা ঋষভদেবের শেষ উপদেশ, যাহা তিনি তাঁহার পুত্রগণকে দিয়াছিলেন, সেই উপদেশ সংক্ষেপে আলোচনা করিব। ঋষভদেবের একশত পুত্র। তিনি পুত্রগণকে উপদেশ দিলেন, তপস্যাই একমাত্র উৎকৃষ্ট বস্তু, তপস্যা দ্বারা সত্ত্বশুদ্ধ হয় এবং তাহা হইতে অনন্ত ব্রহ্মসুখ লাভ হইয়া থাকে। তাঁহার উপদেশের যাহা শেষ কথা তাহা নিম্নের শ্লোক কয়টিতে কথিত হইয়াছে।

গৃহস্থাশ্রমের প্রয়োজন।

ভারতবর্ষ।

ঋষভদেবের উপদেশ।

তস্মাদ্ভবন্তো হৃদয়েন জাতাঃ সর্ব্বে মহীয়াংসমমুং সনাভং
অক্লিষ্টবুদ্ধ্যা ভরতং ভজধ্বং শুশ্রূষণং তদ্ভরণং প্রজানাং।
ভূতেষু বীরুদ্‌ভ্য উদুত্তমা যে সরীসৃপাস্তেষু সবোধনিষ্ঠাঃ।

তভো মনুষ্যাঃ প্রমথাস্ততোঽপি গন্ধর্ব্ব সিদ্ধা
বিবুধানুগা যে ॥
দেবাসুরেভ্যো মঘবৎ প্রধানা দক্ষাদয়ো ব্রহ্ম
সুতাস্তু তেষাং
ভবঃ পরঃ সোঽথ বিরিঞ্চবীর্য্যঃ স মৎপরোঽহং
দ্বিজদেবদেবঃ ॥
নব্রাহ্মণৈস্তুলয়ে ভূতমন্যৎ পশ্যামি বিপ্রাঃ কিমতঃ
পরং নু।
যস্মিন্নৃভিঃ প্রহুতং শ্রদ্ধয়াঽহমশ্নামি কামং ন
তথাগ্নিহোত্রে ॥
ধৃতা তনুরুশতী যে পুরাণী যেনেহ সত্বং পরমং
পবিত্রং।
শমোদমঃ সত্যমনুগ্রহশ্চ তপস্তিতিক্ষানুভবশ্চ যত্র।
মত্তোঽপ্যনন্তাৎ পরতঃ পরস্মাৎ স্বর্গাপবর্গাধি-
পতের্ন কিঞ্চিৎ।
যেষাং কিমু স্যদিতরেণ তেষামকিঞ্চনানাং
ময়িভক্তিভাজাং ॥
সর্ব্বাণি মদ্ধিষ্ণ্যতয়া ভবদ্ভিশ্চরাণি ভূতানি সুতা
ধ্রুবাণি।
সম্ভাবিতব্যানি পদে পদে বো বিবিক্তদৃগ্‌
ভিস্তদুহার্হণং মে ॥

হে পুত্রগণ, তোমরা সকলে আমার শুদ্ধসত্বময় হৃদয়ের দ্বারা উৎপন্ন হইয়াছ, অতএব মাৎসর্য্য পরিত্যাগ করিয়া স্থির-চিত্তে তোমাদের জ্যেষ্ঠ সহোদর মহত্তম যে ভরত, সেই ভরতের উপাসনা কর। ভরতের শুশ্রূষা করিলে তোমাদের প্রজাপালনাদি কর্ত্তব্য প্রতিপালিত হইবে।

ব্রাহ্মণ মাহাত্ম্য।

[ইদানীং ব্রহ্মণাশ্চ সেব্যা ইত্যাশয়েন তেষাং সর্ব্বেভ্য শ্রৈষ্ঠ্যমাহ পঞ্চভিঃ।] ভরতের যেমন আনুগত্য করিবে, তেমনি ব্রাহ্মণদিগেরও সেবা করিবে। চেতন ও অচেতন ভূতসমূহের মধ্যে স্থাবর শ্রেষ্ঠ, স্থাবর অপেক্ষা সর্পাদি সরীসৃপ প্রাণী শ্রেষ্ঠ, সরীসৃপ অপেক্ষা পশ্বাদি তদপেক্ষা মনুষ্য প্রধান। মনুষ্য অপেক্ষা প্রমথগণ, তদপেক্ষা গন্ধর্ব্বগণ, তদপেক্ষা সিদ্ধগণ, তদপেক্ষা দেবানুচর কিন্নরগণ, কিন্নর অপেক্ষা অসুরগণ এবং অসুরগণ অপেক্ষা দেবগণ শ্রেষ্ঠ। দেবতাদের মধ্যে ইন্দ্র প্রধান, ইন্দ্র অপেক্ষা দক্ষ প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ, তদপেক্ষা শঙ্কর মহৎ। শঙ্কর ব্রহ্মার বলে বলীয়ান্, অতএব ব্রহ্মা তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, ব্রহ্মা মৎপরায়ণ [ভগবৎ-পরায়ণ, ঋষভদেব ভগবান্‌রূপে বলিতেছেন]. অতএব ব্রহ্মা হইতে আমি শ্রেষ্ঠ। আমিও ব্রাহ্মণদিগের পূজা করিয়া থাকি। সুতরাং ব্রাহ্মণেরা আমা অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ, এই কারণে তাঁহারা সর্ব্বপূজ্য, তোমরা অবশ্যই ব্রাহ্মণদের সেবা করিবে।

আমি অপর কোন প্রাণীকে ব্রাহ্মণের সমান বলিয়া বিবেচনা করি না। ব্রাহ্মণ অপেক্ষা কেহই শ্রেষ্ঠ নাই। ব্রাহ্মণের মুখে শ্রদ্ধাপূর্ব্বক হোম করিলে তাহাতে আমার যেমন তৃপ্তিকর ভোজন হয়, অগ্নিহোত্র যজ্ঞে হোম করিলেও তাহাতে আমার তেমন তৃপ্তি হয় না। ব্রাহ্মণ আমারই বেদময়ী মূর্ত্তি, ঐ মূর্ত্তি অতিব রমণীয়। ব্রাহ্মণের মধ্যে পরম পবিত্র সত্বগুণ এবং শম, দম, সত্য, অনুগ্রহ, তপস্যা, তিতিক্ষা ও প্রতাপ এই সর্ব্বগুণ বিরাজ করিতেছে, সুতরাং তাহাদের অপেক্ষা আর শ্রেষ্ঠ কে?

ব্রাহ্মণের গুণ।

ব্রাহ্মণ অপেক্ষা নিস্পৃহও কেহ নাই, আমি অনন্ত ও পরাৎপর এবং স্বর্গ ও অপবর্গের অধিপতি, কিন্তু ব্রাহ্মণেরা আমার নিকটেও কিছু প্রার্থনা করে না, সুতরাং রাজ্যাদিলিপ্সা যে

তাঁহাদের নাই, ইহা বলাই বাহুল্য। ব্রাহ্মণেরা অকিঞ্চন, একমাত্র ভগবদ্ভক্তিই তাঁহাদের প্রার্থনীয়।

হে পুত্রগণ, যেমন ব্রাহ্মণের সেবা ও আনুগত্য করিবে সেইরূপ স্থাবর জঙ্গম প্রভৃতি যে সমস্ত ভূত আছে শ্রীভগবানের অধিষ্ঠান জানিয়া তাহাদেরও সম্মান করিও। তোমাদের দৃষ্টি যেন মৎসরাদি দোষশূন্য হয়, সর্ব্বভূতের প্রতি সম্মান করাই আমার পূজা।

ঋষভদেবের এই যে উপদেশ ইহা 'তত্ত্বতঃ' বুঝিতে হইবে, অর্থাৎ ইহার ভিতরে যে নিত্যসত্য নিহিত রহিয়াছে তাহা অবধারণ করিতে হইবে। তাহা হইলে আমরা রাজর্ষি ভরতের চরিত্র বুঝিতে পারিব। রাজর্ষি ভরতকে এই ভারতবর্ষের আত্মা বলিয়া গ্রহণ করুন। রাজর্ষি ভরতকে বুঝিলেই আমরা ভারতবর্ষকে বুঝিতে ও চিনিতে পারিব এবং তাহা হইলেই আমরা যথার্থরূপে ভারতবর্ষের লোক হইতে পারিব। কিন্তু আমরা সম্পূর্ণরূপে কখন বুঝিতে পারিব বলিতে পারি না, প্রত্যেক যুগ ইহার নব নব অর্থ আবিষ্কার করিবে, প্রত্যেক যুগ নিজের জ্ঞান ও শক্তি অনুসারে ইহা উপলব্ধি করিয়া তদনুসারে সাধনপথে অগ্রসর হইবে।

ভরত ও ভারতবর্ষ।

ঋষভদেবের উপদেশ এই ভরতের লীলার উপক্রমণিকা-স্বরূপ (Background) সুতরাং ঋষভদেবের উপদেশ প্রারম্ভে উত্তমরূপে আলোচনা করা দরকার। সপ্তদ্বীপা বসুন্ধরা, তাহার মধ্যে জম্বুদ্বীপ, জম্বুদ্বীপের নয়টি বর্ষের মধ্যে একটি বর্ষ ভারতবর্ষ। পুরাণে দেখিবেন এই ভারতবর্ষের কত প্রশংসা। ভারতবর্ষের তুলনা নাই, ইহা দেবনির্ম্মিত কর্ম্মভূমি, দেবতারাও এই ভারতবর্ষে মনুষ্য জন্ম প্রার্থনা করেন। ঋষভদেবের জ্যেষ্ঠপুত্র রাজর্ষি ভরত, ঋষভদেব তাঁহার পুত্রগণকে বলিলেন, তোমরা এই ভরতের অনুবর্ত্তী হইও, তোমরা এই ভরতের উপাসনা করিও তাহাতেই তোমরা তোমাদের জীবনের পূর্ণতা লাভ করিবে।

এই উপদেশ অনন্ত ভবিষ্যের অগণ্য মানবমণ্ডলীর প্রতি। মানুষ পৃথিবীতে বাসস্থান নির্ম্মাণ করিবে, নানাজাতি, নানাদেশ, নানাপ্রকারের জীবনযাত্রা পদ্ধতি, নানাপ্রকারের সভ্যতা। তাহার মধ্য দিয়া নানা দ্বীপে নানাবর্ষে এই মানব জন্ম জন্মান্তরের মধ্য দিয়া কর্ম্মফল ভোগ করিতে করিতে ক্রমে ক্রমে বিকশিত হইবে। দ্বীপের পর দ্বীপ, একটি ভাঙ্গিয়া যাইবে আর একটি গড়িয়া উঠিবে, বর্ষের পর বর্ষ, একটি জলপ্লাবনে সমুদ্রের কুক্ষিগত হইবে, আর একটি অতলস্পর্শ সমুদ্রগর্ভ হইতে ভূগর্ভস্থিত আগ্নেয় পদার্থের তাড়নায় মস্তক উত্তোলন করিবে। যুগের পর যুগ, মন্বন্তরের পর মন্বন্তর, কত পরিবর্ত্তনের মধ্য দিয়া ভূপৃষ্ঠ অগ্রসর হইবে। নব নব দেশে ও নব নব মহাদেশে নব নব জাতি কত সাম্রাজ্য স্থাপন করিবে, কত দিগ্বিজয়, কত যুদ্ধবিগ্রহ কত ধর্ম্মমত, কত শিল্প সাহিত্য, যুগে যুগে আসিবে ও কালস্রোতে ভাসিয়া যাইবে। ইহাই মানবজাতির ক্রমবিকাশ বা অভিব্যক্তি। এই পরিবর্ত্তনের মধ্যে ভারতবর্ষ মানবের চরম ও সনাতন আদর্শ লইয়া দাঁড়াইয়া থাকিবেন, ভারতবর্ষকে চিনিয়া ভারতের সনাতন সাধনায় প্রাণ মন সমর্পণ করিয়া যে কেবল ভারতবাসীকেই জীবনের সফলতা সাধন করিতে হইবে, তাহা নহে, পৃথিবীর যাবতীয় মানবকে এই আদর্শ গ্রহণ করিতে হইবে, নতুবা তাহারা প্রকৃত মনুষ্যত্ব লাভ করিবে না। ইহাই ঋষভদেবের উপদেশের প্রথম কথা। রাজর্ষি ভরতের চরিত্রে আমরা দেখিতে পাইব যে মানবমণ্ডলী ভারতবর্ষকে হঠাৎ একদিনে চিনিতে পারিবে না, ভারতবর্ষকেও নানারূপ পরিবর্ত্তনের মধ্য দিয়া চলিতে হইবে, শেষে একদিন ভারতবর্ষ বিজয়ী হইবে।

বিশ্ব-সভ্যতায় ভারতবর্ষের স্থান ও দান।

ঋষভদেবের উপদেশের দ্বিতীয় কথা ব্রাহ্মণের সেবা এই ব্রাহ্মণই ভারতবর্ষীয় সাধনার সর্ব্বোত্তম ফল। কথাটা কিছু স্পষ্ট করিয়া বুঝিয়া লওয়া দরকার।

ভারতবর্ষের সাধনার সর্ব্বোত্তম ফল ব্রাহ্মণ।

বর্ত্তমান পৃথিবীতে আমরা নানাজাতির নানাপ্রকারের সভ্যতা ও সাধনা লক্ষ্য করিতেছি। এই যে মানুষ ইহার শ্রেষ্ঠ পরিণতি কি, প্রত্যেক জাতিই তাহা চিন্তা ও কল্পনা দ্বারা অবধারণ করিতেছে; কেবল তাহাই নহে, সেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পরিণতি-প্রাপ্ত মানুষ গড়িয়া তুলিবার জন্যও প্রত্যেক জাতি চেষ্টা করিতেছে। কিন্তু এই শ্রেষ্ঠ বা সর্ব্বোত্তম মানুষের ধারণায় জাতিতে জাতিতে প্রভেদ। কেহ বলে বাহুবলই শ্রেষ্ঠ, কেহ বলে বুদ্ধিচাতুর্য্য শ্রেষ্ঠ, কেহ বলে সৌন্দর্য্য শ্রেষ্ঠ, কেহ বলে পরিচ্ছন্নতা শ্রেষ্ঠ। ভারতবর্ষ কি বলেন, তাহাই বিবেচ্য। ভারতবর্ষ বলেন ব্রাহ্মণই শ্রেষ্ঠ। এই ব্রাহ্মণই ঋষি, এই ব্রাহ্মণই ভক্ত। ইহাই ভারতবর্ষের মর্ম্মকথা। ভারতবর্ষে দিগ্বিজয়ী মহাবীরও আসিয়াছেন, প্রখর জ্ঞানসম্পন্ন বৈজ্ঞানিকও আসিয়াছেন, কবি, দার্শনিক প্রভৃতির কিছুই অভাব নাই, সর্ব্বোত্তম বলিয়া প্রতিষ্ঠালাভ করিলেন ব্রাহ্মণ। ঋষভদেব তাহার পুত্রদিগকে চারিটি কথা বলিয়াছেন, তপস্যা, রাজর্ষি ভরত, ব্রাহ্মণ ও সর্ব্বভূতে ভগবদ্দর্শন।

ব্রাহ্মণ কে।

এই ব্রাহ্মণ কে, তাহাও ঋষভদেব স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন। ঋষি, ভক্ত ও ব্রাহ্মণ একই কথা, একই তত্ত্ব। উপনিশদে আমরা ঋষির পরিচয় পাই। ঋষি কে? যিনি পরাৎপর পরমাত্মা শ্রীভগবান্‌কে দেখিয়াছেন বা পাইয়াছেন। জ্ঞানের মধ্যে তাঁহাকে পাইয়াছেন, সুতরাং তাঁহাদের জ্ঞানে সংশয় নাই, সঙ্কোচ নাই, তাঁহারা জ্ঞান-তৃপ্ত। ঋষি তাঁহারা, যাঁহারা আত্মার মধ্যে সেই পরমাত্মাকে পাইয়া কৃতাত্মা হইয়াছেন, নিজের পূর্ণতার উপলব্ধিতে চিরধন্য। ঋষি তাঁহারা, যাহারা হৃদয়ের অন্তরতম আস্বাদনের সামগ্রীরূপে সেই ভূমা পরমপুরুষকে লাভ করিয়া যাহা কিছু ক্ষুদ্র তাহার প্রতি আসক্তিহীন বা বীতরাগ হইয়াছেন। ঋষি তাঁহারা, যাহারা সেই দেবাদিদেব বাসুদেবকে সংসারের যাবতীয় পরিবর্ত্তনের ভিতর দর্শন

করিয়া ভয় ও ক্ষোভ হইতে পরিত্রাণ লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা পূর্ণশান্তির অধিকারী, প্রশান্ত। ঋষি তাঁহারা যাঁহারা আব্রহ্মস্তম্বপর্য্যন্ত সর্ব্বভূতে সেই নিত্য-লীলাময়ের নিত্য লীলার বিলাস দেখিয়া ধীর হইয়াছেন। ঋষি তাঁহারা যাঁহারা সকলের সহিত একই জীবনে জীবিত, একই চেতনায় সচেতন, অতএব সকলের সহিত যুক্ত হইয়াছেন, সকলের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছেন। এই জন্যই উপনিষদ্ বলিয়াছেন।

"সংপ্রাপ্যৈনম্ ঋষয়ো জ্ঞানতৃপ্তাঃ কৃতাত্মানো
বীতরাগাঃ প্রশান্তাঃ।
তে সর্ব্বগং সর্ব্বতঃ প্রাপ্য ধীরা যুক্তাত্মানঃ
সর্ব্বমেবাবিশন্তি॥"

মানবের মহত্ব বা শ্রেষ্ঠতা কোথায়? মানুষ সকলের আপন হইতে পারে এবং সকলকে আপনার করিতে পারে। মানুষের এই আত্মার মধ্যে যিনি তেজোময় ও অমৃতময় পুরুষ, তিনি সর্ব্বানুভূ, ইহাই বেদের উপদেশ ও ভারতবর্ষের সনাতনী বাণী; ব্রাহ্মণ শ্রীভগবানের বেদময়ী মূর্ত্তি, ব্রাহ্মণ সেই পুরুষকে লাভ করিয়া 'সর্ব্বানুভূ' হইয়াছেন অর্থাৎ অনুভূতির দ্বারা সকলকে আপনার করিয়া পাইয়াছেন। তাঁহারা স্পৃহাশূন্য, তাঁহারা সঞ্চয় করিতে চাহেন নাই, আপনাকে রক্ষা করিতে চাহেন নাই, তাঁহারা বিনাশ করিয়া লুণ্ঠন করিয়া বড় হইয়া বাঁচিতে চাহেন নাই। আপনাকে বিলাইয়া দিয়াছিলেন, তাই সর্ব্বানুভূ হইয়া অনুভূতির দ্বারা সকলকে পাইয়াছিলেন। ত্যাগের দ্বারা প্রকৃত ভোগ হয়, ভোগ করিলে ভোগ হয় না। "ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ" বেদের এই মন্ত্রে ব্রাহ্মণ সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন, তাই তাঁহারা অকিঞ্চন। বাধাহীন বিশ্ববোধ, ইহাই ব্রাহ্মণের সম্পদ্। ঋষভদেব তাঁহার পুত্রগণকে সে কথাও বলিয়াছিলেন।

বিশ্ব-বোধ।

এইবার পৃথিবীর ইতিহাস বা মানবের ক্রমবিকাশের ইতিহাস আলোচনা করিয়া দেখুন। পশুর ন্যায় একেবারে একাকী কবে মানুষ ভ্রমণ করিয়াছে কেহই জানে না। মানুষ পরিবারবদ্ধ হইয়াছে, তাহার বোধ ঐ পরিবারের সীমার মধ্যে আবদ্ধ। এক পরিবার অপর পরিবারের সহিত সংগ্রাম করিতেছে, এক পরিবার অপরকে ধ্বংস করিয়া পুষ্টিলাভ করিতেছে, এই এক স্তর! তাহারপর অনেকগুলি পরিবার একতাবদ্ধ হইয়া সমাজ গঠন করিয়াছে, মানুষের বোধের পরিধি এই সমাজ। সমাজে সমাজে দ্বন্দ্ব। তাহার পর অনেকগুলি সমাজ একত্র হইয়া একদ দেশের অধিবাসী হইয়া অপর দেশের অধিবাসীগণের সহিত সংগ্রাম ও প্রতিযোগীতা করিয়াছে। যাহাকে বর্ত্তমানযুগে 'জাতীয় ভাব' বলে তাহার জন্ম হইয়াছে। তাহার পর অনেকগুলি দেশ লইয়া সাম্রাজ্য বোধ। এই পর্যান্ত মানুষ আসিয়াছে; এখনও যে ঠিকমত আসিয়াছে তাহা বলিতে পারি না. কিন্তু আসিবার কল্পনা করিতেছে। কিন্তু ভারতবর্ষ ইহারও উপরে, ইহারও পরে। ভারতীয় সাধনার চরম পরিণতি ব্রাহ্মণ বা ঋষি বা ভক্ত, তাঁহার সম্পত্তি বিশ্ববোধ। বিশ্বজনীন ভ্রাতৃভাবেরও উপরে। কারণ এই বিশ্ববোধের মধ্যে পশু পাখী কীট পতঙ্গ চেতন অচেতন সকলেই আছে, ইহার বাহিরে কেহই নাই, ইহাই ভারতের সাধনা। বিজয়লাভ করিবার অপূরণীয় ও দুর্দ্দমনীয় উত্তেজনাময়ী বাসনা নহে, দুষ্ট আততায়ীকে বিক্রম-সংকারে হত্যা করিবার সামর্থ্যে নহে, অপরের প্রভু হইয়া গৌরবান্বিত হইবার চেষ্টায় নহে, প্রচণ্ড প্রতাপে অপরকে ভয় দেখাইয়া অবনত ও পদানত করিয়া রাখার সামর্থ্যে নহে, কোনরূপ বিরোধে বা বিচ্ছেদে ভারতবর্ষ নিজের সফলতা দেখে নাই, সকলের মধ্যে প্রবেশ করিয়া সকলকে আপনার করিবার যে তপস্যা ও সাধনা তাহাই ভারতবর্ষকে তাহার বিশিষ্টতা প্রদান করিয়াছে।

দশ বৎসর পূর্ব্বে "নবযুগের" সাধনা নামক গ্রন্থে যাহা লিখিয়াছিলাম, তাহারই একটি কথা উদ্ধৃত করিলে আমার বক্তব্য পরিস্ফুট হইবে :—

"কোন্ স্মরণাতীত কাল হইতে কত শত বিপ্লবের ঝড়, কত শত নিন্দা ও অত্যাচারের কুলিশ-গর্জ্জনময় ভীষণ করকাপাত ইহার মস্তকের উপর দিয়া চলিয়া গিয়াছে—কিন্তু এখনও সেই সমাজ, সেই ধর্ম্ম জগতের বক্ষে আপনার সৌম্য মহিমায় তুষারাভ্রকিরিটি যোগ সমাধিমগ্ন হিমাচলের মত অচল ও অটলভাবে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। মস্তকে উন্নততম ব্রহ্মজ্ঞানালোকিত শাশ্বত জ্যোতি-ধামের কিরণ কণা প্রতিফলিত, চরণে শত শত গুল্মলতা বৃক্ষ, অগণিত প্রাণীবৃন্দের বিচিত্র কলরোল! হিন্দু সমাজ বর্জ্জন কাহাকে বলে জানে না, সকলকেই আপনার করিয়া লইয়াছে, আস্তিক হউক নাস্তিক হউক, কর্ম্মী হউক, ভক্ত হউক, যোগী হউক, প্রেত-উপাসক হউক, অদ্বৈতবাদী হউক, দ্বৈতবাদী বা বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী হউক, হিন্দু কাহাকেও ত্যাগ করে নাই। এই বিরাট সমাজের প্রতি চাহিয়া যদি আমরা মনে করি যে ইহা মৃত তাহা হইলে সত্যের অপলাপ করা হইবে—হিন্দু-সমাজ অগ্রসর হইতেছে—সকল বিপ্লবের সকল পরিবর্ত্তনের যাহা সার অংশ তাহা আপনার করিয়া গ্রহণ করিতেছে—মানবের আধ্যাত্মিক একত্বের বিরাট্ আসনে বসিয়া এই মহাযোগী সকলকে আপনার করিয়া ভবিষ্যতের বিশ্বমানবকে এই মহাতত্ত্ব দেখাইবার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন। বৌদ্ধ ধর্ম্ম ভারতেরই ধর্ম্ম, আমরা বলি বৌদ্ধধর্ম্ম ভারত হইতে চলিয়া গিয়াছে, ইহা স্থূলদর্শীর ভ্রান্ত কথা, হিন্দুধর্ম্মের অস্থিতে অস্থিতে বৌদ্ধধর্ম্ম এখনও বিদ্যমান এবং চিরকালই বিদ্যমান থাকিবে। এই বিরাট হিন্দুত্ব—এই স্থানে বিশ্বমানবের জন্য যোগাসনে সমাসীন রহিয়াছে।"

স্বামী বিবেকানন্দের বাণী।

"The Secret of India" "What India Means" অর্থাৎ 'ভারতের মর্ম্মকথা' 'ভারতের তাৎপর্য্য কি' সে সম্বন্ধে স্বামী বিবেকানন্দ

তাঁহার "মদীয় গুরুদেব" (My Master) গ্রন্থে যাহা বলিয়াছেন এই প্রসঙ্গে তাহাও আলোচ্য। তিনি বলিয়াছেন, "বাহ্য পদার্থের মোহময় চাক্‌চিক্যের দ্বারা যাহাদের চক্ষু অন্ধ হইয়া গিয়াছে, খাওয়াপরা ও ঐহিক সুখভোগ করা যাহাদের জীবনের একমাত্র লক্ষ্য হইয়া পড়িয়াছে, রাজ্য ও ঐশ্বর্য্য লাভের জন্য যাহারা একান্তভাবে আকুল, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সুখ লাভই যাহাদের জীবনের একমাত্র আদর্শ, কাঞ্চন যাহাদের উপাস্য দেবতা, এই পৃথিবীতে সুখস্বচ্ছন্দে দিন কাটানই যাহাদের একমাত্র লক্ষ্য, মৃত্যুর পারে যাহাদের দৃষ্টি একেবারেই প্রসারিত হয় নাই, ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বিষয়-সমূহ ছাড়া আর যে কিছু আছে বা থাকিতে পারে, এ প্রকারের চিন্তাও যাহারা কখন করে নাই, তাহারা যদি ভারতবর্ষে যায় তাহা হইলে কি দেখিবে ? তাহারা দেখিবে দারিদ্র্য, মলিনতা, কুসংস্কার ও আবর্জ্জনা চারিদিক্ ছাইয়া রহিয়াছে। তাহারা এরূপ দেখিবে কেন ? কারণ তাহাদের ধারণা, সভ্যতার অর্থ বেশ ভূষা, একালের শিক্ষা, আর সামাজিক কায়দা। পাশ্চাত্য দেশের জাতিসমূহ চিরদিন তাহাদের বাহ্য ও পার্থিব অবস্থার উন্নতিসাধনের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছে, কিন্তু ভারতবর্ষের চেষ্টা অন্য দিকে। পৃথিবীর মধ্যে ভারতবর্ষই একমাত্র দেশ যাহার অধিবাসীগণ মানবজাতির ইতিহাসে কখনও নিজের দেশের সীমা ছাড়াইয়া অন্য দেশ অধিকার করিতে যায় নাই, ভারতবর্ষ কখনও লোভ-পরতন্ত্র হইয়া অন্যের ধন অপহরণ করিতে চেষ্টা করে নাই। ভারতবর্ষের একমাত্র অপরাধ যে তাঁহার জমি বড়ই উর্ব্বর এবং তাঁহার সন্তানসন্ততিগণ বড়ই নিপুণ ও বুদ্ধিমান, কাজেই কঠোর পরিশ্রম করিয়া তাহারা ধনশালী হইয়াছে এবং তাহাদের বৈভব দেখিয়া অন্য দেশের লোকেরা তাহাদের ধন-সমূহ লুণ্ঠন করিয়াছে। কিন্তু ভারতবর্ষ অন্য কর্ত্তৃক লুণ্ঠিত হইয়াও সন্তুষ্ট, অন্যে তাহাকে অসভ্য বলিয়াছে তাহাতেও তাঁহার দুঃখ নাই।

এই নির্য্যাতন ও অপমানের বিনিময়ে ভারতবর্ষ যুগে যুগে কি করিতেছেন? (আমরা স্বামিজীর ওজস্বিনী ভাষা উদ্ধার করিতেছি।)

" In return they want to sent to this world visions of the Supreme, to lay bare for the world the secrets of human nature, to rend the veil that conceals the real man because they know the dream, because they know that behind this materialism lives the real divine nature of man. . . Just as you are brave to jamp at the mouth of a cannon with a hurrah; just as you are brave in the name of patriotism to stand up and give up your lives for your country, so are they brave in the name of God. There it is that when a man declares that this is a world of ideas, that it is all a dream, he casts off clothes and propeıty to demonstrate that what he believes and thinks is true. There it is that a man sits on the banks of a river, when he has known that life is eternal and waits to give up his body just as nothing, just as you can give up a bit of straw. Therein lies their heroism ready to face death as a brother, because they are convinced that there is no death for them. Therein lies the strength that has made them invincible through hundreds of years of oppression and foreign tyranny. The nation lives to-day and in that nation even in the days of the direst disaster spiritual giants have never failed to arise.

"অত্যাচারের বিনিময়ে ভারতবর্ষ এই পৃথিবীর অধিবাসীগণকে সেই দিব্য দৃষ্টি দান করিতে চাহে যাহার সাহায্যে মানব সেই এক ও অদ্বিতীয় পরম পুরুষকে দেখিতে পায় ও চিনিতে

পারে। মানবপ্রকৃতির প্রকৃত রহস্য গুহাহিত অর্থাৎ গোপনে লুক্কায়িত, যে আবরণ সেই নিত্য মানুষটীকে লুকাইয়া রাখিয়াছে, ভারতবর্ষ সেই আবরণ বিদীর্ণ করিতে চায়। ভারতবর্ষ জানে ইহা স্বপ্ন এবং আরও জানে যে এই জড়বাদের পশ্চাতে প্রকৃত মানুষ লুকাইয়া রহিয়াছে। পাশ্চাত্যদেশের লোক তোমরা, তোমরা যেমন জয়ধ্বনি করিয়া নির্ভয়ে কামানের মুখে যাইতে পার, তোমরা যেমন দেশ হিতৈষণার নামে অত্যন্ত সাহসী, দেশের জন্য অনায়াসে ও অম্লানবদনে বীরের মত দাঁড়াইতে পার এবং নিজেদের জীবনও ত্যাগ করিতে পার, ভারতবাসীরা তেমনি ঈশ্বরের নামে এই সমুদয় কার্য্য হাসিতে হাসিতে করিতে পারে। এই ভারতবর্ষেই যখন কেহ ঘোষণা করে যে এই বিশ্ব, ভাবের সমষ্টিমাত্র ও স্বপ্নবৎ, তখন সে সত্য সত্যই তাহার পরিধেয় বস্ত্র ও ধন-দৌলত সমস্তই ফেলিয়া দেয় এবং প্রতিপাদন করে যে সে যাহা বলিতেছে, তাহা কেবল মুখের কথা মাত্র নহে, সে যাহা বলিতেছে তাহা সে কেবল বলিতেছে না, তাহাতে সে বিশ্বাস করে। এই ভারতবর্ষেই যখন একজন লোক বুঝিতে পারে যে আত্মা নিত্য, তখন সে নদীতীরে গিয়া উপবেশন করে এবং এই অকিঞ্চিৎকর দেহ বিসর্জ্জন করিবার জন্য প্রস্তুত হয়। তোমরা যেমন একটি তৃণকণা অবহেলায় ফেলিয়া দিতে পার, উহারা এই জড়দেহও ঠিক্ সেই ভাবেই ফেলিয়া দিতে পারে। ভারতবাসীগণের বীরত্ব এইখানে, তাহারা সহোদর ভ্রাতার ন্যায় মৃত্যুকে অভ্যর্থনা করে, কারণ তাহারা অতীব স্পষ্টরূপেই বুঝিয়াছে যে মৃত্যু বলিয়া কিছু নাই। ইহাই তাহাদের শক্তি, এই শক্তিতেই তাহারা শত শত শতাব্দীর অত্যাচার ও বৈদেশিক আক্রমণের মধ্যে আত্মরক্ষা করিতে পারিয়াছে। সেই প্রাচীন জাতি এখনও রহিয়াছে, এবং সেই জাতির মধ্যে আধ্যাত্মিক মহাবীরের আবির্ভাবের কখনও অভাব ঘটে নাই।

বর্ত্তমান সময়ে ইতিহাস বলিতে আমরা যাহা বুঝি তাহার সাহায্যেও এই সত্যই বহুল পরিমাণে প্রতিষ্ঠিত হয়। আর্য্য জাতির প্রথম শাখা ভারতবর্ষের অধিবাসী। ইহাদের উপর মনু যে সাধনার ভার দিলেন তাহার নাম ধর্ম্ম। ধর্ম্ম বলিতে কি বুঝায়, তাহা বর্ত্তমান কালে বিশেষভাবে চিন্তা না করিলে ধরিতে পারা যাইবে না। ধর্ম্ম বলিতে বিশ্বের সেই চরম ও পরম বিধান বুঝায়, ভারতের ঋষি বেদের সাহায্যে সেই পরম সত্যের সন্ধান পাইলেন এবং কি প্রকারে ব্যক্তিগত জীবনে, পারিবারিক জীবনে, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনে সেই পরম সত্যের প্রতিষ্ঠা হইতে পারে তাহার আনুপূর্ব্বিক ব্যবস্থাও পাইলেন। অধিকারীভেদে ধর্ম্ম সুনির্দ্দিষ্ট হইল, প্রত্যেক মানব-সন্তান স্বীয় কর্ত্তব্য পালন করিয়া অগ্রসর হইল। ইহাই চরম আদর্শ। ভারতবর্ষ ইহা পাইলেন ও পালন করিলেন, কিন্তু সমগ্র জগৎকে এই মহা সত্য এবং এই সুনিয়ন্ত্রিত ধর্ম্মশাসিত জীবন পাইতে হইবে। ভারতবর্ষ যাহা সম্পূর্ণরূপে বা সমগ্র ভাবে পাইয়াছিলেন তাহাই ক্রমশঃ পৃথিবীর অন্যান্য শাখার মধ্যে বিভাজিত হইয়া প্রদত্ত হইল। সমগ্র মানবজাতি সুদীর্ঘকালের অর্থাৎ বহু বহু জন্মের সাধনা ব্যতীত ভারতবর্ষের এই মহা সত্য গ্রহণ করিতে পরিবে না, আবার সমগ্র মানবজাতিকে এই মহা সত্যে দীক্ষিত করার পূর্ব্বে ভারতেরও নিস্তার নাই। ইহাই মনুর অভিপ্রায়, সুতরাং ইহা সুসিদ্ধ হইবেই।

ভারতের বৈশিষ্ট্য ও ধর্ম্ম।

আর্য্যজাতির দ্বিতীয় শাখা প্রাচীন মিশরীয় জাতি, ভারতের ধর্ম্ম সাধনার এক অংশ মিশরে প্রদত্ত হইল। মিশরের মূল মন্ত্র বিজ্ঞান। সেই প্রাচীন মিশরীয় জাতি এখন আর জগতে নাই, তাহাদের সে ধর্ম্ম-সাধনাও নাই। তাহাদের সাধনার মূল মন্ত্র ছিল বাহ্য শৃঙ্খলা, একালে যাহাকে বলিব Science, প্রাচীন মিশরের ধর্ম্ম-সাধনা জ্যোতির উপাসনা, ভারতের তন্ত্রের অনেক ব্যাপার মিশর দেশে ছিল, তাহার প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে

মিশরে বিজ্ঞান।

পারসিক জাতির পবিত্রতা।

তাহার পর পারস্য দেশে আর্য্যজাতির আর এক শাখা সুবিশাল সাম্রাজ্য স্থাপনা করিয়া এক অভিনব সভ্যতার জয়-পতকা উড্ডীন করিল, ইহারা পার্সি জাতি, ইহারা অগ্নির উপাসক; জরাথুস্ত্র ইহাদের প্রবর্ত্তক। শুদ্ধি ইহাদের মুলমন্ত্র, 'ভূত-গ্রামকে অপবিত্র করিও না,' ইহাই তাহাদের মূলমন্ত্র। পারস্য দেশে আর এখন সে জাতি নাই, সে ধর্ম্মের সাধনাও নাই। এই ধর্ম্মাবলম্বী যাঁহারা আছেন তাঁহারা এখন ভারতবর্ষে।

গ্রীসের সৌন্দর্য্য।

তাহার পর আর এক শাখা গ্রীক্ জাতি, অর্ফিয়াসের সঙ্গীতরোলে ইহারা জীবনের গূঢ় বার্ত্তা প্রাপ্ত হইল, ইহারা সৌন্দর্য্যের উপাসক। ভারতের সহিত প্রাচীন গ্রীসের অনেক আদান প্রদান হইয়াছে। এখন সে গ্রীক্ জাতি নাই। তাহার

রোমের বিধি।

পর রোম, বিধান বা আইনের পতাকা লইয়া তাহারা মহা-সাম্রাজ্য স্থাপন করিয়াছিল, আজ সে জাতিও নাই। আজ যাহারা জগতে প্রধান তাহাদের মূল মন্ত্র ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য। তাহারাও আর্য্য-

ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য।

জাতির শাখা। এই ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের যাহা হিতকর ফল, তাহারা তাহা উপার্জ্জন করিয়াছে, এখন দেখিতেছি তাহারা লালসা, দ্বন্দ্ব ও সংঘর্ষের মধ্য দিয়া আত্মহত্যার পথে ধাবমান। এই গেল একদিক্ আর একদিকে আর্য্যজাতিরও পূর্ব্বের জাতি জাপান নব-জাগরণে জাগ্রত—ভারতবর্ষে পৃথিবীর যাবতীয় ধর্ম্মাবলম্বী লোক, যাবতীয় প্রাচীন ও আধুনিক সভ্যতার উত্তরাধি-কারীগণ সমবেত হইয়াছে। একদিকে দ্বন্দ্ব ও সংঘর্ষ, আর এক দিকে মিলন ও সমবায়—এই উভয়ের মধ্যে বৈবস্বত মনু তাঁহার সংকল্পের তরণী চালাইয়াছেন। যাঁহারা তত্ত্ববিৎ তাঁহারা বুঝিতে পারিয়াছেন, অদূর ভবিষ্যতে এই ভারতবর্ষে এক নব-মানবতার উদ্ভব হইবে। ভারতেরই সনাতন ধর্ম্ম তাহার প্রাচীন বৈদিক সরলতা ও সম্ভোগের মধ্যে সগৌরবে দণ্ডায়মান হইবে। সেই ধর্ম্মেরই নাম ভাগবতধর্ম্ম, সেই ধর্ম্মই নদীয়ার প্রেমধর্ম্ম। সুতরাং আমরা বেশ বুঝিতে পারিতেছি যে ঋষভদেব

তাঁহার পুত্রগণকে ডাকিয়া ভরতের অনুবর্ত্তী হইবার জন্য যে উপদেশ দিয়াছিলেন, তাহার মর্ম্ম কত গভীর, এবং মানবজাতির ইতিহাসে সেই উপদেশ কি প্রকারে সফল হইতেছে।

তপস্যা ও ব্রাহ্মণ।

ঋষভদেব তাঁহার পুত্রগণকে যে উপদেশ দিলেন তাহাতে আমরা তিনটি মহাসত্যের পরিচয় পাই। তপস্যা, ব্রাহ্মণ ও ভারতবর্ষ। তপস্যার জন্য ব্রাহ্মণ বরণীয় আর তপস্যা ও ব্রাহ্মণের জন্য ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠতা। এই তপস্যা ও ব্রাহ্মণ কখন যদি নষ্ট হইয়া যায়, তাহা হইলে ভারতবর্ষের উপর যে বিশেষ কার্য্যের ভার রহিয়াছে, ভারতবর্ষ সেই বিধাতৃ-নির্দ্দিষ্ট কার্য্যভার হইতে বঞ্চিত হইবে এবং তাহা হইলে ভারতবর্ষের অস্তিত্ব অন্যান্য প্রাচীন দেশের ন্যায় লুপ্ত হইয়া যাইবে। মানুষের ধর্ম্ম বা মনুষ্যত্ব যাঁহার জীবনে সর্ব্বোন্নত অবস্থায় আসিয়াছে, জড়ত্ব ও পশুত্বকে জয় করিয়া একদিকে সাধারণ মানব এবং আর এক দিকে পিতৃলোক, দেবলোক ও ব্রহ্মলোকের সহিত সেতু বা যোগসূত্র রূপে যিনি সমাজে প্রতিষ্ঠিত, তিনিই ব্রাহ্মণ। The mediator between the seen and the unseen, the mediator between man and God. দৃশ্য ও অদৃশ্যের মধ্যে, মানব ও ভগবানের মধ্যে যোগসূত্ররূপে ব্রাহ্মণ মানব জগতে বিরাজমান।

মনুসংহিতার মত।

মনুসংহিতা এ সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন তাহা এই প্রসঙ্গে আলোচ্য।

> ঊর্দ্ধং নাভের্মেধ্যতরঃ পুরুষঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।
> তস্মান্মেধ্যতমং ত্বস্য মুখমুক্তং স্বয়ম্ভুবা॥
> উত্তমাঙ্গোদ্ভবাজ্জৈষ্ঠ্যাদ্ ব্রহ্মণশ্চৈব ধারণাৎ।
> সর্ব্বস্যৈবাস্য সর্গস্য ধর্ম্মতো ব্রাহ্মণঃ প্রভুঃ॥
> তং হি স্বয়ম্ভূঃ স্বাদাস্যাত্তপস্তপ্ত্বাদিতোঽসৃজৎ।
> হব্যকব্যাভিবাহ্যায় সর্ব্বস্যাস্য চ গুপ্তয়ে॥

যস্মাস্তেন সদাশ্নন্তি হব্যানি ত্রিদিবৌকসঃ।
কব্যানি চৈব পিতরঃ কিন্তুতমধিকং ততঃ ॥
ভূতানাং প্রাণিনঃ শ্রেষ্ঠাঃ প্রাণিনাং বুদ্ধিজীবিনঃ।
বুদ্ধিমৎসু নরাঃ শ্রেষ্ঠা নরেষু ব্রাহ্মণাঃ স্মৃতাঃ ॥
ব্রাহ্মণেষু তু বিদ্বাংসো বিদ্বৎসুকৃতবুদ্ধয়ঃ।
কৃতবুদ্ধিষু কর্ত্তারঃ কর্ত্তৃষু ব্রহ্মবেদিনঃ ॥
উৎপত্তিরেব বিপ্রস্য মূর্ত্তির্ধর্ম্মস্য শাশ্বতী।
সহি ধর্ম্মার্থমুৎপন্নো ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে ॥
ব্রাহ্মণো জায়মানো হি পৃথিব্যামধিজায়তে।
ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং ধর্ম্মকোষস্য গুপ্তয়ে ॥
সর্ব্বং স্বং ব্রাহ্মণস্যেদং যৎকিঞ্চিজ্জগতীগতম্।
শ্রৈষ্ঠ্যেনাভিজনেনেদং সর্ব্বং বৈ ব্রাহ্মণোঽর্হতি ॥
স্বমেব ব্রাহ্মণো ভুঙ্‌ক্তে স্বং বস্তে স্বং দদাতি চ।
আনৃশংস্যাদ্‌ব্রাহ্মণস্য ভুঞ্জতেহীতরে জনাঃ ॥

আচার্য্য কুল্লুক ভট্টের টীকানুযায়ী উদ্ধৃত অংশের বঙ্গানুবাদ। পুরুষের আপাদ মস্তক সমস্তই পবিত্র। নাভির উর্দ্ধভাগ পবিত্রতর, মুখ পবিত্রতম; ইহা ব্রহ্মা স্বয়ং বলিয়াছেন। পুরুষের পবিত্রতম অংশ অর্থাৎ মুখ হইতে ব্রাহ্মণ জন্মাইয়াছেন, তাঁহার জন্ম সকল বর্ণের অগ্রে, তিনিই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক কৃতিত্বের সহিত বেদকে ধারণ করিয়া রহিয়াছেন বলিয়া ব্রাহ্মণই সমুদয় সৃষ্টির ধর্ম্মানুশাসনের কর্ত্তা। দেবলোক ও পিতৃলোক হব্যকব্য পাইবেন এবং তাহার ফলে নিখিল জগৎ সুরক্ষিত হইবে, এই উদ্দেশ্যে স্বয়ম্ভু ব্রহ্মা তপস্যা করিয়া সর্ব্বাগ্রে স্বকীয় মুখ হইতে ব্রাহ্মণকে সৃষ্টি করিয়াছেন। স্বর্গবাসী দেবগণ যাঁহার মুখে হবণীয় দ্রব্যসামগ্রী সর্ব্বদা ভোজন করেন সেই ব্রাহ্মণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এই জগতে আর কে

আছে ? সৃষ্ট-পদার্থের মধ্যে যাহাদের প্রাণ আছে তাহারা শ্রেষ্ঠ, প্রাণিদিগের মধ্যে যাহাদের বুদ্ধি আছে তাহারা শ্রেষ্ঠ, যাহারা বুদ্ধিসম্পন্ন তাহাদের মধ্যে মনুষ্য শ্রেষ্ঠ, মনুষ্যের মধ্যে ব্রাহ্মণই শ্রেষ্ঠ। ব্রাহ্মণগণের মধ্যে যাহারা বিদ্বান্, তাঁহারা শ্রেষ্ঠ, বিদ্বান্‌দিগের মধ্যে যাহাদের শাস্ত্রবিহিত অনুষ্ঠানে কর্ত্তব্য-বুদ্ধি আছে তাঁহারা শ্রেষ্ঠ, কৃতবুদ্ধি ব্যক্তিগণের মধ্যে যাঁহারা কর্ত্তব্যের অনুষ্ঠানকারী তাঁহারা শ্রেষ্ঠ, কর্ত্তব্য-কর্ম্মকারীর মধ্যে ব্রহ্মবেদী ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ। ব্রাহ্মণের দেহ, শাশ্বত ধর্ম্মের মূর্ত্তি, ধর্ম্মার্থে উৎপন্ন হইয়া ব্রাহ্মণ ব্রহ্মত্ব লাভ করিয়া থাকেন। যখন ব্রাহ্মণ জন্মগ্রহণ করেন, তখন তিনি পৃথিবীতলে সকলের উপরে প্রাধান্যে প্রতিষ্ঠিত হন এবং ধর্ম্মসমূহ রক্ষার জন্য সর্ব্ব-জীবের ঈশ্বরত্বে ব্রতী হন। ত্রিলোকের অন্তর্গত যাবতীয় ধন ব্রাহ্মণের নিজস্ব। সর্ব্ববর্ণের শ্রেষ্ঠ এবং উৎকৃষ্ট স্থানজাত বলিয়া ব্রাহ্মণই সমুদয় সম্পত্তি প্রতিগ্রহের উপযুক্ত পাত্র। ব্রাহ্মণ যাহা ভোজন করেন, যাহা পরিধান করেন, যাহা দান করেন, তাহা পরকীয় হইলেও নিজস্ব, যেহেতু ব্রাহ্মণেরই অনুগ্রহ বলে অপরাপর লোকে ভোজন পানাদি দ্বারা জীবিত রহিয়াছে।

ভরতের জীবনের প্রথম অধ্যায়।

রাজ্যভার গ্রহণ করিয়া নৃপতি ভরত যথাযথ প্রজাপালন করিলেন। যজ্ঞের দ্বারা যজ্ঞমূর্ত্তি ভগবান্ বিষ্ণুর অর্চ্চনাই তাঁহার জীবনের ব্রত ছিল। সূর্য্যাদি যাবতীয় দেবতার তিনি যথাবিধি পূজা করিতেন, কিন্তু তাঁহার চিত্ত কাম-বাসনায় বিতাড়িত হইয়া বহুমুখী হয় নাই, কারণ তিনি যখনই যে কোন দেবতার পূজা করিতেন তখনই সেই দেবতাকে এক ও অদ্বিতীয় শ্রীভগবান্ বাসুদেবের অঙ্গ বলিয়া বিবেচনা করিতেন। কাজেই "পৃথক্ পৃথক্‌দেবতাত্বেন পূজা হ্যনন্যতা-বিঘাতিনী নতু তদঙ্গত্বেনেতি" (বিশ্বনাথ) পৃথক্ পৃথক্

বহু দেবতা ও এক ঈশ্বর।

দেবতার পূজা অনন্যতা বা ঐকান্তিকতার হানিকর হয় নাই,

কারণ প্রত্যেক দেবতাকে সেই বাসুদেবের অঙ্গ বলিয়া বিবেচনা করিতেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

ভরতের সুনির্ম্মল চিত্তে মহতী ভক্তির উদয় হইল; ক্রমশঃ তাঁহার রাজ্য ভোগ শেষ হইলে তিনি পৈতৃক ধন-সম্পত্তি পুত্রগণের মধ্যে বিভাগ করিয়া দিলেন এবং সংসারাশ্রম পরিত্যাগ করিয়া পুলহাশ্রমে গমন করিলেন।

শান্ত উপবন, গণ্ডকী নদীর সলিল-বিধৌত হরিক্ষেত্রে পুলহাশ্রমে রাজর্ষি ভরতের জীবনের দ্বিতীয় অধ্যায় আরম্ভ হইল এখানে আর বাহিরের গোলযোগ নাই, স্বভাবজ বনফুল, কিশলয়, তুলসী, পার্ব্বত্য নদীর স্বচ্ছ জল এবং বনের ফল মূল লইয়া নিত্যই শ্রীভগবানের আরাধনা করেন। পরিধান মৃগচর্ম্ম, ত্রিসন্ধ্যা স্নান, মস্তকে কপিশবর্ণ জটাভার, উদয়োন্মুখ সূর্য্যমণ্ডলে রাজর্ষি ভরত, প্রতিদিন এই মন্ত্রের সাহায্যে হিরণ্ময় পুরুষের উপাসনা করিতেন।

হিরণ্ময় পুরুষের উপাসনা।

পরোরজঃ সবিতুর্জাতবেদো দেবস্য ভর্গো
মনসেদং জজান।
স্বরেতসাঽদঃ পুনরাবিশ্য বিচষ্টে হংসং গৃধ্রাণং
নৃষদ্রিঙ্গিরামিমঃ॥

সবিতা দেবতার অর্থাৎ সূর্য্যের সেই তেজঃ, যাহা প্রকৃতির পর ও শুদ্ধ-সত্বাত্মক, সেই তেজঃ, সেই তেজঃ ভক্তজনের অভিষ্ট-দাতা। সেই ভর্গ কর্ত্তৃক সঙ্কল্প মাত্রেই এই জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে, এবং সেই ভর্গ স্বকীয় চিচ্ছক্তি দ্বারা এই জগতে অন্তর্যামিরূপে প্রবেশ করিয়া তবিষয়সুখাভিকাঙ্খী আমার ন্যায় জীবকে কৃপায় পালন করিতেছেন, বুদ্ধিবৃত্তি-প্রবর্ত্তক সেই ভর্গেরই শরণাগত হই, সেই ভর্গ-বিষয়িণী যে আমার বুদ্ধি তাহা যেন কোন প্রকারে আবৃত না হয়।

মৃগ-শিশু।

একদিন রাজর্ষি ভরত মহানদী গণ্ডকীতে স্নান করিয়া নিত্য নৈমিত্তিক ও আবশ্যক কর্ম্ম সমুদয় সমাপন করিয়া শান্ত চিত্তে সেই নদীতীরে বসিলেন এবং একাগ্রচিত্তে প্রণব জপ করিতে লাগিলেন। এদিকে একটি গর্ভবতী হরিণী জলপান করিবার জন্য নদিতীরে আসিয়া উপস্থিত হইল, রাজর্ষি ভরত অবশ্য তাহাকে দেখিতে পান নাই, অকস্মাৎ এক ভয়ঙ্কর সিংহের গর্জ্জন উত্থিত হইল, রাজর্ষি ভরতের জপ ভাঙ্গিয়া গেল, তিনি চাহিয়া দেখিলেন ভীতা হরিণী আত্মরক্ষার জন্য নদী উল্লম্ফন উদ্দেশ্যে লম্ফ প্রদান করিল। হরিণী নদী অতিক্রম করিতে পারিল না, সে পূর্ণ-গর্ভবতী ছিল, তাহার গর্ভস্থ সন্তান নদীর জলে খসিয়া পড়িল এবং সেও নদীর জলে পড়িয়া সঙ্গে সঙ্গে প্রাণ হারাইল। এই দৃশ্য দেখিয়া রাজর্ষি ভরত সবেগে ঐ হরিণীর নিকট আসিলেন, দেখিলেন হরিণী মরিয়া গিয়াছে, কিন্তু সদ্যজাত শাবকটী সুস্থদেহে জীবিত। করুণার্দ্র চিত্তে রাজর্ষি সেই হরিণশিশুকে কোলে করিয়া নিজের আশ্রম-কুটিরে লইয়া আসিলেন। হরিণ-শিশুর প্রতি রাজর্ষির স্নেহ ক্রমশঃ বাড়িতে লাগিল, তাঁহার অভিমান জন্মিল, এই হরিণ-শিশুটি আমার এতদিন রাজর্ষি একমাত্র ভগবচ্চিন্তায় আত্মহারা ও বিহ্বল হইয়া থাকিতেন অন্যরূপ কোন চিন্তা কখনই মনের মধ্যে উদয় হইত না। এখন প্রতিদিন তাহার ব্যতিক্রম ঘটিতে লাগিল, তিনি সর্ব্বদাই চিন্তা করিতেন 'আহা, এই হরিণবালক বড়ই দীন, বড়ই অসহায়। ইহার আত্মীয় বন্ধু কেহই নাই। এই হতভাগ্য জীব আমারই শরণাগত। আমিই তাহার একমাত্র আপনার, আমা-ব্যতীত এ আর কাহাকেও জানে না।' কোথায় ভাল তৃণ পাওয়া যায়, কি প্রকারে তৃণ দিলে হরিণ শাবকটি বেশ তৃপ্তির সহিত খায়, রাজর্ষি তাহাই চিন্তা করিতেন। মনে মনে সর্ব্বদা ভয় হইত পাছে ব্যাঘ্র প্রভৃতি

কোন হিংস্র প্রাণী আসিয়া হরিণ-শিশুকে আক্রমণ করে। হরিণ শিশুও তাঁহার স্নেহে অতিশয় বশিভূত হইয়া পড়িল, সে আসিয়া কখন তাঁহার অঙ্গ-লেহন করে, কখন শরীরে মস্তক ঘর্ষণ করে, আবার রাজর্ষি তাহাকে ক্রোড়ে করেন, কখনও বা প্রীতিভরে তাহার মুখচুম্বন করেন। এই প্রকারে রাজর্ষি সেই হরিণ-শাবকের সহিত উপবেশন, শয়ন, ভ্রমণ, স্নান ও ভোজনাদি ব্যাপারে আসক্ত হইলেন। তিনি যখন কুশ, পুষ্প, যজ্ঞ-কাষ্ঠ, পত্র, ফল, মূল ও জল আহরণ করিবার জন্য অন্যত্র যাইতেন তখন হরিণ শাবকটিকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইতেন, কারণ তাঁহার সর্ব্বদাই ভয় হইত পাছে কোন হিংস্র প্রাণী তাহাকে আক্রমণ করে। পূজা করিতে করিতে হঠাৎ তিনি অন্যমনস্ক হইয়া পড়িতেন, তাঁহার মনে হইত, হরিণ-বালক বুঝি কোথায় চলিয়া গেল। তখন পূজা রাখিয়া বাহিরে আসিয়া হরিণ শিশুকে দেখিয়া যাইতেন।

ভরতের মৃগত্ব প্রাপ্তি।

এইরূপ অবস্থায় দিন যাপন করিতে করিতে অকস্মাৎ মৃত্যু আসিয়া উপস্থিত হইল। হরিণ শাবককে চিন্তা করিতে করিতে রাজর্ষি ভরতের মৃত্যু হইল এবং মৃত্যুর পরেই তিনি মৃগ-দেহ প্রাপ্ত হইলেন, কিন্তু পূর্ব্বজন্মের স্মৃতি বিনষ্ট হইল না। রাজর্ষি ভরতের জীবনের ইহাই তৃতীয় অধ্যায়। তাঁহার এই হরিণ হইয়া জন্মগ্রহণ করার ব্যাপার বিস্তৃত-রূপে আলোচনা করা আবশ্যক।

জন্মান্তর।

হিন্দু সাধনার ইতিহাসে জন্মান্তর-বাদের স্থান কোথায় সে সম্বন্ধেই নানারূপ মতভেদ রহিয়াছে। আধুনিক পদ্ধতিতে যাঁহারা প্রাচীন ও পরবর্ত্তী কালের শাস্ত্রসমূহ আলোচনা করিয়াছেন তাঁহারা বলেন বেদের যুগে জন্মান্তরবাদ ছিল না, কেবল জন্মান্তরবাদ নহে নরকে কর্ম্মানুযায়ী নানাবিধ যন্ত্রণা-ভোগের কথাও ছিল না। পরবর্ত্তী সময়ে অন্যান্য জাতির ধারণা হিন্দু-জাতির চিন্তারাজ্যে প্রবেশ করে, সেই সময়েই

হিন্দুগণ জন্মান্তরবাদে বিশ্বাস করিতে আরম্ভ করে। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের অনেকের এ সম্বন্ধে যাহা ধারণা আমরা প্রবন্ধান্তরে তাহা বর্ণনা করিব।

মানুষ ঠিক পশু হয় না।

আর একদল পণ্ডিত আছেন তাঁহারা জন্মান্তরবাদকে হিন্দু চিন্তার মৌলিক বিশ্বাস বলিয়া স্বীকার করেন, কিন্তু মানুষ মরিয়া পশু হয়, বা বৃক্ষ হয় ইহা স্বীকার করিতে চাহেন না। তাঁহারা বলেন একবার মানুষ হইলে আর পশু, পক্ষী বা বৃক্ষ হইতে হইবে না। এই মতের সমর্থক অনেক হেতু আছে। ইহাও স্বতন্ত্র-ভাবে আলোচ্য। কিন্তু রাজর্ষি ভরতের হরিণ-দেহে জন্মগ্রহণ করার ভিতরে একটি বড় গূঢ় রহস্য রহিয়াছে। তিনি হরিণ হইলেন বটে, কিন্তু তাঁহার মনে থাকিল যে আমি রাজর্ষি ভরত ছিলাম, শেষ জীবনে হরিণ-শিশুতে অতিমাত্রায় আসক্ত হইয়া মৃত্যুর পর হরিণদেহ লাভ করিয়াছি। এই স্মৃতি তাঁহার ভিতরে সম্পূর্ণরূপেই থাকিল। পুরাণে আরও অনেক মহাত্মার পশুদেহ প্রাপ্তির কথা দেখিতে পাওয়া যায় এবং সে সকল স্থলেও তাঁহাদের পূর্ব্বজন্মের স্মৃতি ছিল, ইহাই কথিত হইয়াছে। এইখানে চিন্তা করিতে হইবে, এই পশুত্ব-প্রাপ্তি কি প্রকারের। মানুষে ও পশুতে একটি বিশেষ প্রভেদ এই যে পশুর আত্মজ্ঞান নাই—মানুষের তাহা আছে। পশু জানে না যে সে ক্রুদ্ধ হইয়াছে, কিন্তু মানুষ জানিতে পারে যে সে ক্রুদ্ধ হইয়াছে। ক্রোধের উত্তেজনায় অনেক মানুষই অনেক সময়ে একেবারে পুরাপুরি পশু হইয়া পড়ে, ইহা সত্য; কিন্তু মানবদেহের বা মানবতার বিশেষত্ব এই যে মানুষ জানিতে সক্ষম যে সে ক্রুদ্ধ হইয়াছে। এই বিশিষ্টতার নাম আত্মজ্ঞান। (Self-consciousness) মানুষের এই আত্মজ্ঞান যে কেবল আছে তাহা নহে, এই আত্মজ্ঞান নিয়ত বৃদ্ধিশীল। মানবদেহ এই আত্মজ্ঞানের অনুশীলনের উপযোগী দেহ। এই আত্মজ্ঞানের বিনাশ নাই। এই আত্মজ্ঞানই তুরীয় চৈতন্য।

আত্মজ্ঞান যে অবিনশ্বর।

এই আত্মজ্ঞান প্রভাবেই মানুষ যখন মানুষ আর এই আত্মজ্ঞানের যখন বিনাশ নাই, তখন মানুষ কি প্রকারে পশু হইতে পারে, ইহাই বিবেচ্য। ইহার একমাত্র উত্তর এই যে মানুষের আত্ম জ্ঞানানুশীলনের যে সুযোগ, তাহা কাহারও কাহারও জীবনে কিছু দিনের জন্য রুদ্ধ বা নষ্ট (Suspended) হইয়া যায়। মানুষের ভিতরেও পশু আছে, উদ্ভিদ আছে, তাহাদের শাসিত ও নিয়ন্ত্রিত করিবার জন্য এই মানব দেহে যেটুকু খাঁটি মানুষ সেইটুকু অর্থাৎ সেই আত্মজ্ঞানটুকু রাজার মত অধিষ্ঠিত। এই রাজার মৃত্যু নাই, ইহা সত্য, কিন্তু রাজা সিংহাসনচ্যুত হইতে পারেন, অর্থাৎ এমন অবস্থা কিছু দিনের জন্য আসিতে পারে, যে সময়ে তিনি তাঁহার ভিতরের যে পশু তাহাকে একেবারে নিয়ন্ত্রিত করিতে পারেন না, সেই পশু অংশ (The animal part, that is the lower desires. the passions, the sensations) একটা পৃথক দেহ লইয়া কিছুদিন যাপন করে, আর সেই খাঁটি মানুষটির জ্ঞানের একটা রশ্মিমাত্র এই পশুদেহ এবং পশুজীবনে পতিত হয় বটে, কিন্তু তিনি পশুকে কোনরূপে শাসিত বা নিয়ন্ত্রিত করিতে পারেন না। তবে কেহ কেহ অর্থাৎ যাঁহারা সাধনরাজ্যে অগ্রসর তাঁহারা পশুকে চালনা করিতে পারেন, কিন্তু পশুকে ধ্বংস করিতে পারেন না।

রাজা ভরতের মৃগত্ব প্রাপ্তি সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবত বলিতেছেন—

এবমঘটমানমনোরথাকুলহৃদয়ো মৃগদারকাভাসেন স্বারব্ধ-কর্ম্মণা যোগারম্ভণতো বিভ্রংশিতঃ সযোগতাপসো ভগবদারাধন-লক্ষণাচ্চ। কথমিতরথা জাত্যন্তর এবকুণক আসঙ্গ সাক্ষান্নিঃ-শ্রেয়সপ্রতিপক্ষতয়া প্রাক্‌পরিত্যক্তদুস্ত্যজ-হৃদয়াভিজাতস্য।

অর্থাৎ সেই যোগতাপস ভরত এই প্রকারে অসম্ভব মনোরথ দ্বারা আকুলহৃদয় মৃগ-শাবকের ন্যায় প্রকাশমান আপন আরব্ধ কর্ম্ম-দ্বারা যোগানুষ্ঠান হইতে এবং ভগবদরাধনরূপ কর্ম্ম হইতে ভ্রংশিত হইলেন। নিজের আরব্ধরূপ কর্ম্ম হইতেই তাঁহার

যোগ ও ভগবদারাধনা বিনষ্ট হইল, কারণ পূর্ব্বে মুক্তির প্রতি-বন্ধক বলিয়া তিনি দুস্ত্যজ ঔরস সন্তানদিগকেও পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। এখন আবার মৃগীতনয়ে আসক্তি হইল কেন?

পূর্ব্বোদ্ধৃত অংশের ইহাই সাধারণ অর্থ। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী মহোদয় এই অংশের গভীর তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা বিশেষ ভাবেই আলোচ্য। শ্রীল বিশ্বনাথ বলিতেছেন হরিণ-শাবক আসিয়া রাজর্ষি ভরতের নিকট উপস্থিত হয় কেন? এবং তিনিই বা হরিণ-শাবকে স্নেহবদ্ধ হইয়া পড়েন কেন! ইহার কারণ তাঁহার অর্থাৎ রাজর্ষি ভরতের প্রারব্ধ কর্ম্ম। কিন্তু এই যে প্রারব্ধ কর্ম্ম ইহা দ্বিবিধ। শোভন ও অশোভন। প্রথম প্রকারের প্রারব্ধ, যাহাকে শোভন বলে তাহা প্রকৃত প্রস্তাবে প্রারব্ধ নহে, তাহা প্রারব্ধের তুল্য, শ্রীভগবান্ নিজ ইচ্ছায় তাহার বিধান করেন, এবং এই প্রারব্ধ ভোগের দ্বারা ভক্তের উৎকণ্ঠা বৃদ্ধি হয়। দ্বিতীয় প্রকারের প্রারব্ধ যাহাকে অশোভন প্রারব্ধ বলে, তাহা প্রাচীন প্রাকৃত কর্ম্মময়, ইহার ফলে ভোক্তা জীবের বিষয়াভিনিবেশ ঘটিয়া থাকে রাজর্ষি ভরতের এই যে মৃগ-জন্মলাভ, ইহা অবশ্য শোভন প্রারব্ধ। তিনি তাপস, ভক্তিযোগে ভগবদারাধনা করিয়াছেন এবং সমুদয় বিষয় ত্যাগ করিয়াছেন। ভক্তিযোগের পথ এত বিঘ্ন-সমাকুল নহে. সুতরাং রাজর্ষি ভরত যে ভগবদারাধনা হইতে বিভ্রংসিত হইলেন, তাহা শ্রীভগবানেরই ইচ্ছা। সুতরাং ইহাকে রাজর্ষি ভরতের প্রারব্ধ কর্ম্ম না বলিয়া প্রারব্ধ কর্ম্ম-ভাস বলিলেই সঙ্গত হয় "যথা জীবন্মুক্তানামভিমানাভাবেঽপ্যভিমানাভাসস্তথৈব জাতরতিভক্তানাং প্রারব্ধাভাবেঽপি প্রারব্ধাভাসঃ।" যেমন জীবন্মুক্তগণের অভিমান না থাকিলেও বিশেষ ক্ষেত্রে অভিমানের আভাস দেখিতে পাওয়া যায়, জাতরতি ভক্তগণেরও সেইরূপ প্রারব্ধ না থাকিলেও প্রারব্ধাভাস

দেখিতে পাওয়া যায়। মৃগশিশুরও সুখ-প্রারব্ধ নতুবা রাজর্ষি ভরতেরই বা তাঁহাকে পালন করিবার প্রবৃত্তি জন্মিবে কেন ?

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি মহোদয়ের এই সিদ্ধান্তের সার কথা এই যে রাজর্ষি ভরতের এই মৃগত্ব-প্রাপ্তি বা ইহার পরের জন্মে জড়ভাবাপন্ন ব্রাহ্মণের দেহ-প্রাপ্তির মধ্যে কোনরূপ অবাঞ্ছনীয় দুর্ঘটনা দেখিবেন না, শ্রীভগবানের মঙ্গলময়া ইচ্ছা ইহার ভিতরে রহিয়াছে। তাহাই উপলব্ধি করিতে চেষ্টা করিবেন।

মৃগত্বপ্রাপ্তি অকল্যান নহে।

মৃগজন্ম প্রাপ্ত হইয়া রাজর্ষি ভরত চিন্তা করিলেন হায় কি কষ্ট ! আমি সাধুদিগের পথ হইতে ভ্রষ্ট হইলাম। সমস্ত সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া জনশূন্য পুণ্যারণ্যে বাস করিতেছিলাম, শান্ত হৃদয়ে ভগবৎ-কথা শ্রবণ, মনন, সঙ্কীর্ত্তন এবং শ্রীভগবানের আরাধনায় ও অনুস্মরণে একান্ত ভাবে অভিনিবিষ্ট হইয়া দিন যাপন করিতেছিলাম, ক্ষণ-মাত্রও বৃথা ক্ষেপন করিতাম না, মনকে সর্ব্বভূতাত্মা ভগবান্ বাসুদেবে স্থাপিত ও স্থিরীকৃত করিয়াছিলাম। শেষ কি না সেই মন এক মৃগ-শাবকের প্রতি স্নেহে অনুরক্ত হইয়া সেই হরিপাদপদ্ম হইতে ভ্রষ্ট হইল। কি আশ্চর্য্য !

মনের মধ্যে অতিশয় নির্ব্বেদ উপস্থিত হইল। তিনি কালঞ্জর পর্ব্বতে জন্মাইয়া ছিলেন, অল্পদিনের মধ্যেই আপনার মৃগীমাতাকে পরিত্যাগ করিয়া, জন্মস্থান কালঞ্জর পর্ব্বত পরিত্যাগ করিয়া উপশমশীল মুনিগণের প্রিয়তম স্থান সেই শাল-গ্রামাখ্য হরিক্ষেত্রে, তাঁহার পূর্ব্বজন্মের তপস্যার স্থান সেই পুলস্ত্য-পুলহাশ্রমে প্রত্যাগমন করিলেন।

পূর্ব্বের তপস্যাক্ষেত্রে আসিয়া মৃগদেহধারী রাজর্ষি ভরত কাহারও সহিত মিশিতেন না, শুষ্কপত্র, তৃণ, লতা ভোজন করিয়া জীবন ধারণ করিতেন আর সর্ব্বদাই চিন্তা করিতেন কবে আমার এই হরিণ-জন্মের অবসান হইবে। শীঘ্রই হরিণ-

জন্ম শেষ হইল, সেই পুণ্যতীর্থের জলে রাজর্ষি ভরত হরিণ-দেহ পরিত্যাগ করিলেন।

মৃগজন্মের অবসান ও ব্রাহ্মণ-জন্ম।

রাজর্ষি ভরতের জীবনের আর এক অধ্যায় উপস্থিত হইল; আঙ্গিরস গোত্রের এক সাধু ব্রাহ্মণ, তাঁহার দুই স্ত্রী। প্রথমা স্ত্রীর নয়টি পুত্র। ব্রাহ্মণও যেমন সর্ব্ব-সদ্‌গুণ-সম্পন্ন ছিলেন, এই পুত্রগণও তদ্রূপ। শম, দম তপস্যা, বেদাধ্যায়ন, দান, সন্তোষ, সহিষ্ণুতা, বিনয়, বিদ্যা, অনসূয়া, আত্মজ্ঞান, আনন্দ প্রভৃতি যাবতীয় গুণে তাঁহারা ভূষিত। দ্বিতীয়া স্ত্রীর একটী পুত্র ও একটি কন্যা। এই পুত্রই রাজর্ষি ভরত, মৃগদেহ ত্যাগ করিয়া তিনি এই ব্রাহ্মণের কুলে জন্ম গ্রহণ করেন।

জড়-ভরত।

এইবার রাজর্ষি ভরতের জীবনের চরম পরীক্ষা। তিনি রাজর্ষির তপস্যা-পূত দেহ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া মৃগদেহ পাইয়াছিলেন। কেন পাইয়াছিলেন? সাধারণ লোকে বলিবে তিনি অপরাধ করিয়াছিলেন? সে অপরাধ কি? হরিণ শিশুর প্রতি অত্যাসক্তি অপরাধ, ইহা সত্য। কিন্তু এই অত্যাসক্তি জন্মিল কেন? করুণায়। তিনি করুণা-পরবশ হইয়া এই অসহায় ও মাতৃহীন হরিণ শিশুকে জলস্রোত হইতে উত্তোলন করিয়াছিলেন এবং করুণা-পরবশ হইয়াই তাহাকে আশ্রমে আনিয়া যত্নে লালন পালন করিয়াছিলেন। এই করুণা, ইহা যে অতি সুনির্ম্মল তাহাতেও সন্দেহ নাই। কারণ এই নির্জ্জন বনপ্রদেশে হরিণ-শাবককে প্রতিপালন করায় তাঁহার নিজের কোনই লাভ নাই। এত সুনির্ম্মল করুণা তাহা হইতে রাজর্ষি ভরত পতিত হইলেন। অবশ্য আমরা দেখিয়াছি যে এই পাতিত্য ঠিক দুর্গতি নহে, ইহাও শ্রীভগবানের করুণা। তিনি যেমন হরিণ শিশুকে করুণা করিয়াছেন, ভগবান্‌ও তেমনি করুণা করিয়াই তাঁহাকে ভগবদ্ আরাধনা হইতে ভ্রংশিত করিয়াছেন। তাঁহার চিত্তে প্রবল উৎকণ্ঠা জাগাইবার জন্যই ভগবান্ এই লীলা করিয়াছেন। যাহা হউক রাজা ভরত

করুণা ও অহঙ্কার।

এবারে ব্রাহ্মণ কুলে জন্ম গ্রহণ করিয়া একটি জিনিসকে বড়ই ভয় করিতে লাগিলেন, তাহা সঙ্গ। করুণা খুবই ভাল, ভূতানুকম্পা হইতে হইবে, জীবমাত্রকেই করুণা করিতে হইবে, কিন্তু বড়ই সাবধান হওয়া দরকার। ভগবান করুণ তাঁহার করুণা অসীম এবং অপার; কিন্তু আমরা সংসারে প্রতিনিয়ত জীবের কর্ম্মভোগ ও দুর্গতি দেখিতে পাইতেছি। মানবের এই দুঃখক্লেশ দেখিয়া কি আমরা অনুমান করিব, যে ভগবান করুণ নহেন। তিনি চির-করুণ, কিন্তু করুণা করিবার পূর্ব্বে জীবচৈতন্যের সেই করুণা উপলব্ধি করার উপযুক্ত হওয়া প্রয়োজন। কর্ম্মফল ভোগের দ্বারা জীব ক্রমে ক্রমে সেই উপযুক্ততা অর্জ্জন করিতেছে। সুতরাং যেমন করুণা আছে, তেমনি কর্ম্মফল ভোগও আছে। আমাদের মধ্যেও করুণা জাগিয়া উঠে। যখন সত্য সত্যই করুণার জাগরণ হয়, তখন বুঝিতে হইবে আমার ভিতরে ভগবান্ জাগিয়াছেন। সে বড় উন্নত অবস্থা। কিন্তু ভগবানের এই জাগরণ রক্ষা করা বড়ই কঠিন. রজোগুণের লেশ মাত্র থাকিলেও আমার 'অমিটা' জাগিয়া উঠে। এই 'আমি' অহঙ্কারী ও স্বাতন্ত্র্যাভিমানী। সে যখন জাগিয়া উঠে তখন সব সময়ে বুঝিতে পারা যায় না যে 'আমি' টা জাগিয়াছে। আমি মনে করি ভগবান্ জাগিয়াছেন তিনিই কার্য্য করিতেছেন আমি প্রেমের দ্বারাই পরিচালিত হইতেছি, কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে আমার 'আমি' টা জাগিয়াছে এবং আমি কামের দ্বারা চালিত হইতেছি। আমি মনে করিতেছি ইহাতে আমার নিজের কোন সুখ বা স্বার্থ নাই, কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে নিজের স্বার্থাভিসন্ধি অতীব গোপনে লুকাইয়া থাকে, আমরা তাহা বুঝিতে পারি না। এইরূপে নিজের কাছেই নিজে বঞ্চিত হইয়া আমরা জীবনের পথে পরিভ্রমণ করিতেছি। কে আমাদের এই ভ্রান্তি বুঝাইয়া দিবে? যিনি বুঝাইয়া

দিবেন তিনিই গুরু। রাজর্ষি ভরত মৃগজন্ম লাভ করিয়া ইহা বুঝিলেন, বুঝিলেন যে করুণায় চালিত হইয়াছিলেন সত্য, করুণার চালনায় মৃগশিশুর প্রাণরক্ষা করিয়াছিলেন এবং করুণার বশবর্ত্তী হইয়াই অদয়ায় মৃগশিশুকে লালন পালন করিয়াছিলেন। কিন্তু সঙ্গ বা আসক্তি হইল কেন? ভরত রাজর্ষি, তিনি ক্ষত্রিয়, তাঁহার প্রকৃতির কোন্ গুপ্ত অন্ধকারময় কোণে রজোগুণ লুকাইয়াছিল. এই রজোগুণ হইতে সঙ্গ ও কাম এবং ক্রমশঃ তমোগুণের প্রভাবে একেবারে আত্মহারা হইয়াছিলেন। মৃগজন্মে এই রজঃ শেষ হইয়া গেল, আজ রাজর্ষি পুণ্যাত্মা ব্রাহ্মণের গৃহে জন্মাইলেন। করুণাকে বিসর্জ্জন দেন নাই, কিন্তু সঙ্গভয়ে বড়ই ভীত হইলেন।

সঙ্গ-ভয়।

শ্রীমদ্ভাগবত বলিতেছেন—

> তত্রাপি স্বজনসঙ্গাচ্চ ভগবতঃ কর্ম্মবন্ধবিধ্বংসন শ্রবণ-
> স্মরণগুণবিবরচরণারবিন্দযুগলং মনসা বিদধদাত্মনঃ
> প্রতিঘাতমাশঙ্কমানো ভগবদনুগ্রহেনুণাস্মৃত স্বপূর্ব্বজন্মা-
> বলিরাত্মনমুন্মত্তজড়ান্ধ স্বরূপেণ দর্শয়ামাস লোকস্য।

রাজর্ষি ভরত ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিলেন, শ্রীভগবানের অনুগ্রহে আপনার পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের বিবরণ সকল স্মৃতিপথে উদিত হইল এবং তাঁহার মনে সর্ব্বদাই ভয় হইতে লাগিল পাছে আবার আত্মভ্রংশ ঘটে, পাছে আবার সঙ্গপ্রভাবে আপনাকে ভুলিয়া যাই, পাছে আবার পতন হয়। এই ভয়ে শ্রীভগবানের চরণারবিন্দযুগল, যাহার শ্রবণ ও গুণ বর্ণনের দ্বারা কর্ম্মবন্ধ ধ্বংস হয়, তাহাই সর্ব্বদা মনের মধ্যে বিশেষরূপে ধারণা করিয়া বাহিরের লোকের নিকট আপনাকে জড়, অন্ধ ও বধিরের ন্যায় দেখাইতে লাগিলেন।

সকলেই দেখিলেন ব্রাহ্মণের ছেলেটি একেবারে বুদ্ধীহীন ও জড়ভাবাপন্ন হইল। যাহা হউক পিতার মন প্রবোধ মানে না।

কাজেই ব্রাহ্মণ উপনয়নাদি সংস্কার সম্পাদন করিয়া পুত্রকে শৌচ, আচমনাদি কর্ম্ম সকল শিক্ষা দিলেন। পিতা নানারূপে শিক্ষা দিতে লাগিলেন। কিন্তু পুত্রের বাহ্যজ্ঞান কিছুতেই সাধিত হইল না। চারিমাসে গায়ত্রী শিখিতে পারিলেন না বেদাধ্যয়ন অনেক দূরের কথা। পুত্রকে পণ্ডিত করিবার জন্য পিতা প্রাণ-পণ চেষ্টা করিতেছেন, কিন্তু পুত্রের কিছুই হইতেছে না, ইতিমধ্যে কাল উপস্থিত হইল, ব্রাহ্মণ মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন; তাঁহার দ্বিতীয়া স্ত্রী নিজের পুত্র কন্যাকে সপত্নীর হস্তে সমর্পণ করিয়া সহমৃতা হইলেন।

পিতা নাই আর কে স্নেহের বশবর্ত্তী হইয়া শাস্ত্র শিক্ষা দিবে? ভরতের বৈমাত্রেয় ভ্রাতাগণ স্থির করিলেন ভরত একেবারে বুদ্ধিহীন ও জড়স্বভাব, তাহাকে আর লেখাপড়া শিখাইয়া কি হইবে? শ্রীমদ্ভাগবত বলিতেছেন ভরতের ভ্রাতারা

"অতৎ প্রভাববিদস্ত্রয্যাং বিদ্যায়ামেব
পর্য্যবসিতমতয়ো ন পরিবিদ্যায়াং"

অর্থাৎ ভরতের ভ্রাতৃগণের বুদ্ধি বেদবিদ্যাতেই পর্য্যবসিত হইয়াছিল। তাহারা আত্মবিদ্যায় কোনরূপ পরিশ্রম করেন নাই, কাজেই তাহারা ভরতের প্রভাব বুঝিতে পারে নাই।

আত্মবিদ্যা।

সকল বিদ্যার শ্রেষ্ঠ বিদ্যার নাম পরাবিদ্যা বা আত্মবিদ্যা। এই বিদ্যা সকল বিদ্যার প্রতিষ্ঠা ও পরিণতি। এই বিদ্যার দ্বারা অক্ষর ব্রহ্মের স্বরূপের পরিচয় পাওয়া যায়। ইহাই মানবের চরম ও পরম প্রাপ্তব্য। লৌকিকীবিদ্যা অনেক নীচের জিনিস, রাজর্ষি ভরত রাজর্ষি দেহে কঠোর তপস্যা করিয়া তাহার পর মৃগজন্মে শ্রীভগবানের ইচ্ছাময় প্রারব্ধাভাস ভোগ করিয়া এই চরম ও পরম বস্তু অর্জ্জন করিয়াছেন। এ বড় আশ্চর্য্য জিনিস। ইহার বক্তাও আশ্চর্য্য শ্রোতা ও আশ্চর্য্য। এ বস্তু সকলকে দেখাইবার নহে, বড় গোপনে ও যত্নে

রক্ষা করিবার জিনিস। বেদ বলিয়াছেন, অনুপযুক্ত ব্যক্তিকে ইহা বলা নিষ্ফল, কারণ সে ইহার কিছুই বুঝিবে না, কেবল আশ্চর্য্যান্বিত হইবে। মনু বড় কঠোর শাসন বাক্য প্রয়োগ করিয়াছেন—তিনি বলিয়াছেন কেহ যথারীতি জিজ্ঞাসা না করিলে ইহা বলিবে না, কেহ অন্যায় পূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলে বলিবে না, মরিয়া যাইবে সেও স্বীকার কিন্তু অনধিকারীকে ইহা বলিবে না। আজ ভরত এই ব্রাহ্মণদেহে তাঁহার জীবনের চরম পরিপক্কতায় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন, আজ তাঁহার মধ্যে পূর্ণ আত্মজ্ঞান, কিন্তু এ জ্ঞান লইয়া তিনি কি করিবেন। ভারতের ইতিহাসই বা কে জানে?

ভরতের কঠোর পরীক্ষা।

জড়ভাবাপন্ন ব্রাহ্মণ মলিন দেহ, মলিন বসন, বাহিরের জগৎ লইয়াই যাহারা মত্ত ও আত্মহারা তাহারা কি প্রকারে বুঝিবে। সংসারের লোকও পশু, কাজেই তাহারা ভরতের সহিত অত্যন্ত অবজ্ঞার সহিত ব্যবহার করিত। তিনিও ভিতরে যে পূর্ণ আত্মজ্ঞান রহিয়াছে তাহা একেবারে গোপন করিয়া তাহাদের সঙ্গে ঠিক তাহাদের মতই ব্যবহার করিতেন। কেহ আসিয়া ভরতকে জোর করিয়া ধরিয়া লইয়া যাইত এবং শ্রমসাধ্য কার্য্য করাইয়া লইত অথচ কোনরূপ মজুরি দিত না—হয়ত সামান্য কিছু খাদ্যদ্রব্য দিত। ভরতের কিছুতেই আপত্তি নাই, যে যাহা করিতে বলিত তাহাই করিতেন, যে যাহা খাইতে দিত তাহাই খাইতেন। তাঁহার দেহাভিমান ছিল না, কাজেই নিজের ইন্দ্রিয়-প্রীতির কোনরূপ চেষ্টা ছিল না, আনন্দময় আত্মার প্রীতিতেই সর্ব্বদা সন্তুষ্ট থাকিতেন। কি শীত কি গ্রীষ্ম, কি বর্ষা, বারমাস ভরতের দেহ সর্ব্বদাই অনাবৃত থাকিত। তাঁহার শরীর অতিশয় পুষ্ট, প্রায় বৃষের ন্যায় বলিলেও চলে, অঙ্গ প্রত্যঙ্গ অতিশয় দৃঢ়। তিনি মাটিতে শুইতেন, তৈলমর্দ্দন করিতেন না স্নানও করিতেন না, সুতরাং শরীর সর্ব্বদাই ধূলিধূসরিত। ভিতরে

যে ব্রহ্মতেজ তাহা মহামণির ন্যায় প্রকট থাকিত। কটিতে পরিধান একখানি কুৎসিৎ ... আর বক্ষঃস্থলে মলিন যজ্ঞসূত্র—কাজেই যাহারা বাহ্য দেখিয়া বিচার করে তাহার ভরতকে দেখিয়া বলিত 'এ অতি কুৎসিৎ ব্রাহ্মণ, 'এ ব্যক্তি দ্বিজাধম।'

ভরতের বৈমাত্রেয় ভ্রাতৃগণ যদিও বেদবিদ্যায় পারদর্শী কিন্তু ভরতকে চিনিতে পারিলেন না। সুতরাং অন্য কেহ যে চিনিতে পারিবে না, ইহা অত্যন্ত স্বাভাবিক। ক্রমশঃ বৈমাত্রেয় ভ্রাতৃগণ ভরতের সহিত দুর্ব্যবহার করিতে লাগিলেন কিন্তু ভরতের কিছুতেই আপত্তি বা অসন্তোষ নাই।

ভরতকে ধান্যক্ষেত্রের কর্দ্দম বিলোড়নাদি কর্ম্ম করিতে হইত; তিনি কাজকর্ম্ম কিছুই জানিতেন না, এবং বাহিরের ব্যাপারে একেবারে মনঃসংযোগ না থাকায় কোন কাজকর্ম্ম শিখিতে পারেন নাই; যে যেমন করিয়া দেখাইয়াদিত সেই প্রকারে কাজ করিতেন। বাড়ীতে তাহাকে ভাল করিয়া খাইতেও দেওয়া হইত না, তাঁহার ভ্রাতৃগণ ক্ষুদ, পিণ্যাক (খইল) তুষ, স্থালীলগ্ন দগ্ধ অন্ন প্রভৃতি পরিত্যজ্য সামগ্রী দিতেন, তিনিও অমৃতবৎ ভোজন করিতেন। তাঁহার রাগাদি লালসা আদৌ ছিল না। এই প্রকারে ভরতের চলিতে লাগিল।

এক দস্যুদলপতি পুত্র-কামনায় ভদ্রকালীর পূজা করিতেন, তিনি একটি নরপশু বলিদান করিবেন। একটি নরপশু সংগৃহীত হইয়াছিল এবং তাহাকে বাঁধিয়া রাখা হইয়াছিল, হঠাৎ সেই নরপশু বন্ধন খুলিয়া পলাইয়া গেল, দস্যুগণ চারিদিকে যথাসাধ্য অন্বেষণ করিল, কিন্তু সেই পলায়িত নরপশুকে আর খুঁজিয়া পাইল না। এখন উপায়! একটি নরপশু আনিতে হইবে, নতুবা রক্ষা নাই। দস্যুপতির অনুচরেরা পশুর অন্বেষণে ভ্রমণ করিতে করিতে অন্ধকার রাত্রিতে দেখিতে পাইল বিপ্রনন্দন জড়ভরত এক মঞ্চের

উপর বসিয়া শস্যক্ষেত্র পাহারা দিতেছে। জড়ভরতকে দেখিয়াই তাহারা বুঝিল অতি সুলক্ষণ নরপশু পাওয়া গিয়াছে, সুতরাং তাহারা আনন্দিতচিত্তে রজ্জুদ্বারা জড়ভরতকে বন্ধন করিয়া চণ্ডিকার গৃহে লইয়া আসিল। জড়ভরতকে যথাবিধি স্নান করাইয়া নূতন বস্ত্র পরিধান করান হইল এবং গন্ধ, মাল্য ও অলঙ্কার দিয়া সজ্জিত করা হইল মন্ত্রপাঠাদি হইয়া গেলে দস্যুপতি শাণিত খড়্গ লইয়া যেমন জড়ভরতের মস্তকচ্ছেদন করিতে উদ্যম করিয়াছে, অমনি দেবী প্রতিমা হইতে বাহির হইলেন। তাঁহার দারুণ ভ্রূকুটি এবং অরুণবর্ণ নয়ন, তিনি অট্ট অট্ট হাস্য করিতে লাগিলেন এবং খড়্গের দ্বারা দস্যুদিগের মস্তকচ্ছেদন করিয়া তাহাদের ছিন্ন মুণ্ড লইয়া কন্দুক ক্রীড়া করিতে লাগিলেন। জড়ভরত এই প্রকারে পরিত্রাণ পাইয়া আবার স্বস্থানে ফিরিয়া আসিলেন।

পরীক্ষা শেষ ও রহূগণরাজ।

এইবার ভরতের উপাখ্যানের শেষ অধ্যায়। এই শেষ অধ্যায়ে সিন্ধু ও সৌবীর দেশীয় রহূগণরাজ ভরতকে শিবিকাবহন-কার্য্যে নিযুক্ত করেন এবং ভরত শেষে ঐ নৃপতিকে জ্ঞান ও ভক্তি উপদেশ করেন। ভরত-উপাখ্যানের এই অংশ ব্যাখ্যা করিবার প্রারম্ভে শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয় যে তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন, আমরা প্রথমে তাহাই আলোচনা করিতেছি। ভরতের জীবন করুণাবিস্তারের জীবন, এই করুণা-বিস্তারের দ্বারাই জগতের প্রকৃতকল্যাণ হইবে। ভরতের বৈমাত্রেয় ভ্রাতৃগণ এবং প্রতিবেশীগণ তাঁহাকে অতিশয় কদর্য্য অন্ন দিতেন এবং কঠোর শ্রম সাধ্য কার্য্যসমূহ চতুরতাপূর্ব্বক ভরতের দ্বারা করাইয়া লইতেন। তাহারা অর্থাৎ ভরতের বৈমাত্রেয় ভ্রাতৃগণ এবং তাঁহার প্রতি-বেশীগণ কর্ম্মী, অতএব রাজস অর্থাৎ রজোগুণই তাহাদের মধ্যে প্রবল। তাহাদের ব্যবহারে ভরত কখন বিরক্ত হন নাই, নীরবে ও আনন্দিতচিত্তে সমুদায় দুর্ব্ব্যবহার সহ্য করিয়া দীর্ঘকাল

তাহাদের সঙ্গে বাস করিলেন। তাঁহার যখন সুখ দুঃখ শীত উষ্ণ সকলেই সমজ্ঞান, তখন তিনি ইচ্ছা করিলে সে স্থান পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র যাইতে পারিতেন, কিন্তু তিনি তাহা করেন নাই। তিনি তাহাদিগকে দয়া করিলেন, যতো বহুকালমপি তেভ্যঃ স্বদর্শনং দদৌ—অর্থাৎ বহুকাল তাহাদের দর্শন দিয়া তাহাদের কৃপা করিলেন। মানবের চরিত্রের প্রকৃত উন্নতি সাধন বড়ই দীর্ঘকাল-সাধ্য ও কষ্টকর ব্যাপার, হঠাৎ কিছু হইবার উপায় নাই। আমরা এ কালের মানুষ এই তত্ত্ব আমরা ভুলিয়া গিয়াছি। আমরা মনে করি পুস্তক লিখিয়া বক্তৃতা করিয়া বিদ্যালয়াদি স্থাপনা করিয়া অনায়াসে ক্ষিপ্রবেগে মানুষকে দেবতা করিয়া ফেলিব; অনেক সময়ে মনে করি আইন কানুন করিয়া মানুষের হৃদয়-মন নির্ম্মল করিব, ইহা একালের একটি অতি ভয়ানক ভ্রান্তি। এ কালের সংস্কারকগণ বহির্মুখী, তাঁহারা অন্তর্ম্মুখী হইয়া মানব প্রকৃতির গভীর রহস্য উপলব্ধি করেন নাই। মানবের প্রকৃতিতে ত্রিগুণের খেলার রহস্য ভাল করিয়া অলোচনা করিলে তাঁহারা বুঝিতে পারিতেন, মানবকে উন্নীত করা বড় কঠিন ব্যাপার। প্রথমতঃ যিনি অপরকে উন্নীত করিতে চাহেন তাঁহাকে 'অহং' বোধ একেবারে পরিত্যাগ করিতে হইবে এবং ভগবানের কৃপায় সম্পূর্ণরূপে আত্মনিবেদন করিতে হইবে। সকলের উপকার এক প্রকারের পদ্ধতি অনুসারেও হয় না। ভরত শান্তভাবে বহুক্লেশ এবং অত্যাচার সহ্য করিয়া তাঁহার বৈমাত্রেয় ভ্রাতৃগণের এবং প্রতিবেশীগণের প্রতি করুণা করিলেন। আবার তস্করগণ দুরাচারাসক্ত ও অতিশয় তামস প্রকৃতিসম্পন্ন, তাহারা তাঁহাকে হত্যা করিবার জন্য লইয়া গিয়াছিল, তিনি তাহাদিগকে কৃপা করিলেন।

"তথৈব বৃষলরাজে দুরাচারাসক্তত্বাদতি তামসে স্বঘাতকেঽপি কৃপাঞ্চকারৈব যতস্তেনাপি প্রকারেণ স্বস্য দেব্যাশ্চ সাক্ষাদ্দর্শনং জন্মান্তরেঽপি তন্মুক্তিকারণং কারয়ামাস।" অর্থাৎ তস্করগণ

দেবীর সাক্ষাদ্দর্শন লাভ করিল, পরমহংস ভরতকে দর্শন করিল, দেবীহস্তে তাহাদের তামসিক পাপদেহ ধ্বংস হইল, এই সকলের দ্বারা জন্মান্তরে তাহাদের মুক্তি হইবে।

এইবার রহূগণের নৃপতির কথা। তিনি জ্ঞানী সুতরাং সাত্ত্বিক—কিন্তু রাজত্ব করেন. সুতরাং রজোগুণও রহিয়াছে। রজোগুণের প্রভাবেই তিনি জড়ভরতকে শিবিকাবাহকের কার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছেন। এই রহূগণ-নৃপতির নিকটে তিনি ভক্তি ও জ্ঞানাদি প্রকাশ করিলেন। অপর দুইদলকে অর্থাৎ তাঁহার ভ্রাতা ও প্রতিবেশী বর্গকে এবং দস্যুগণকে ভক্তি ও জ্ঞান দেন নাই।

এইবার রহূগণের উপাখ্যান। সিন্ধু ও সৌবীর দেশের রাজা রহূগণ শিবিকারোহণ করিয়া যাইতেছিলেন। ইক্ষুমতী নদীর তীরে উপস্থিত হইলে একজন শিবিকা-বাহকের অভাব ঘটে; তখন প্রধান বাহক একজন শিবিকা-বাহক অন্বেষণ করিতে লাগিল। ভগবানের খেলা, অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইয়াই জড়ভরতকে দেখিতে পাইল। প্রধান বাহক অবশ্য ভরতকে চিনিতে পারে নাই, ভরতের বেদজ্ঞ বৈমাত্রেয় ভ্রাতারাই যখন ভরতকে চিনিতে পারে নাই, তখন আর প্রধান বাহকের অপরাধ কি! সে ত একজন সামান্য লোক। প্রধান বাহক জড়ভরতকে দেখিয়া ভাবিল লোকটি বেশ স্থূলকায় ও দৃঢ়াঙ্গ, বৃষ এবং গর্দ্দভের ন্যায় এ ব্যক্তি ভার বহন করিতে পারিবে। সুতরাং আর কালবিলম্ব না করিয়া সে ভরতকে ধরিয়া লইয়া গেল এবং অন্যান্য বাহকের সহিত ভরতকেও শিবিকা-বহন কার্য্যে নিযুক্ত করিল। ভরত যদিও শিবিকা-বহন জানিতেন না তথাপি স্বকীয় স্বভাবসিদ্ধ মহানুভাবকতা নিবন্ধন, শিবিকায় স্কন্ধ দিয়া অন্যান্য বাহকের সহিত শিবিকা লইয়া চলিলেন। এই স্থানে একটি কথা বিশেষ রূপে স্মরণীয়—রহূগণের ইহাতে বিশেষ অপরাধ নাই। তিনি রাজা, শিবিকাবাহক নিযুক্ত

করিবার ভার প্রধান বাহকের উপর, কাহাকে এই কার্য্যে নিযুক্ত করা হইতেছে তাহা তিনি সকল সময়ে পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারেন না। সুতরাং বিশেষ অপরাধ নাই, তবে একেবারেই যে অপরাধ নাই তাহা নহে, প্রধান বাহকের অনুপযুক্ততা অবশ্য রাজারই দোষ। যাহা হউক এই অপরাধ রাজার পক্ষে নিতান্তই গৌণ।

এখন ভরত শিবিকা বহন করিয়া চলিয়াছেন। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে ভরতের বাহ্যজ্ঞান অত্যন্ত অল্প, একরূপ ছিল না বলিলেও হয়। কিন্তু একটি বিষয়ে তাঁহার বেশ জ্ঞান ছিল, পথে চলিবার সময় তিনি অত্যন্ত সাবধানে চলিতেন; সর্ব্বদা লক্ষ্য রাখিতেন পদাঘাতে যেন কোন প্রাণীর ক্লেশ বা প্রাণহানি না হয়। বাণ-নিক্ষেপ করিলে তাহা যতদূর যায়, ভরত প্রথমে ততদূর পথ ভাল করিয়া দেখিয়া তাহার পর পদক্ষেপ করেন। সুতরাং অন্যান্য বাহকের সহিত তিনি সমান তালে চলিতে না পারায় শিবিকা পুনঃ পুনঃ বিষম হইতে লাগিল, সুতরাং আরোহী নৃপতির বড়ই কষ্ট হইতে লাগিল। রাজা রুষ্ট হইয়া বাহকগণকে তিরস্কার করিলেন ও বলিলেন "তোরা সমান হইয়া চলিতেছিস্ না কেন, শিবিকা যে বিষম হইতেছে।" বাহকেরা ভীত হইয়া রাজাকে বলিল, "মহারাজ আমাদের কোন অপরাধ নাই, যে ব্যক্তি নূতন নিযুক্ত হইয়াছে, সে দ্রুত চলিতে পারিতেছে না, আমরা উহার সহিত শিবিকা বহন করিতে পারিব না।"

রাজা ভাবিলেন একজনের দোষে সকলেই দোষী হয়। তিনি নব-নিযুক্ত বাহক ভরতকে দেখিলেন তাঁহার ভিতরে যে ব্রহ্মতেজ প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে রজোগুণের প্রভাবে তাহা বুঝিতে পারিলেন না, সুতরাং ভরতকে উপহাস করিয়া বলিলেন—"কিহে ভাই, তুমি যে দেখিতেছি বড় শ্রান্ত হইয়াছ! অহো একাকী অনেকক্ষণ ধরিয়া শিবিকাবহন করিতেছে, শ্রান্ত হইবারই কথা।

তোমার শরীর দেখিতেছি বড়ই কৃশ, অঙ্গগুলিও দৃঢ় নহে, নিতান্তই অপটু! তোমাকে কি জরা আক্রমণ করিয়াছে? বলি সখে, এই সকল বাহকেরা কি তোমার সহচর নহে।" রহূরাজ ভরতের পুষ্ট ও সুদৃঢ় দেহ দেখিয়া উপহাস করিয়াই এই সব কথা বলিলেন। ভরত, রাজার কথায় কোনরূপ উত্তর করিলেন না, চুপ করিয়া থাকিলেন ও শিবিকা বহন করিয়া অগ্রসর হইলেন। ভরত চুপ করিয়া থাকিলেন কেন? তাহার কারণ ভরতের নিজদেহে মমত্ববুদ্ধি ছিল না, কাজেই তাঁহার শরীরকে লক্ষ্য করিয়া রাজা যে সকল কথা বলিলেন তাঁহার নিকট সে সকল কথা প্রলাপের ন্যায় মনে হইতে লাগিল। ভরত অন্যান্য বাহকগণের সহিত শিবিকা লইয়া চলিলেন, শিবিকা আবার বিষম হইতে লাগিল; রহূরাজ এইবার কুপিত হইলেন এবং ভরতকে ডাকিয়া বলিলেন—"আরে দুষ্ট, তুই কি জীবন্মৃত আমাকে অনাদর করিলি, আমি তোর প্রভু, আমার আদেশ অমান্য করিতেছিস্। তুই বড় প্রমত্ত, দাঁড়া, তোর উপযুক্ত শাস্তি বিধান করিতেছি।"

ভরতের উপদেশ বা ভরতের শিক্ষা।

ভরত সকল প্রাণীর সুহৃদ্ ও আত্মা এবং পরব্রহ্মস্বরূপ ব্রাহ্মণ, তিনি ঈষৎ হাস্য করিলেন ও রহূরাজকে বলিলেন, "হে বীর! তুমি শ্লেষ করিয়া যাহা বলিয়াছ, তাহা বড় মিথ্যা নহে। তুমি আমায় বলিলে তুমি শ্রান্ত নহ, তোমার ভার বোধ হয় নাই, এবং তুমি দীর্ঘ পথ আইস নাই। ব্যাপার বড়ই কঠিন। বহনকর্ত্তা আমি, আর বহনকারী আমার এই দেহ, বহনকর্ত্তা যে আমি আমার যদি কোন ভার থাকে এবং বহনকারী যে দেহ সেই ভার যদি তাহার হয় তাহা হইলে ভার বোধ হইতে পারে। দেহী যে আমি তাহার যখন ভার নাই এবং যাহা তাহার, তাহা যখন দেহের নহে, তখন ভারই বা থাকিবে কি করিয়া, আর শ্রান্তিই বা হইবে কি প্রকারে? যে গমনকর্ত্তা অর্থাৎ আমি যাইতেছি বলিয়া যাহার বোধ হইতেছে, তাহার যদি প্রাপ্য পথ থাকে এবং

আমি যদি সেই গমনকর্ত্তার সঙ্গে এক হই, তাহা হইলেই 'অনেক-দূর যাওয়া' প্রভৃতি কথা চলিতে পারে, কিন্তু আমার যে তাহার কিছুই নাই, আমার ভারও নাই, আর আমি করিতেছি বা যাইতেছি এ প্রকারের বোধও নাই, সুতরাং যাহা বলিলে তাহা শ্লেষপূর্ব্বক কথিত হইলেও মিথ্যা কথা নহে। তবে যে আমাকে স্থূল বলিলে, এই কথাটি অসঙ্গত হইয়াছে, কারণ চেতন পদার্থের স্থূলত্ব নাই। স্থূলত্ব দেহ-সম্বন্ধেই প্রযুক্ত হয়, যাহারা মূর্খ, তাহারা দেহ ও দেহীকে এক বলিয়া বিবেচনা করে, কাজেই চেতন পদার্থে স্থূলত্ব আরোপ করে, কিন্তু ইহা তাহাদের ভ্রান্তি। তুমি আমায় জীবন্মৃত বলিয়াছ, কিন্তু কেবল আমি নহে, পরিমাণশীল পদার্থমাত্রেরই আদি ও অন্ত আছে, এবং এই আদি অন্ত সকল সময়েই আছে, সুতরাং দেহাভিমানী বিবেচনা করিয়া যদি আমাকে জীবন্মৃত বলিয়া থাক, তাহা হইলে বিকারী বা পরিমাণশীল পদার্থমাত্রেই জীবন্মৃত। তুমি আমাকে বলিলে যে "স্বামীর আদেশ অমান্য করিতেছিস্" এই কথার উত্তর এই যে তুমি স্বামী, আমি ভৃত্য, তোমার আদেশ আমার কর্ম্ম, এই যে সম্বন্ধ ইহা ধ্রুব নহে, আজ যদি তোমার রাজ্য যায় এবং আমি রাজা হই তাহা হইলে ব্যবস্থা অন্যরূপ হইবে। সুতরাং এই সম্বন্ধ ব্যবহারিক মাত্র। তুমি আমাকে বলিলে "তুই উন্মত্ত, তোর চিকিৎসা করিতেছি, তাহা হইলে তুই প্রকৃতিস্থ হইবি"; ইহার উত্তর এই যে আমি জড় বা উন্মত্ত নহি, আমি ব্রহ্মস্বভাব-সম্পন্ন, আর তুমি যদি বিবেচনাই কর যে আমি জড়, তাহা হইলে চিকিৎসা করিয়াই বা লাভ কি? চিকিৎসা দ্বারা জড়ভাবাপন্ন ব্যক্তিকে সংশোধন করিতে বা কর্ম্মপটু করিতে পারা যায় না।

রহূগণ-নৃপতি জ্ঞানবান্ লোক, তিনি ভরতের মুখে এই সমুদায় কথা শুনিয়াই শিবিকা হইতে অবতরণ করিলেন, তাঁহার হৃদয়ে তখন শ্রদ্ধার উদয় হইয়াছে, আমি অধিরাজ এই অহঙ্কার আর

তাঁহার মনে নাই। তিনি একেবারে ভরতের পদমূলে পতিত হইলেন এবং অপরাধের জন্য ক্ষমাভিক্ষা করিতে লাগিলেন। রহূরাজ বলিলেন "প্রভো, আপনি প্রসিদ্ধ ব্রাহ্মণগণের মধ্যে কে? আপনার স্কন্ধদেশে যজ্ঞসূত্র দেখিতেছি, আপনি কি দত্তাত্রেয়াদির মধ্যে কোন অবধূত? আপনি কি অভিপ্রায়ে প্রচ্ছন্নভাবে ভ্রমণ করিতেছেন? আপনি কাহার সন্তান? আপনি কোথায় থাকেন? কিজন্য এখানে আসিয়াছেন? আপনি কি কপিল মুনি? আমাদের কল্যাণ সাধনের জন্য এখানে আসিয়াছেন? প্রভো, আমার অপরাধ ক্ষমা করুন। আপনার প্রতি আমি যে অন্যায়াচরণ করিয়াছি, তজ্জন্য বড়ই ভীত হইয়াছি। আমি ইন্দ্রের বজ্রকে ভয় করি না, শূলপাণির শূলকে ভয় করি না, যমের দণ্ডে আমার ভয় নাই, অগ্নি, বায়ু, চন্দ্র, সূর্য্য এবং কুবেরের অস্ত্রেও আমি ভীত নহি; কিন্তু ব্রাহ্মণজাতির অবমাননাকে আমি বড়ই ভয় করি। যাহা হউক আপনি যখন আমাদের জন্যই ভ্রমণ করিতেছেন, তখন আমার ভরসা হয় অজ্ঞানকৃত অপরাধ ক্ষমা করিবেন। যাহা হউক আপনি যে সকল তত্ত্বজ্ঞানপূর্ণ উপদেশ দিলেন তাহাতে আমার দারুণ সন্দেহ হইয়াছে, আপনি দয়া করিয়া আমার সন্দেহ সমূহ দূর করুন :—

১। আপনি বলিলেন 'আমার শ্রম নাই' ইহা কি প্রকারে হইতে পারে? কর্ত্তা হইলেই কর্ম্ম ও শ্রম থাকে?

২। আপনি বলিলেন "ব্যবহার ব্যতীত ইহা আর কিছুই নহে" কিন্তু ব্যবহারবস্তু তো অলীক বলিয়া মনে হয় না, বরং তাহা সত্য বলিয়াই মনে হয়।

৩। আপনি বলিলেন স্থূলত্ব প্রভৃতি উপাধির ধর্ম্ম, আমার উহা নাই। এ কথাও বুঝিলাম না, কারণ স্থালীতে দুগ্ধ রাখিয়া যখন উত্তপ্ত করা হয় তখন অগ্নির ধর্ম্ম যে

উত্তাপ তাহা প্রথম স্থালীতে এবং স্থালী হইতে দুগ্ধে সংক্রামিত হয়, সুতরাং যাহা উপাধির ধর্ম্ম তাহা আপনাতে বা আমাতে অর্থাৎ আত্মাতে সংক্রামিত হইবে না কেন ?

৪। আপনি সাম্যভাব অস্বীকার করেন, অবশ্য সাম্যভাব নিত্য নহে, তাহা হইলে যতক্ষণ তাহা আছে ততক্ষণ অস্বীকার করা যায় কি প্রকারে ?

৫। আপনি বলিলেন স্তব্ধ ব্যক্তিকে শাসন করা নিষ্ফল কিন্তু ভগবানের আজ্ঞা বলিয়া বিবেচনাপূর্ব্বক যদি সেজন্য চেষ্টা করা যায় তাহা হইলে নিষ্ফল হইবে কেন ?

রহূগণ-রাজ বিনয়পূর্ব্বক ভরতকে এই পাঁচটি প্রশ্ন করিলেন, ভরত এই প্রশ্ন কয়টির যথাযথ উত্তর দিলেন। ভারতবর্ষ যে সনাতন সত্য লাভ করিয়াছে, যে সনাতন সত্যের অনুশীলনে প্রবৃত্ত হইয়া ভারতবর্ষকে বিবিধরূপ ভাগ্যবিপর্য্যয়ের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইতে হইয়াছে--ভরত সেই সনাতন সত্য রহূরাজকে উপদেশ করিবেন। কিন্তু এই উপদেশ গ্রহণ করা, এই উপদেশ শ্রবণ করিয়া যথার্থরূপে তাহা উপলব্ধি করা বড় সহজ কথা নহে। জন্মজন্মান্তরীণ সুকৃতির ফলে ইহার বক্তা পাওয়া যায়, আবার জন্মজন্মান্তরীণ সুকৃতির ফলে ইহা বুঝিতে পারা যায়। রহূরাজ নিশ্চয়ই সুকৃতিশালী ও ভাগ্যবান্, সেই জন্যই মলিন ব্রাহ্মণের বেশধারী রাজর্ষি ভরতকে আজ তিনি আচার্য্যরূপে লাভ করিলেন।

মানুষ চরম ও পরম সত্য শুনিয়াও বুঝিতে পারে না, এবং কেহ কেহ শুনিবার সময় বুঝিয়াছি বলিয়া মনে করে, কিন্তু কর্ম্মক্ষেত্রে তাহা প্রয়োগ করিতে পারে না, তাহার প্রধান কারণ এই যে মানুষ সাধারণতঃ দুর্ব্বলচিত্ত ও গতানুগতিক। মানুষ ব্যবহারিক জগৎকে একান্ত সত্য বলিয়া বিবেচনা করে এবং ব্যবহারিক জগতের তুলাদণ্ডে পারমার্থিক সত্যকে পরিমাণ করিয়া বুঝিতে চায়। তত্ত্ব-সাধনের রাজ্যে

ইহাই প্রথম ও প্রধান অন্তরায়। আমি যে অবস্থায় আছি, জগৎ বা সমাজ যে অবস্থায় আছে, তাহা স্বাভাবিক অবস্থা কিনা, এই ব্যবস্থা একটা মিথ্যা বা মোহের উপর প্রতিষ্ঠিত কিনা, এই চিন্তা মানুষ করিতে পারে না।

কয়েকটি নিতান্ত স্থূল উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে। পুরাণের সাহায্যে প্রাচীন ভারতবর্ষের অবস্থা আলোচনা করিলে দেখা যাইবে যে রাজা ধর্ম্ম রক্ষা করিতেন। গুরুশিষ্য পরম্পরাক্রমে রাজর্ষিগণ ব্রহ্মবিদ্যার অধিকারী হইতেন এবং সমাজে ধর্ম্মবিপর্য্যয় উপস্থিত হইলে সেই রাজর্ষিগণ ব্রাহ্মণগণের সাহায্যে ধর্ম্মরক্ষা করিতেন। বর্ত্তমান সময়ে আমাদের দেশে ধর্ম্মবিপর্য্যয় উপস্থিত হইয়াছে, একজন শাস্ত্রব্যাখ্যাতা একজন মহারাজা উপাধিধারী ব্যবসায়ী শূদ্রস্বভাব ধনবান ব্যক্তিকে প্রকাশ্য সভায় সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন "মহারাজ, ধর্ম্মবিপর্য্যয় উপস্থিত, আপনি ধর্ম্মরক্ষা করুন।" এই প্রকারে যিনি আবেদন করিলেন, তাঁহাকে আপনি কি বলিবেন? আমি তাঁহাকে একটি গল্প বলিয়াছিলাম। আমি বলিয়াছিলাম যে "অনেকদিন পূর্ব্বে আমাদের পাড়ার লোকেরা যাত্রা করিতেছিল, পাঠশালার অটল পণ্ডিত বিরাট রাজার অভিনয় করিতেছিল, এমন সময়ে খবর আসিল অটল পণ্ডিতের বাড়ী চোর আসিয়া চুরি করিয়াছে। চুরি তেমন গুরুতর নহে, আমি পণ্ডিতকে বলিলাম, চোর বোধ হয় যাত্রা শুনিতেছিল, যাত্রা শুনিতে শুনিতে সে ভাবিল পণ্ডিত যখন রাজা হইয়াছে, তখন ইহার বাড়ীতে চুরি করিলে অনেক মূল্যবান্ সামগ্রী, অনেক মণিমুক্তা, হীরা-জহরৎ পাওয়া যাইবে। এই মনে করিয়া আপনার চালাঘরকে রাজবাড়ী মনে করিয়া সে চুরি করিতে গিয়াছিল, অবশ্য সে যাহা পাইয়াছে, তাহা সেই জানে।"

ব্যবহারকে সত্য মনে করিয়া আমাদের দেশে ধর্ম্মবিপর্য্যয় নিবারণের জন্য যাহারা চেষ্টা করিতেছেন, তাঁহাদের নিতান্ত স্থূল বিষয়ও চিন্তা করিবার সামর্থ্য নাই। অবশ্য রহূরাজকে আরও উচ্চাঙ্গের কথা আজ উপদেশ দেওয়া হইবে, কিন্তু এই উপদেশদানের প্রারম্ভে ভরত তাঁহাকে বলিলেন, "আপনি ব্যবহারকে একান্ত সত্য বলিয়া বিবেচনা করিতেছেন, এই ভ্রান্তি যতক্ষণ আপনার চিত্ত অধিকার করিয়া থাকিবে ততক্ষণ আপনি পরমার্থ সম্বন্ধে কোন কথাই বুঝিতে পারিবেন না। আপনি ততক্ষণ বড় বড় কথা শুনিবেন, এবং সেই মুখস্থ করা বড় বড় কথা আওড়াইয়া যাইবেন, কিন্তু কথার যাহা ভাব বা অর্থ, জীবনের দ্বারা সত্যরূপে তাহা গ্রহণ করিতে পারিবেন না।

অকোবিদঃ কোবিদবাদবাদান্ বদন্যথো
নাতিবিদাং বরিষ্ঠঃ।
ন সূরয়ো হি ব্যবহারমেতং তত্ত্বাবমর্শেন
সহামনন্তি॥

তুমি অকোবিদ অর্থাৎ অবিদ্বান্, অথচ বিদ্বান্ জনের ন্যায় কথা বলিতেছ, সুতরাং তুমি বিদ্বান্‌গণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বা প্রকৃত বিদ্বান্ নও। তুমি স্বামী-ভৃত্যাদি রূপ ব্যবহারকে সত্য বলিতেছ। প্রকৃত পণ্ডিতেরা তত্ত্ববিচারের সহিত এরূপ কথা কখনই বলেন না, তত্ত্ববিচার না করিলেই স্বামিভৃত্যাদি ব্যবহার সত্য বলিয়া মনে হয়, কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে তাহা সত্য নহে।

তাহার পর রাজর্ষি ভরত বলিলেন কেবল স্বামিভৃত্যাদি ব্যবহারই যে মিথ্যা তাহা নহে, বৈদিক ধর্ম্মফল-ব্যবহারও সত্য নহে। কারণ তাহার মধ্যেও হিংসা, দম্ভ এবং কৃত্রিম বা মিথ্যা বিজৃম্ভিত অনৈক্য ও বৈষম্য রহিয়াছে। রাজর্ষি ভরত বড়ই কঠিন কথা বলিলেন—ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণও গীতার প্রারম্ভে অর্জ্জুনকে

এই কথা বলিয়াছিলেন, শ্রীমদ্ভাগবতে রাজর্ষি ভরত সেই কথাই আরও স্পষ্ট করিয়া রহূগণকে বলিলেন। ভাগবত-ধর্ম্ম বুঝিতে হইলে এই প্রথম কথা বিশেষরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে হইবে। এই প্রথম কথা না বুঝিলে শ্রীকৃষ্ণ-কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত এবং শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য মহাপ্রভু কর্ত্তৃক পুনরুদ্‌ঘোষিত প্রেমধর্ম্ম বা ভাগবতধর্ম্ম বা বর্ত্তমান কলির যুগধর্ম্ম কি তাহা বুঝিতে পারা যাইবে না। এই কথাটা না বুঝিলে আমরা ধর্ম্মের নামে অধর্ম্মের পথে ধাবিত হইব, এবং ব্যবহারিক জগতের অধর্ম্মার্জ্জিত ঐশ্বর্য্যের উপাসনা করিয়া নিরয়গামী হইব।

মৈত্রী ও সাম্য।

একটা উদাহরণ দিই। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত প্রেমধর্ম্মের একজন প্রচারককে বলিলাম, আমাদের দেশে এখন মানুষে মানুষে যে ভয়ানক বৈষম্য রহিয়াছে, এই বৈষম্য শাস্ত্রানুমোদিত ব্যবস্থানুসারে অসঙ্গত। কোনরূপ সাংসারিক বা ব্যবহারিক ক্ষুদ্র স্বার্থের অনুরোধে এই ব্যবস্থা চলিতেছে। সুতরাং ধনমদান্ধকে মাথায় করিয়া নাচিয়া তাঁহাদের পয়সায় ঘৃতছানা খাইয়া প্রেমধর্ম্ম প্রচারের চেষ্টা একটা ঘৃণিত কপটতা মাত্র। মহাপ্রভুর ধর্ম্মে শিক্ষা দেয়—মানুষ কখন মানুষকে চাকর করিবে না। দাস্য একটি রস, আমাকে এক জন মানুষ পসন্দ করে না, বরং মনে মনে ঘৃণা করে, কিন্তু কি করিবে সে গরীব, আমার পয়সা আছে, কাজেই পেটের ভাতের জন্য সে ব্যক্তি বেতন লইয়া আমার চাকর হইয়া আছে। এই যে মানবের অপমান, ইহা ভাগবতধর্ম্মের বা যুগধর্ম্মের অনুমোদিত নহে। তবে কি কেহ কাহারও ভৃত্য হইবে না? নিশ্চয়ই হইবে। কিন্তু প্রেমের দ্বারা হইবে। সেখানে বেতন থাকিতে পারে, কিন্তু তাহা গৌণ। আমার যে সেবা করিবে সে যদি আমার সেবা করিয়াই আনন্দ পায়, এবং সেই আনন্দের জন্যই যদি সে আমার সেবা করে, তাহা হইলে ঠিক ব্যবস্থা হইল। পেটের দায় গৌণরূপে পূর্ণ হইবে। আর এক ব্যবস্থা, সহযোগী

বা সহকর্ম্মী হইতে পারে। কিন্তু রসহীন দাস্য ধর্ম্মানুমোদিত নহে, ইহা মানবের অপমান—ইহা নরলীলার বিরোধী কথা।

ব্যবহারকে একান্ত সত্য বলিয়া ধরিয়া থাকার যে মজ্জাগত কদভ্যাস তাহা হইতে রহূগরাজের চিত্ত নির্ম্মুক্ত করিয়া বিপ্রবেশী রাজর্ষি ভরত তাঁহাকে তাঁহার প্রশ্নসমূহের উত্তর প্রদান করিলেন। প্রথমেই তাঁহাকে অন্তর্ম্মুখী করিয়া মনের তত্ত্ব বুঝাইলেন। আমরা মনে করি যে সংসার বাহিরে, কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে, মন যতক্ষণ রজঃ অথবা সত্ত্ব কিম্বা তমোগুণের বশীভূত থাকে ততক্ষণ ধর্ম্মাধর্ম্মবাসনাযুক্ত হইয়া আত্ম উপাধিরূপে কার্য্য করে এবং বিষয়ের দ্বারা সঞ্চালিত হয়। মনই

"গুণানুরক্তং বাসনায় সন্তোঃ ক্ষেমায় নৈর্গুণ্যমথো মনঃ স্যাৎ"

গুণে অনুরক্ত হইলে তাহা বিপদের কারণ হয়, আর গুণহীন হইলে মঙ্গলের নিমিত্ত হইয়া থাকে। বিশ্বতত্ত্ব, আত্মতত্ত্ব ও ব্রহ্মতত্ত্ব ব্যাখ্যা করিয়া রাজর্ষি ভরত বলিলেন—

"ভ্রাতৃব্যমেতত্ত্বমদভ্রবীর্য্যমুপেক্ষয়াধ্যেধিতমপ্রমত্তঃ।
গুরোর্হরেশ্চরণোপাসনাস্ত্রো জহি ব্যলীকং
স্বয়মাত্মমোষাং॥"

তুমি আপনার গুরুরূপ যে হরি, তাঁহার চরণোপাসনারূপ অস্ত্র দ্বারা অপ্রমত্ত হইয়া ঐ মনকে বিনাশ কর। মন, সামান্য শত্রু নহে, উপেক্ষা করিলে অত্যন্ত বলবান্ হইয়া উঠিবে। যদিও ঐ মন স্বয়ং মিথ্যাস্বরূপ তথাপি আত্মাকে বিলুপ্ত করিতে সক্ষম, সুতরাং মনকে কখনও উপেক্ষা করিও না।

ভরতের উপদেশ শ্রবণ করিয়া রহূগণরাজের দেহাভিমান দূরীভূত হইল। দেহাভিমান দূরীভূত না হইলে মানুষের পক্ষে তত্ত্ব-সম্বন্ধীয় আলোচনা একেবারেই নিষ্ফল। রাজা নিজেই তাহা স্বীকার করিলেন। তিনি বলিলেন, "হে যোগেশ্বর,

আপনাকে প্রণাম করি, আপনি সামান্য ব্যক্তি নহেন আপনার এই দেহ জগতের কল্যাণ সাধনের জন্য, আপনি ঈশ্বরতুল্য! আপনি আত্মস্বরূপ, সেই কারণে আপনি দেহকে তুচ্ছ বিবেচনা করেন। আপনার বাহিরের বেশ অত্যন্ত মলিন, কিন্তু ঐ মলিন বেশের ভিতরে নিত্যানন্দের অনুভব প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে। আমি দেহাভিমানী, আমার তত্ত্ববোধের সামর্থ্য একরূপ ছিল না বলিলেই হয়। আপনার কথা শুনিয়া আমার দেহাভিমান দূরীভূত হইল এবং আমি সত্যের সন্ধান পাইলাম।"

সুবিধা-ভোগই অধর্ম্ম।

রহূগণরাজের এই কথা বড়ই মূল্যবান, জ্ঞানী ও গুণী মানুষ যখন নির্ব্বিচারে অন্যায্য সুবিধাভোগ করে, তখন শক্তিমদে মত্ত হইয়া সে ব্যক্তি নিজের সুবিধা ব্যতীত জগতের আর কিছু বুঝিতে পারে না। এই রাজা জন্মকাল হইতেই মত্তভাবে নানা-রূপ সুবিধাভোগ করিয়াছেন, সাংসারিক ব্যবস্থায় কেহ বড় কেহ ছোট, একজন মানুষ আর একজন মনুষ্যকে পশুর ন্যায় খাটাইয়া লয়, একজনের ভোগবিলাসের জন্য সহস্র সহস্র মানব সর্ব্বদাই দুঃখ কষ্ট ভোগ করে। সাংসারিক পণ্ডিতেরা একরূপ 'পোষা' ধর্ম্ম প্রস্তুত করিয়াছেন ; সে ধর্ম্মের উপদেশ শক্তিশালী ও সুবিধা-ভোগী লোকের সুখ সম্ভোগের অনুকূল। এইরূপ অনুকূল কথায় বা চাটুবাদে অভ্যস্ত লোক তত্ত্ব-কথা বা পারমার্থিক সত্য বুঝিবে কি করিয়া? পরমার্থতত্ত্ব আলোচনায় বিশ্ব-ব্যবস্থা বা সামাজিক ব্যবস্থা যেমন আছে, ঠিক তেমনি থাকা স্বাভাবিক এরূপ মনে করিলে হইবে না, সমুদয় ব্যাপারের হেতু উদ্ঘাটন করিয়া সকল জিনিসেরই মূলে যাইতে হইবে। আমরা নানারূপ সংস্কারে অভ্যস্ত হইয়া পড়িয়াছি, সেই সমুদয় সংস্কার আমাদিগকে নির্ভীক ভাবে ও স্বাধীনভাবে আত্মতত্ত্ব আলোচনা করিতে অক্ষম করিয়া ফেলিয়াছে, কাজেই পরমার্থ-বিদ্যার আলোচনা অতিশয় দুরূহ। ইংরাজীতে বলিলে বলিতে হয় যে জগতে দুই প্রকারের উপাসনার মধ্যে দ্বন্দ্ব চলিতেছে—এক God of things as they

ধর্ম্ম ও সমাজ।

are আর দ্বিতীয় God of things as they should be—সামাজিক ব্যবস্থা যেরূপ আছে সেইরূপই রাখিয়া একদল লোক ভগবানের আরাধনা করেন আর একদল লোক সামাজিক ব্যবস্থা যেরূপ হওয়া উচিত সেইরূপ মনে রাখিয়া ভগবানের আরাধনা করেন। প্রথম প্রকারের যে আরাধনা, তাহা একেবারেই ভগবানের আরাধনা নহে, ভগবদারাধনার একটা ছলনা মাত্র। দ্বিতীয় প্রকারের আরাধনাই আরাধনা। রাজর্ষি ভরতের উপদেশে রহূগণরাজ তাঁহার বিশেষ সৌভাগ্যবলে এই মহাশিক্ষা পাইলেন।

রহূগণরাজ রাজর্ষি ভরতকে চিনিয়া, তাঁহার চরণে আত্ম-সমর্পণ করিয়া কৃতার্থ হইলেন সত্য, কিন্তু সেই প্রাথমিক ভুল যাহা আশ্রয় করিয়া আমরা সংসারে অন্ধকার হইতে প্রতিনিয়ত গভীরতর অন্ধকারের অভিমুখে চলিয়াছি, সেই প্রাথমিক ভ্রান্তি যেন কিছুতেই ছাড়িতে চাহে না। এই কারণে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—"প্রভো, এই মনুষ্য ভারবহন করিতেছে, এবং তাহার ফলে সে পরিশ্রান্ত হইতেছে, ইহা আমরা সকলেই প্রত্যক্ষ করিতেছি। এই যে প্রত্যক্ষ জ্ঞান, ইহাই ব্যবহারের মূল অর্থাৎ ব্যবহারিক জগতের যাবতীয় ব্যবস্থা, সংস্কার, ধারণা প্রভৃতি এই প্রত্যক্ষ জ্ঞানকে আশ্রয় করিয়া প্রতিষ্ঠিত। আপনি বলিলেন তত্ত্ববিচারে এই প্রত্যক্ষ সত্যও সত্য নহে। আপনার এই কথা আমি কিছুতেই বুঝিতে পারিতেছি না।"

জড় ও চৈতন্য।

এইবার এমন একটি প্রসঙ্গ আসিয়া পড়িল যাহা তত্ত্বদর্শী ও আত্মারাম সাধুগণের নিকট অত্যন্ত সহজ, আর জড়বাদী সাধারণ লোকের পক্ষে অত্যন্ত কঠিন। জগতে চিরদিনই এই সমস্যা আসিয়া উপস্থিত হয়। যাহা জড় তাহা প্রত্যক্ষ। জড় জগতের কার্য্য-কারণশৃঙ্খলা আমরা দেখিতে পাইতেছি এবং তদনুসারে কার্য্য করিতেছি। অনেক চিন্তা ও আলোচনা করিয়া নির্ম্মলমনা মানুষ বুঝিতে পারিলেন যে চৈতন্য বা আত্মা

ব্যতীত জড়ের সত্বাই সম্ভব নহে। জড় পরাধীন, চৈতন্য স্বাধীন ; চৈতন্য নিয়ামক, জড় নিয়ম্য ! যাহাকে আমি 'আমি' বলিতেছি প্রকৃত প্রস্তাবে তাহা আত্মা বা চৈতন্যরূপ এবং তাহা পরমাত্মার বা পরম চৈতন্যের আশ্রিত। সুতরাং এই আত্মশক্তির নিকট জড় কিছুই নহে, একটা মোহ বা কল্পনা অর্থাৎ নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর। কিন্তু এই মহাসত্য বা সারসত্য কি জীবনে গ্রহণ করা যায় ? বিশেষ তপস্যা ব্যতীত, ভরত বলিবেন কেবল তপস্যা নহে, সাধুসঙ্গ ব্যতীত, এই সত্য জীবনে প্রতিষ্ঠা করা যায় না। কাজেই এই প্রশ্ন রহুগণরাজের মনে জাগরিত হওয়া নিতান্তই স্বাভাবিক।

সাধু-সঙ্গ।

রাজর্ষি ভরত এই প্রশ্নের নিম্নরূপ উত্তর দিলেন। "তুমি যে দেখিতেছ, বল দেখি কি দেখিতেছ ? যাহাকে আত্মা বা চৈতন্য বলিবে তাহা দেখিতেছ না. ইহা নিশ্চিত। অতএব তোমার যে দর্শন, তাহা দর্শন নহে অদর্শন। কয়েক জন বাহক শিবিকা বহন করিতেছে। প্রকৃত যে বাহক, অর্থাৎ সেই যে চৈতন্য-বস্তু, সে কোথায় ? তুমি দেখিতেছ রক্ত মাংস দিয়া গঠিত কতকগুলি পদার্থ অর্থাৎ পার্থিব বিকার মাত্র তুমি দেখিতেছ। বাহকও তাই, শিবিকাও তাই. আবার শিবিকায় যে ব্যক্তি বসিয়া রহিয়াছে, সেও তাই, পার্থিব বিকার আর তাহার সহিত কল্পিত নাম ও রূপ। এই পার্থিব বিকারে তোমার অভিমান বদ্ধমূল হইয়াছে. তাহারই তাড়নায় তুমি ভাবিতেছ. তুমি সিন্ধু-দেশের রাজা। যাহারা ভারবহন করিতেছে, তাহাদের বড়ই কষ্ট। তাহাদিগকে দেখিলে কষ্ট হয়। তুমি তাহাদিগকে জোর করিয়া ধরিয়া আনিয়া এই নিগ্রহ করিতেছ, তুমি ইহাদের বেতন পর্য্যন্ত দাও না। তুমি আত্মশ্লাঘা কর যে তুমি সকলের রক্ষক, কিন্তু তুমি রক্ষক নও তুমি ভক্ষক, তুমি নির্লজ্জ, ভদ্রলোকের সভায় তোমার স্থান হইতে পারে না।"

"জনস্থ গোপ্তাস্মি বিকত্থমানো ন শোভসে
বৃদ্ধসভাসু ধৃষ্টঃ"

তৎপরে বিপ্ররূপী ভরত জড়বাদ বা প্রত্যক্ষবাদের যাহা মূল কথা আর্থাৎ পরমাণুবাদ তাহাই উত্থাপন করিলেন এবং সেই মত খণ্ডন করিয়া বলিলেন "এই প্রপঞ্চ ভগবানের মায়াবিলাস, সুতরাং পরমাণু কলও কল্পিত। আত্মাকে কখন হ্রস্ব, কখন দীর্ঘ, কখন সূক্ষ্ম, কখন কারণত্ব আবার কখন জড়ের ধর্ম্ম দেখিয়া যে দ্বৈত প্রতীত হয়, সেই দ্বৈত মিথ্যা। অবিদ্যা বিবিধ নামের দ্বারা উপলক্ষিত, যথা দ্রব্য, স্বভাব, আশায়, কাল, কর্ম্মপ্রভৃতি এই অবিদ্যার দ্বারাই দ্বৈত প্রতীত হয়।

তাহা হইলে সত্য কি? বক্ষ্যমাণ শ্লোকে তাহাই বলিতেছেন—

জ্ঞানং বিশুদ্ধং পরমার্থমেকমনন্তরং ত্ববহি ব্রহ্ম
সত্যং।
প্রত্যক্ প্রশান্তং ভগবচ্ছব্দসংজ্ঞং যদ্বাসুদেবং
কবয়ো বদন্তি॥

পরমার্থ জ্ঞানই ভগবান।

জ্ঞানই সত্য; ব্যবহারিক সত্য সত্য নহে, পরমার্থজ্ঞানই সত্য। বৃত্তিজ্ঞান ও পরামার্থ জ্ঞান ইহারা পৃথক্। পরমার্থজ্ঞান এক, আর বৃত্তিজ্ঞান নানারূপ। পরমার্থজ্ঞান বাহ্যাভ্যন্তরশূন্য আর বৃত্তিজ্ঞান তাহার বিপরিত। পরমার্থজ্ঞান ব্রহ্ম বা পরিপূর্ণ আর বৃত্তিজ্ঞান পরিচ্ছিন্ন। পরমার্থ-জ্ঞান প্রত্যক্, বৃত্তিজ্ঞান বিষয়াকার। পরমার্থজ্ঞান প্রশান্ত অর্থৎ নির্ব্বিকার আর বৃত্তিজ্ঞান সবিকার এই ছয়টি লক্ষণের দ্বারা উভয়ের প্রভেদ নিরূপণ করিতে হইবে। এই স্বরূপ-জ্ঞান ঐশ্বর্য্যাদি

ষড়্‌গুণযুক্ত বলিয়া 'ভগবান্' এইশব্দের দ্বারা সংজ্ঞিত, ভগবচ্ছব্দসংজ্ঞিত এই জ্ঞানই বাসুদেব।

রহূগণৈতত্তপসা ন যাতি ন চেজ্যয়া
নির্ব্বপণাদ্‌গৃহাদ্বা।
ন ছন্দসা নৈব জলাগ্নিসূর্যৈ্যর্বিনা
মহৎপাদরজোভিষেকম্।

হে রহূগণ, এই জ্ঞান তপস্যা বা বৈদিক কর্ম্মের দ্বারা লাভ করা যায় না; অন্নাদি সংবিভাগের দ্বারা বা গৃহস্থাশ্রম-বিহিত পরোপকারাদির দ্বারাও ইহা হইবার নহে, বেদাভ্যাস কিম্বা জল, অগ্নি, সূর্য্য প্রভৃতির উপাসনার দ্বারাও এই জ্ঞান পাওয়া যায় না, মহাপুরুষদিগের চরণরজের অভিষেকই ইহা পাইবার একমাত্র উপায়।

যত্রোত্তমঃশ্লোকগুণানুবাদঃ প্রস্তূয়তে
গ্রাম্যকথাবিঘাতঃ।
নিষেব্যমাণোঽনুদিনং মুমুক্ষোর্মতিং সতীং যচ্ছতি
বাসুদেবে॥

সাধুদিগের সমাজে সর্ব্বদা ভগবান্ উত্তমঃশ্লোকের গুণানুবাদ হইয়া থাকে, সেখানে গ্রাম্যকথার লেশমাত্র নাই। ভগবৎগুণানুবাদ সর্ব্বদা সেবা করিলে সেই গুণানুবাদ মুমুক্ষু ব্যক্তিকে সদ্‌বুদ্ধি প্রদান করে।

অহং পুরা ভরতো নাম রাজা বিমুক্ত দৃষ্ট শ্রুত
সঙ্গবন্ধঃ।
আরাধনং ভগবত ঈহমানো মৃগোঽভবং
মৃতসাদ্ধতার্থ॥

আমি পূর্ব্বজন্মে ভরত নামে রাজা ছিলাম, অনেক দেখিয়াছি অনেক শুনিয়াছি। আমার বিষয়াসক্তি দূর হইয়াছিল, আমি শ্রীভগবানের আরাধনা করিতাম। দৈববশে একটি হরিণ-শিশুতে আসক্ত হইয়া আমি মৃগত্ব প্রাপ্ত হই, তাহার ফলে আমার উদ্দেশ্য-সমূহ বিফল হইয়া যায়।

স মাং স্মৃতির্মৃগদেহেঽপি বীর কৃষ্ণার্চ্চনপ্রভবা ন জহাতি।
অথো অহং জনসঙ্গাদসঙ্গো বিশঙ্কমানো বিবৃতশ্চরামি॥

আমি পূর্ব্বজন্মে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা করিয়াছিলাম তদুৎপন্না স্মৃতি মৃগদেহেও আমাকে পরিত্যাগ করে নাই, সেইজন্য আমি লোকজনের সঙ্গকে বড়ই ভয় করি এবং জনসঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া প্রচ্ছন্নরূপে পর্য্যটন করিতেছি।

তস্মান্নরোঽসঙ্গসু-সঙ্গজাতজ্ঞানাসি নৈবেহ বিবৃক্ণমোহঃ।
হরিং তদীহা কথনশ্রুতাভ্যাং লব্ধস্মৃতির্যাত্যতি-পারমধ্বনঃ॥

অতএব মনুষ্যগণ অসঙ্গরূপ যে মহৎ পুরুষের সঙ্গ, তাহার সাহায্যে জ্ঞানরূপ অসি উৎপন্ন করিয়া অসির সাহায্যে মোহচ্ছেদন করিবে। তাহা হইলে সংসারধর্ম্ম অতিক্রম করিয়া ভগবান্ হরিকে লাভ করিতে পারিবে। মহৎসঙ্গে ভগবানের কর্ম্ম সকল দৃষ্ট ও শ্রুত হয়, তাহাতে স্মৃতিলাভ হইয়া থাকে।

ইহাই রাজর্ষি ভরতের উপাখ্যান। উপাখ্যানের উপসংহারে শ্রীশুকদেব মহারাজ পরীক্ষিৎকে বলিলেন—

"ইত্যেবমুত্তরামাত স বৈ ব্রহ্মর্ষিসুতঃ সিন্ধুপতয়ঃ আত্মসতত্ত্বং বিগণয়তঃ পরানুভাবঃ পরমকারুণিকতয়োপদিশ্য রহূগণেন সকরুণমভিবন্দিতচরণঃ পূর্ণার্ণব ইব নিভৃত করণোর্ম্ম্যাশয়ো-ধরণিমিমাং বিচচার।"

হে উত্তরাসুত পরীক্ষিৎ, সিন্ধুদেশের রাজা অপমান করিয়াছিলেন, কিন্তু ব্রহ্মর্ষিসুত রাজা ভরত স্বভাবতঃই করুণচিত্ত, তিনি দয়াপরবশ হইয়া ঐ রাজাকে আত্মতত্ত্ব উপদেশ করিলেন। রহূগণরাজ ব্রহ্মর্ষির চরণ বন্দন করিলে তিনি পূর্ণ সমুদ্রের তুল্য আনন্দপূর্ণ হইলেন। অবশ্য ইহার পূর্ব্বে যে তিনি ক্ষুব্ধ হইয়াছিলেন, তাহা নহে, তাঁহার অন্তঃকরণ সর্ব্বদাই অক্ষুব্ধ। রহূগণ-রাজকে কৃপা করিয়া ব্রহ্মর্ষি ভরত পুনর্ব্বার পূর্ব্বের মত পৃথিবী ভ্রমণ করিতে লাগিলেন।

রহূগণরাজ ভরতের নিকট তত্ত্ব অবগত হইয়া দেহে আত্মবুদ্ধি পরিত্যাগ করিলেন ও ধন্য হইলেন। ভগবদাশ্রিত ব্যক্তির আশ্রয় গ্রহণ করার কি অপূর্ব্ব মহিমা; ভরতের আশ্রয়ে রহূগণ রাজার অহংকার অল্প সময়ের মধ্যেই বিনষ্ট হইল।

আর্ষভস্যেহ রাজর্ষের্মনসাপি মহাত্মনঃ।
নানুবর্ত্মার্হতি নৃপো মক্ষিকেব গরুত্মতঃ॥

মক্ষিকাসকল যেমন গরুড়ের বর্ত্মানুসরণ করিতে পারে না, তাহার ন্যায়, অন্য কোন রাজা ঋষভতনয় রাজর্ষি ভরতের পথ ধরিয়া মনোরথের সাহায্যেও চলিতে পারিবে না, কর্ম্মের ত কথাই নাই।

এই মহানুভব রাজা উত্তমঃশ্লোক শ্রীভগবানের প্রতি আত্যন্তিকী ভক্তিবশতঃ যৌবনকালেই স্ত্রী পুত্র বন্ধু রাজ্য প্রভৃতি ঘৃণা করিয়া নিতান্ত তুচ্ছ মনে করিয়া পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। বড় সাধারণ কথা নহে! ভগবানে যাঁহাদের প্রকৃত ভক্তির

উদয় হয়, এবং যাহারা ভগবান্ মধুরিপুর সেবায় অনুরক্ত তাঁহাদের নিকট পরম পুরুষার্থ মুক্তিই অতি অকিঞ্চিৎকর হয়, অতএব দেববন্দিতা কমলা কি কখনও তাঁহাদের মুগ্ধ করিতে পারেন ?

যজ্ঞায় ধর্ম্মপতয়ে বিধিনৈপুণায় যোগায় সাংখ্য-
শিরসে প্রকৃতীশ্বরায়।
নারায়ণায় হরয়ে নম ইত্যুদারং হাস্যন্মৃগত্বমপি
যঃ সমুদাজহার ॥

রাজর্ষি ভরত যে সময়ে মৃগদেহ পরিত্যাগ করেন, সে সময়ে উচ্চৈঃস্বরে বলিয়াছিলেন "যে ভগবান্ যজ্ঞরূপ, যজ্ঞাদিফলদাতা, ধর্ম্মানুষ্ঠানকর্ত্তা, অষ্টাঙ্গ যোগরূপী, জ্ঞানই যাঁহার প্রধান বল, তাদৃশ যোগমূর্ত্তি ; মায়া নিয়ন্তা এবং যিনি নারায়ণ অর্থাৎ জীব সমূহের আশ্রয় ও নিয়ন্তা, সেই ভগবান্ হরিকে নমস্কার করি।"

মহর্ষি ভরতের চরিত্র-কথা বর্ণনা করিয়া শ্রীমদ্ভাগবত উপসংহারে যে কয়েকটী কথা বলিয়াছেন, তাহা হইতেই এই চরিত্রের মর্ম্মকথা পাওয়া যাইতেছে। রাজা ভরত যৌবনে বিষয়ভোগ ত্যাগ করিয়া রাজর্ষি হইয়াছিলেন, শেষ জীবনে তিনি ব্রহ্মর্ষি ; তিনি মোক্ষাভিলাষী নহেন তিনি শ্রীভগবানের সেবার পথ গ্রহণ করিয়াছেন। ব্রহ্মর্ষি ভরতের জীবনের শেষ কথা শ্রীমদ্ভাগবত কিছু বলেন নাই, এই মাত্র বলিয়াছেন যে 'তিনি পর্য্যটন করিতে লাগিলেন, সেবাধর্ম্মী ব্রহ্মর্ষি ভরত চির-করুণার্দ্র, তিনি স্বয়ং পরমার্থ সত্যস্বরূপ শ্রীবাসুদেবকে পাইয়াছেন, এবং নিজে অপমানিত হইয়াও সকলকে এই মহাসত্যে দীক্ষিত করিবার জন্য চেষ্টান্বিত।

আজ কে এই ব্রহ্মর্ষি ভরতকে চিনিতে পারিবে। এ জগতে ত্যাগের নামই শুনিতে পাওয়া যায়, কিন্তু ভগবৎপাদপদ্ম সেবার

জন্য আকুল হইয়া সত্য সত্য ত্যাগ করিতে পারে কয়জন? ত্যাগ করা তো পরের কথা যথার্থ ত্যাগীলোকের জীবনে বিশ্বাস স্থাপন করিয়া ত্যাগের সমাদর করিতে পারে কয়জন? বর্ত্তমান পৃথিবী জড়বাদে ও ভোগসর্ব্বস্বতায় একেবারে ডুবিয়া গিয়াছে. এই ঘোর কলিযুগে ত্যাগী ভরতকে চিনিতে পারিবে কে? ব্রহ্মর্ষি ভরতকে যাহারা চিনিতে পারিবে ভারতবর্ষকেও তাহারা চিনিতে পারিবে। ভারতবর্ষ আজ বিপন্ন ও অনশনক্লিষ্ট। ইহার কারণ কি? তোমরা একালের বিচক্ষণ লোক, তোমরা বলিবে, তাহার ক্ষমতা নাই, সেই কারণে তাহার এই কষ্ট! কিন্তু প্রকৃত কথা তাহা নহে। অনশনক্লিষ্ট হইয়া ভিখারীর বেশে যাহারা ভারতবর্ষের শরণাগত হইয়াছে, ভারতবর্ষ কখনই তাহাদিগকে বিমুখ করে নাই এবং এখনও এই দারিদ্র্যপীড়ার দুর্দ্দিনে ভারতবর্ষ কাহাকেও চলিয়া যাইতে বলে না নিজে না খাইয়া অপরকে খাওয়াইতে ভারতবর্ষ প্রস্তুত, দীনবেশে অপরের শিবিকাবহনেও তাহার আপত্তি নাই, কারণ ইহাই স্বাভাবিক। জড়বাদে পূর্ণ এই মায়িক জগতে যিনি পরমার্থসত্যের আলোক বিতরণ করিয়া ক্ষুদ্র মানবকে প্রকৃত মহৎ করিতে চাহেন, মানব-প্রকৃতির পশুত্ব, রাক্ষসত্ব ও পিশাচত্ব ধ্বংস করিয়া দেবত্বের প্রতিষ্ঠা করার ভার যাহার উপর রহিয়াছে, তাঁহার পক্ষে রাজা হইয়া বসিয়া থাকিলে চলিবে না। তাঁহার প্রথম কার্য্য তাঁহাকে ত্যাগ করিতে হইবে, তিনি ত্যাগ করিলে তবেই অন্যের ভোগবাসনা সুসিদ্ধ হইবে। যিনি করুণ, তাঁহাকে সজ্ঞানভাবে পশুত্বের বন্ধনও স্বীকার করিতে হইবে, নতুবা জগতের মানবের পশুত্ব মোচনের উপায় নাই।

ভবাটবী।

সর্ব্বশেষে রাজর্ষি ভরত রহূগণ-রাজের নিকট ভবাটবী বর্ণনা করেন। মানব সকল বণিক, তাহারা বাণিজ্য করিতে বাহির হইয়াছে। তাহারা মায়ায় মুগ্ধ, অর্থোপার্জ্জনের জন্য ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে করিতে তাহারা ভবাটবীর মধ্যে আসিয়া উপস্থিত

হয়। "এই সংসার ভীষণ বন, সেই বনে ছয়জন অতিশয় দুর্দ্দান্ত দস্যু আছে। তাহারা দেখিয়াই বুঝিতে পারে যে এই বণিক্‌গণ নিতান্তই অকর্ম্মণ্য, এবং সেই ছয়জন দস্যু বলপূর্ব্বক বণিক্‌দিগের ধনরাশি লুণ্ঠন করিয়া লয়। সেই বনে অসংখ্য শৃগাল আছে, মেষপালের মধ্যে যেমন ব্যাঘ্র প্রবেশ করিয়া মেষগুলিকে হরণ করে সেইরূপ এই বনস্থ শৃগালগুলি ঐ বণিক্‌-দিগকে হরণ করিয়া লইয়া যায়। বনের ভিতরে অতি ভয়ঙ্কর ও দুর্গম গহ্বর আছে, ঐ গহ্বর সমূহ তৃণলতা ও গুল্মের দ্বারা আচ্ছাদিত, বণিকেরা সেই গহ্বরে বাস করে, সেখানে দংস ও মশকের উপদ্রব অত্যন্ত ভয়ঙ্কর। সেই বনের ভিতরে জলহীন নদী আছে। জলপান করিবার জন্য বণিকগণ সেই নদীতে গমন করে, ফলে জল পায়না, কেবল-আঘাত প্রাপ্ত হয়। এই প্রকারে বণিকগণ চলিয়াছে, দুর্গম বনে পথের শেষ নাই, যাহারা গিয়াছে, তাহারা কেবল ভ্রমণই করিতেছে, স্বস্থানে ফিরিয়া আসিতে পারিতেছে না। ভূমি লইয়া কেহ কেহ কলহ করে, কেহ বা পক্ষীর গীত শুনিয়া মুগ্ধ হয়, আবার কেহ কেহ বানরাদি পশুর দলে মিশিয়া আচার ব্যবহারে একেবারে পশু হইয়া পড়ে।

এই প্রকারে ভবাটবী বর্ণনা করিয়া ব্রহ্মর্ষি ভরত রহূগণ রাজকে বলিলেন—"তুমিও মায়াকর্ত্তৃক ভবাটবীর পথে আসিয়া পতিত হইয়াছ। তুমি রাজ্য ছাড়িয়া সকল প্রাণীর সহিত মিত্রতা কর, বিষয়ে অনাসক্ত হইয়া ভগবানের সেবা কর। ভগবৎসেবার দ্বারা জ্ঞান-তরবারি তীক্ষ্ণ হইবে, সেই সুতীক্ষ্ণ তরবারি সাহায্যে সংসার-বর্ত্মের পরপারে উপস্থিত হও।"

রহূগণরাজ সাধুসঙ্গের প্রভাব বুঝিলেন এবং বিনীতভাবে বলিলেন "মহাত্মন্ আপনার সহিত আমার অতি অল্প সময় সাক্ষাৎ হইয়াছে, কিন্তু তাহার প্রভাবে কুতর্কের মূলীভূত যে অবিবেক তাহা বিনষ্ট হইয়া গেল।"

নমো মহদ্ভ্যোঽস্তু নমঃ শিশুভ্যঃ নমঃ যুবভ্যো
নমো আবটুভ্যঃ।
যে ব্রাহ্মণা গামবধূতলিঙ্গাশ্চরন্তি তেভ্যঃ শিবমস্তু
রাজ্ঞাং॥

ব্রহ্মবিদ্‌গণ কখন কিরূপে বিচরণ করেন, তাহা বলা যায় না। অতএব মহদ্ব্যক্তিগণকে নমস্কার, শিশুদিগকে নমস্কার, ক্রীড়ারত বিপ্রবালক হইতে সকল ব্রাহ্মণকে নমস্কার; যে সকল ব্রাহ্মণ অবধূত বেশ ধারণ করিয়া পৃথিবীতলে ভ্রমণ করেন, তাঁহাদিগকে আমার বহু বহু নমস্কার। তাঁহাদিগের অনুগ্রহে রাজাদিগের মঙ্গল হউক।

শ্রীমদ্‌ভাগবতের পঞ্চম স্কন্ধের ত্রয়োদশ অধ্যায়ে এই ভবাটবী বর্ণিত হইয়াছে আর চতুর্দ্দশ অধ্যায়ে ভবাটবীর অর্থ বিবৃত হইয়াছে। তাহার সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম এইরূপ।

(সংসার অরণ্যস্বরূপ। জীবগণ এই অরণ্যে বণিকের ন্যায় অর্থোপার্জ্জন করিতেছে। ভগবানের মায়াই জীবগণকে এই সংসার অরণ্যে স্থাপন করিয়াছে, এই মায়ার প্রভাবেই তাহারা সত্যের সন্ধান পাইতেছে না। এই পরম সত্য কি? শ্রীভগবান্‌ই গুরু, তাঁহার চরণপদ্মের মকরন্দ পান করিবার যে পথ, সেই পথে বিচরণই পরমার্থ সত্যের সেবা কিন্তু জীবের অদৃষ্টে তাহা ঘটিতেছে না। বহিরঙ্গা মায়া-শক্তির তাড়নায় সত্যের আভাস ও মিথ্যা লইয়া জীব দুর্গম সংসার পথে ধাবিত হইতেছে। এই যে সংসার, জীব ইহা অনুভব করে কি প্রকারে? ছয়টি ইন্দ্রিয়ই এই অনুভবের পথ। এই ছয়টি ইন্দ্রিয় ভবাটবীর ছয়টি দস্যু; কারণ জীব সংসারে অশেষ ক্লেশ সহ্য করিয়া যদি কিছু ধন সংগ্রহ করে, তাহা হইলেও সে ঐ ধন ধর্ম্মার্থে ব্যয় করিতে বা প্রয়োগ করিতে পারে না। অতি প্রবল দস্যু ছয়জন তাহার ঐ ধন

জোর করিয়া কাড়িয়া লয় অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ও অনিত্য বিষয়সুখ সাধনে ঐ ধন নষ্ট হইয়া যায়।

সংসারে স্ত্রী পুত্রাদি পরিবারবর্গ শৃগাল ও বৃক স্বরূপ। সংসারী জীব যদি কিছু ধর্ম্মার্থে রক্ষা করেন, তাহা হইলে ব্যাঘ্র ও শৃগাল যেমন গৃহস্থের মেষশাবক চুরি করিয়া লইয়া যায়, ঠিক সেই প্রকারে এই কুটুম্ব আত্মীয়গণ মানুষের এই ধন চুরি করিয়া লইয়া যায়।

ছয় ইন্দ্রিয় দস্যু আর আত্মীয় কুটুম্বগণ ব্যাঘ্র ও শৃগাল তুল্য, এই উক্তির দ্বারা ইহাই বুঝিতে হইবে যে সংসারী মানুষ ইচ্ছা করিলেও নিজের মনের মত সৎকর্ম্ম করিতে পারে না। এমন কি কিছুদিন ছুটাছুটি করিয়া পরিশ্রম করিয়া তাহার পর যে কিছুদিন বিশ্রাম সুখ উপভোগ করিবে ও আত্মতত্ত্বের অনুশীলন করিবে, তাহাও জীবের ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে না।

একদিকে ইন্দ্রিগণের নিজ নিজ অভীষ্ট বিষয়ের উপভোগ-চেষ্টা দুর্ণিবার, আর একদিকে স্বার্থান্বেষী আত্মীয়স্বজনবর্গের চতুরতা। ইহার ফলে জীব সকল সময়েই বিপন্ন ও অস্থির অবস্থায় থাকে।

ভবাটবীর মধ্যে "তৃণ গুল্মে আচ্ছন্ন ভীষণ গহ্বর আছে" ইহার তাৎপর্য্য বড় সুন্দর। আমরা জমি আবাদ করি, কাঁটার গাছ প্রভৃতি নষ্ট করিয়া আবশ্যকীয় শস্য উৎপাদন করি। প্রতি বৎসরই কাঁটার গাছ নষ্ট করিতেছি, কিন্তু তাহা কিছুতেই নষ্ট হইতেছে না, তাহার বীজ গোপনে মাটীর মধ্যে থাকিয়া যায়, আমরা একটু অমনোযোগী হইলেই ঐ বীজ আবার গজাইয়া উঠে। এই গৃহস্থাশ্রম কর্ম্মক্ষেত্র, নিষিদ্ধ কর্ম্মবর্জ্জনের জন্য এমন কি কামনাযুক্ত কর্ম্ম ধ্বংশ করার-জন্য আমরা চেষ্টা করিতেছি, কিন্তু আমাদের চেষ্টা সফল হইতেছে না; কর্ম্ম সকল বিনষ্ট হইলেও তাহার বাসনা বিনষ্ট হইতেছে না। এই প্রকারে কামনার বীজ অঙ্কুরিত হইয়া জীবকুলকে পুনঃ পুনঃ বিপন্ন করিতেছে।

এইরূপ শুনিতে পাওয়া যায় যে শীতপ্রধান দেশের অরণ্য-

প্রদেশে মানুষ দূরে এক শ্রেণীর পিশাচ দেখিতে পায়। এই পিশাচেরা দেখিতে জলন্ত অগ্নির মত। শীতার্ত্ত ব্যক্তি ঐ পিশাচকে দেখিয়া অগ্নি বলিয়া বিবেচনা করে এবং উহার নিকটে গেলেই আমার শীতের কষ্ট নিবারিত হইবে এইরূপ চিন্তা করিয়া অকারণ পিশাচের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ঘুরিয়া বেড়ায়। সংসারী মানুষ বিবেচনা করে যে স্বর্ণই সংসার-ক্লেশ নিবারণে একমাত্র উপায়, টাকা দ্বারা সংসারে সবই করিতে পারা যায়। এই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া মানুষ দিবস-রজনী সুবর্ণের পশ্চাৎ পশ্চাৎ পাগলের মত ঘুরিয়া বেড়ায়।

(প্রমদা রমণীগণ সংসারে বাত্যার ন্যায়। এই বাত্যা বা বায়ুপ্রবাহ যখন পুরুষকে আক্রমণ করে তখন যে অনুরাগ জন্মে সেই অনুরাগের দ্বারা পুরুষের চক্ষু অন্ধ হইয়া যায়, অর্থাৎ হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হইয়া যথেচ্ছাচারী হইয়া উঠে এবং তাহার ফলে দুঃখ পায়।

ভবাটবীতে যদি বা কেহ ক্ষুদ্র রস কিছু লাভ করিতে পারে তাহা হইলে অন্য ব্যক্তি আসিয়া জোর করিয়া তাহা কাড়িয়া লয়। যে ব্যক্তি কাড়িয়া লয় সে ভোগ করিতে পায়না, তাহার নিকট হইতে আবার অন্য একজন কাড়িয়া লয়। এই প্রকারে কাহারও ভাগ্যে ভোগের সামগ্রী জুটিতেছে না কেবল কাড়াকাড়ি চলিতেছে এবং তাহার ফলে সকলেরই জীবন দারুণ অশান্তিময় হইয়া উঠিতেছে।)

ভবাটবীতে শীত, গ্রীষ্ম, বায়ু, বর্ষা প্রভৃতির অভাব নাই, কিন্তু বণিকেরা ইহার প্রতিকার করিতে পারে না। ইহার অর্থ সংসারে আধিদৈবিক, আধিভৌতিক ও আধ্যাত্মিক দুঃখক্লেশ চেষ্টা করিয়াও মানুষ নিবারণ করিতে পারে না।

তৃতীয় ভাগ সমাপ্ত